নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৫

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

বিবাহের আহকাম, আদব, খুতবা, প্রচলিত রসম-রেওয়াজ
স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ, সুন্দর ও সুখী পরিবার গঠনের
ইসলামী নীতিমালা

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৫

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

বিবাহের আহকাম, আদব, খুতবা, প্রচলিত রসম-রেওয়াজ
স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ, সুন্দর ও সুখী পরিবার গঠনের ইসলামী নীতিমালা

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমি জেদ্দা, সৌদিআরব
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

ইমাম ও খতীব : পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা
শাইখুল হাদীস : জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৫

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

মূলঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদঃ মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
পঞ্চম মুদ্রণ : মার্চ ২০২০ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : জুলাই ২০১৪ ঈসায়ী

প্রচ্ছদঃ ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্সঃ সাঈদুর রহমান

মুদ্রণঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 987-984-8950-46-3

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, facebook.com/EhsanBookshop, khidmashop.com
✆ 16297 or 01519521971 ✆ 01832093039 ✆ 01939773354

মূল্য : চারশত চল্লিশ টাকা মাত্র

ISLAM O PARIBARIK JIBON
By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by: Maulana Abul Bashar Muhammad Saiful Islam
Price: Tk. 440.00 US$ 20.00

ইনতেসাব

আকাবির ও আসলাকের ঐ সকল মহান সংস্কারকদের প্রতি যারা উম্মতে মুসলিমাহকে বিদ'আত ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে হিদায়াতের উজ্জল আলোয় ফিরিয়ে আনতে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বিশেষত বিয়ে-শাদি থেকে রসম-রেওয়াজ বিদুরিত করে সুন্নাহর আলোকে উদ্ভাসিত করে পরিবার ও দাম্পত্য জীবনকে জান্নাতের নমুনা বানানোর জন্য সমাজের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেছেন এবং অব্যাহত মেহনত ও মুজাহাদার মাধ্যমে আল্লাহপাকের রহমত লাভে ধন্য হয়েছেন।

আল্লাহপাক তাঁদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন। আমাদের এসকল প্রয়াসকে কবুল করুন এবং এর ছওয়াবও এ আকাবিরসহ উম্মাহর জীবিত-মৃত সকল মুসলিহকে পৌছে দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

-প্রকাশক

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন ১-১৪

সিরিজ পরিচিতি

প্রথম খণ্ড	:	ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস
দ্বিতীয় খণ্ড	:	ইবাদাত-বন্দেগী
তৃতীয় খণ্ড	:	ইসলামী মু'আমালাত
চতুর্থ খণ্ড	:	ইসলামী মু'আশারাত
পঞ্চম খণ্ড	:	ইসলাম ও পারিবারিক জীবন
ষষ্ঠ খণ্ড	:	ইসলাহ ও তাসাওউফ
সপ্তম খণ্ড	:	উত্তম চরিত্র এবং তার ফযীলত ও বিকাশ
অষ্টম খণ্ড	:	অসৎ চরিত্র ও তা সংশোধনের উপায়
নবম খণ্ড	:	ইসলামী জীবনের সোনালী আদাব
দশম খণ্ড	:	দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাত, আদাব ও দু'আ
একাদশ খণ্ড	:	ইসলামী মাসসমূহের ফাযায়েল ও মাসায়েল
দ্বাদশ খণ্ড	:	সীরাতুন্নবী স. ও আমাদের জীবন
ত্রয়োদশ খণ্ড	:	উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য
চতুর্দশ খণ্ড	:	ইসলাম ও বর্তমানকাল

ইসলাম ও আমাদের জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যতসব জটিলতা ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন হই, কেবল কুরআন-হাদীছেই আছে তার নিখুঁত সমাধান। সে সমাধান অবহেলা ও সীমালংঘন উভয়রূপ প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। ইসলামের সেই অমূল্য শিক্ষা মোতাবেক আমরা কিভাবে পরিমিত ও ভারসাম্যমান পথে চলতে পারি? কিভাবে যাপন করতে পারি এমন এক জীবন, যা দ্বীন দুনিয়ার পক্ষে হবে স্বস্তিদায়ক ও হৃদয়-মনের জন্য প্রীতিকর? এসব মুসলিমমাত্রেরই প্রাণের জিজ্ঞাসা। 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' সরবরাহ করে সেই জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক জবাব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

বছরের পর বছর ধরে কলম ও যবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী কসরত করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের যে কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের কাছেও সে দিকনির্দেশকে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ জাতীয় লেখাজোখা ও বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা বিশেষ সংকলনের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে। এবার স্নেহের ভাতিজা জনাব সঊদ উসমানী সেগুলোর একটি 'বিষয়ভিত্তিক সমগ্র' প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেবকে সেটি তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত মেহনতের সাথে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে-খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় জমা হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যেসব কথা বিনা বরাতে এসে গিয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার বরাতও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সংগ্রহটিকে তাঁর, অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবূল করুন আর পাঠকদের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪১৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সন্ধ্যায় হাঁটতে গেলেন ঢাকার একটি পার্কে। এসময় আমাদের এক সাথী আমাকে দেখিয়ে হযরতকে বললেন, 'হযরত! আমাদের হাবীব ভাই তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে আপনার সফরনামাসহ অনেক কিতাবের খুবই উন্নত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। মাশাআল্লাহ সারাদেশের উলামায়ে কেরাম এ সকল কিতাবকে খুবই পছন্দ করছেন। হযরত একথা শুনে খুব দু'আ দিলেন। সেসময় থেকেই হযরতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হলো। এ সফরেই অথবা অন্য কোন সফরে আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ পর্যন্ত হযরতের যত কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো ছিলো আমাদের নির্বাচন, হযরতের দৃষ্টিতে কোন্ কিতাবের অনুবাদ হলে এদেশের সাধারণ মুসলমানের জন্য বেশি উপকারী হবে? হযরত সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আমার মতে 'আসান নেকীয়াঁ' ও 'ইসলাহী খুতবাত'-এর অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য বেশী উপকারী হবে।

হযরতের এ পরামর্শের পর থেকেই আমরা হযরতের খুতবাত অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু মূল খুতবাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার মনে হলো, এসকল বয়ানকে যদি বিষয়ভিত্তিক সাজানো যেতো তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াটা তুলনামূলক সহজ হতো। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কয়েকজন অনুবাদক বন্ধুকে খুতবাতসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে বলি। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজ করলেও তাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে পাকিস্তানের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত'-এর তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের সকল উর্দূ রচনা হতে সাধারণ মুসলমানের জন্য উপকারী বিষয়সমূহ এবং ইসলাহী বয়ানসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন এবং আপাতত দশ খণ্ডে তা প্রকাশ করেন। এ কিতাবের প্রথম খণ্ড 'ইসলামী আকীদা বিষয়ক', দ্বিতীয় খণ্ড 'ইবাদাত-বন্দেগী-এর স্বরূপ', তৃতীয় খণ্ড 'ইসলামী মু'আমালাত', চতুর্থ খণ্ড 'ইসলামী মু'আশরাত', পঞ্চম খণ্ড 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন', ষষ্ঠ খণ্ড 'ইসলাহ ও তাসাওউফ', সপ্তম খণ্ড

'ইসলামী জীবনের সোনালী আদাব', অষ্টম খণ্ড 'অসৎ চরিত্র ও তার সংশোধন', নবম খণ্ড 'উত্তম চরিত্র ও তার ফযীলত' এবং দশম খণ্ড 'দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাত ও আদাব' বিষয়ক।

গ্রন্থনাকালে হযরত মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব এমন কিছু বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে কিতাবের মান আরো উন্নত হয়েছে।

ক. তিনি সকল কুরআনী আয়াতের সূরার নাম উল্লেখপূর্বক আয়াত নম্বর লাগিয়েছেন।

খ. সকল আয়াত ও হাদীসে হরকত লাগিয়েছেন।

গ. হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বর দিয়েছেন।

ঘ. এ সংকলনে এমন অনেক খুতবা আছে যা পূর্বে ছাপা হয়নি।

আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা সবগুলো খণ্ডই অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ!

প্রথম খণ্ড 'ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস', দ্বিতীয় খণ্ড 'ইবাদাত-বন্দেগী : হাকীকত ফযীলত ও আদব' তৃতীয় খণ্ড 'ইসলামী মু'আমালাত' এবং চতুর্থ খণ্ড 'ইসলামী মু'আশারাত' নামে পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে সম্মানিত পাঠকের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান আয়োজন এ ধারারই পঞ্চম খণ্ড **'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন'** প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহপাক অবশিষ্ট খণ্ডসমূহও দ্রুত প্রকাশ করার তাওফীক দান করুন।

আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন ভুল-ত্রুটি (বিশেষত হরকতের ভুল) থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তি সংস্করণে সংশোধন করে নিবো।

আমাদের ধারণা উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক ও প্রকাশক, পাঠকসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
১৪ রমাযান ১৪৩৫ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৫

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

বিবাহের আহকাম, আদব, খুতবা, প্রচলিত রসম-রেওয়াজ

স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ, সুন্দর ও সুখী পরিবার গঠনের ইসলামী নীতিমালা

বিবাহের আহকাম ও আদবসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের এক প্রিয় বন্ধুর বিবাহানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আমাদের সকলের লাভ হল। আল্লাহ তা'আলা এ বিবাহকে বরকতপূর্ণ করুন। আমীন।

বিবাহের খুতবা পড়ার সময় মনে হল সময়োচিত বিষয় হিসেবে এবং সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ করে বিবাহেব খুত্‌বা সম্পর্কে আজ কিছুটা আলোচনা হয়ে যাক। কেননা, এই যে খুতবাটি প্রতিটি বিবাহের সময় পড়া হয়, এর এক মহান উদ্দেশ্য আছে। সাধারণভাবে আমরা সে উদ্দেশ্যটি ভুলে গেছি। বরং বিবাহের খুত্‌বা পড়া তথাকথিত এক রসমে পরিণত হয়ে গেছে। বিবাহের অনুষ্ঠানে বিবাহ পড়ানোর জন্য কাউকে ডেকে আনা হয়। সে খুতবার বাক্যসমূহ পাঠ করে আর সকলে শুনে নেয়। ব্যস হয়ে গেল। অথচ পূর্ণ খুত্‌বাটি এবং এতে যে আয়াতসমূহ পড়া হয়, তার একটি বড় উদ্দেশ্য আছে। তাতে আমাদের সকলের জন্য বিবাহ সম্পর্কে তো বটেই, সেই সংগে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কেও অতি মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে এবং রয়েছে অনেক বড় বার্তা।

নবীযুগে বিবাহকালীন নসীহত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নিয়ম ছিল, তিনি যখন বিবাহের খুতবা দিতেন তখন উপদেশমূলক কিছু কথাও বলতেন। বর্তমানে উপদেশের সে নিয়ম পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। খুত্‌বার মাসনূন (সুন্নতসম্মত) আয়াতসমূহ পড়েই ক্ষান্ত করা হয়। তাই আজ এ খুত্‌বার প্রাণবস্তু ও মর্মকথা ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন বড় বেশি।

বিবাহকালীন খুত্‌বা

বিবাহ দুই নর-নারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সামাজিক চুক্তি। এতে দুই পক্ষ থেকে ঈজাব-কবূল (প্রস্তাব-গ্রহণ) হয়। যিনি বিবাহ পড়ান, সাধারণত তিনি কনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। তিনি বরকে বলেন, আমি অমুকের কন্যা অমুককে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম। বর বলে, আমি কবূল করলাম। সুতরাং বেচাকেনায় যেমন প্রস্তাব-গ্রহণ হয়, তেমনি বিবাহেও তা হয়। পার্থক্য এই যে, বেচাকেনার প্রস্তাব ও গ্রহণকালে খুত্‌বা পড়া হয় না এবং তাতে কাযীরও দরকার হয় না? কিন্তু বিবাহে খুতবা পড়া হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈজাব-কবূলের আগে খুত্‌বা পড়তেন। কাজেই এটা সুন্নত যদিও খুতবা ছাড়াও বিবাহ হয়ে যায়।

বিবাহ একটি 'ইবাদত

বিবাহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দু'টি দিক রেখেছেন। এক দিক থেকে তো এটা এক সামাজিক চুক্তি আর অন্যদিক থেকে এটা 'ইবাদত বরং ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি 'আলাইহির মতে বিবাহে সামাজিক চুক্তিবদ্ধতার দিকটি গৌণ এবং ইবাদতের দিকটিই প্রধান।

যা হোক আল্লাহ তা'আলা বিবাহকে একটি 'ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছেন। ইবাদত হওয়ার কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে খুত্‌বা পাঠের ব্যবস্থা দিয়েছেন। এটা তাঁর সুন্নত।

বিবাহের খুত্‌বায় তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত

বিবাহের খুতবায় বিশেষ তিনটি আয়াত পড়া সুন্নত। লক্ষ করলে দেখা যায়, এতে সরাসরি বিবাহ সম্পর্কে কোন কথা নেই; অথচ কুরআন মাজীদে সরাসরি বিবাহ সম্পর্কে বহু আয়াত আছে এবং তাতে বিবাহের শব্দাবলীও আছে। আমার পিতা হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি বলতেন, ভাবনার বিষয় হল, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য আয়াত রেখে বিশেষভাবে এই তিনটি আয়াত কেন নির্বাচন করলেন? তা উপলব্ধির জন্য প্রথমে আয়াতগুলোর অর্থ বুঝে নেওয়া চাই।

প্রথম আয়াতের শিক্ষা

খুত্‌বায় সর্বপ্রথম পড়া হয় সূরা নিসার প্রথম আয়াত। আয়াতটি হল,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

'হে লোকসকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে) এবং তারই থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে (অর্থাৎ হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে)। আর তাদের উভয়ের (পারস্পরিক সম্পর্ক) থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাক (কেউ যখন কারও কাছে নিজের হক চায়, তখন বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার হক আমাকে দিয়ে দাও। তাই বলা হয়েছে, যে আল্লাহর অছিলা দিয়ে তোমরা নিজের হক দাবি কর, তাকে ভয় কর, যাতে সেই হক আদায়ে তার কোন হুকুম লংঘন করা না হয়। তারপর বলা হয়েছে) এবং আত্মীয়দের (পারস্পরিক অধিকারসমূহের) ব্যাপারেও ভয় কর (যাতে তাদের অধিকার পদদলিত করা না হয়)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ রাখছেন (তিনি তোমাদের প্রতিটি গতিবিধি দেখছেন)' (সূরা নিসা : ১)।

এ আয়াতের শিক্ষা হল, পরস্পরে একে অন্যের হক আদায় করুন।

দ্বিতীয় আয়াতের শিক্ষা

দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আলে 'ইমরানের–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

'হে মু'মিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেভাবে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। সাবধান, অন্য কোন অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে। বরং এ অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম'। (সূরা আলে 'ইমরান : ১০২)

মুসলিম মানে আনুগত্যকারী। অর্থাৎ সারাটা জীবন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ভেতর কাটাও, যাতে সর্বক্ষণ মুসলিম ও অনুগত হয়ে থাকতে পার। ফলে যখন মৃত্যু আসবে, তখন তুমি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ফরমাবরদারির অবস্থায় থাকবে।

এ আয়াতের শিক্ষা হল, আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করুন।

তৃতীয় আয়াতের শিক্ষা

তৃতীয় আয়াতটি সূরা আহযাবের।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

'হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর (তাকওয়া অবলম্বন কর) এবং সত্য-সঠিক কথা বল। এরূপ করলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মসমূহ সংশোধন করে দেবেন। (এবং তোমাদের সকল কাজ সমাধা করে দেবেন) আর তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই সফলতা লাভ করবে'। (সূরা আহযাব : ৭০-৭১)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুত্‌বায় এ তিনওটি আয়াত পড়তে বলতেন। কাজেই ভেবে দেখা দরকার, তিনি বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এ আয়াত তিনটিকে কেন বেছে নিয়েছিলেন। বিশেষত যখন কুরআন মাজীদে বিবাহসংক্রান্ত আরও বহু আয়াত রয়েছে এবং এ তিন আয়াতে কোথাও সরাসরি বিবাহের উল্লেখ নেই?

তিনও আয়াতে তাক্‌ওয়ার উল্লেখ

লক্ষ করলে দেখা যায়, সাধারণভাবে তিনওটি আয়াতে যে বিষয়টির উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে তাক্‌ওয়া। তাক্‌ওয়া দ্বারাই তিনওটি আয়াতের সূচনা। বোঝা যাচ্ছে, বিবাহে এ আয়াত তিনটি দ্বারা বিশেষভাবে তাক্‌ওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু তা কেন? তা এজন্য যে, লোকে সাধারণত বিবাহের বিষয়টাকে দ্বীনের বাইরে কেবলই পার্থিব বিষয় মনে করে। ফলে এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশাবলীকে তারা অগ্রাহ্য করে। বিবাহের আগে তো বটেই, এমনকি বিবাহের সময় এবং বিবাহের পরেও তারা এসংক্রান্ত বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ করে না। এ কারণেই বিবাহানুষ্ঠানে বিশেষভাবে তাক্‌ওয়া অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিবাহের সম্পর্ক বা দাম্পত্য জীবন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে শান্তিপূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না উভয়ের অন্তরে তাক্‌ওয়া সক্রিয় থাকে। তাক্‌ওয়া ছাড়া একে অন্যের হক যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে তা আদায়েরও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

দাম্পত্য জীবনের তিনটি স্তর আছে। একটি বিবাহের আগের, একটি বিবাহকালীন এবং একটি তার পরের। এ তিনও ধাপে আমরা দ্বীনকে পাশ কাটিয়ে চলছি। কেবল এতটুকু করেই ক্ষান্ত হই যে, বিবাহের সময় কোন মৌলভী সাহেবকে ডেকে তার দ্বারা খুত্‌বা পড়িয়ে নেই, যাতে এ আয়াত তিনটি থাকে। আর এভাবে তার মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করিয়ে নেই। কিন্তু বিবাহের আগে কী করণীয় আর আমরা কী করছি এবং ঠিক বিবাহের মুহূর্তেইবা কী করছি? বিবাহের পর কী করা হয়ে থাকে? যা কিছু করা হয়, না আল্লাহ তা'আলার সংগে তার কোন সম্পর্ক আছে, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে। অথচ বিবাহ একটি ইবাদত এবং একটি ছওয়াবের কাজ।

বিবাহ প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের একটি সহজ উপায়

ইসলামী শরী'আতে আল্লাহ তা'আলা বিবাহকে খুবই সহজ করে দিয়েছেন। এর চে' বেশি সহজ আর কোন ব্যবস্থা হতে পারে না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, তাতে আমাদের স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রাখা হয়েছে। এটা তো স্পষ্ট যে, সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা নারীর প্রতি পুরুষের মনে এবং পুরুষের প্রতি নারীর মনে আকর্ষণ দিয়ে রেখেছেন। সেই আকর্ষণের কারণেই দুয়ে মিলে একত্রে জীবন-যাপন করা নারী-পুরুষের এক স্বভাবগত চাহিদা। কোন কোন ধর্ম তো একে শয়তানী চাহিদা ঠাওরিয়ে এ আকর্ষণের নিন্দা করেছে। সেসব ধর্ম অনুযায়ী এ চাহিদাকে নির্মূল না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়। এ ধারণা থেকেই বৈরাগ্যবাদের উৎপত্তি, যার সারকথা হল, বিয়ে-শাদি করো না। সংসারবিমুখ হয়ে সম্পূর্ণ একাকি জীবন কাটিয়ে দাও। কিন্তু ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। এটা স্বভাবধর্ম। এ ধর্ম জানে, পারস্পারিক এ আকর্ষণ সম্পূর্ণ স্বভাবগত বিষয়। স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করলে স্বভাব তখন নিজ চাহিদ পূরণের জন্য নাজায়েয ও হারাম পন্থা খুঁজে নেয়। সুতরাং চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ইসলাম স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ না করে বরং স্বভাবসম্মত পন্থা দান করেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

'হে নবী ! আপনার আগেও আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রীও দিয়েছি এবং সন্তান-সন্ততিও।' (সূরা রা'দ : ৩৮)

কাজেই স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ করে একা জীবন-যাপন করা ইসলামসম্মত নয়। বরং তাদেরকে নিয়ে তাদের মধ্যেই জীবন-যাপন করতে হবে। এটাই স্বভাবের দাবি। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই স্বভাবগত চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং সে ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন। তার জন্য বিশেষ কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেননি।

খুত্‌বা বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় – সুন্নত

সুতরাং বিবাহকালে খুত্‌বা পড়া অপরিহার্য কোন শর্ত নয়। এটা ওয়াজিব বা ফরয নয়। হ্যাঁ সুন্নত অবশ্যই। যদি দু'জন নর-নারী পরস্পরে ঈজাব-কবূল করে নেয় এবং সেই মজলিসে দু'জন পুরুষ সাক্ষী বা একজন পুরুষ ও

দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের একজন অন্যজনের জন্য হালাল হয়ে যাবে। এমনই সহজ আল্লাহ তা'আলা এ বিবাহকে করে দিয়েছেন। আর তা এজন্য করেছেন, যাতে স্বভাবগত চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে বিশেষ বেগ পেতে না হয়। একদম সহজ-সরল ইসলামী বিবাহ। না এতে বাগদান শর্ত, না সাজসজ্জা, না অনুষ্ঠানের দরকার হয়, না লোক সমাবেশের। কোনও রকমের দাওয়াত-নিমন্ত্রণও এর জন্য অপরিহার্য নয়।

বিবাহ যেভাবে বরকতপূর্ণ হয়

এক হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

'সর্বাপেক্ষা বেশি বরকতপূর্ণ বিবাহ সেটি, যাতে খরচ কম'।

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ২৩৩৮৮)

অর্থাৎ- যে বিবাহে বেশি আড়ম্বর করা হয় না, আল্লাহ তা'আলা তাতেই বেশি বরকত দান করেন।

নবীযুগের বিবাহ

শরী'আত বিবাহকে যত বেশি সহজ করেছে, আমরা একে তত বেশি কঠিন করে ফেলেছি। বর্তমানকালে বিবাহ একটা আযাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাসের পর মাস বরং বছরের পর বছর এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়, লাখ-লাখ টাকা খরচ করতে হয়। এ ছাড়া বিবাহ হয় না। অথচ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এটা কতই না সহজ ছিল। শুনুন সেকালের কিছু ঘটনা।

হযরত 'আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন বিখ্যাত সাহাবী। আশারায়ে মুবাশ্শারা অর্থাৎ সেই দশজন সাহাবীর অন্যতম, যাদের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় এক সংগে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তারা জান্নাতবাসী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সব সাহাবীরই গভীর সম্পর্কে ছিল। তারপরও এই দশজন ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট। হযরত 'আব্দুর-রহমান ইবন 'আওফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও তাদের একজন।

হাদীছ শরীফে আছে, একবার তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হলে তার জামায় হলুদ দাগ দেখা গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জামায় এ

হলুদ দাগ কিসের? উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বিবাহ করেছি। বিবাহের কারণে যে খোশবু লাগিয়েছিলাম, এটা তার দাগ। তিনি তাঁর জন্য দু'আ করলেন। بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَعَلَيْكَ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন। তারপর বললেন, أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ 'ওলিমা কর; একটা ছাগল দিয়েই হোক না কেন'।

(বুখারী, হাদীছ ১৯০৭ : মুসলিম, হাদীছ ২৫৫৬ : তিরমিযী, হাদীছ ১০১৪ : নাসাঈ, হাদীছ ৩২৯ : আবূ দাউদ, হাদীছ ১৮০৪ : ইবন মাজা, হাদীছ ১৮৯৭ : আহমাদ, ১২২২৪)

এ অনাড়ম্বরতা আপনিও গ্রহণ করুন

চিন্তা করে দেখুন, হযরত 'আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ র়াযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে তার আত্মীয়তাও ছিল এবং তিনি আশারায়ে মুবাশশারার একজন। তা সত্ত্বেও নিজ বিবাহে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকেননি। তাঁকে ছাড়াই তিনি বিবাহ করেছেন এবং বিবাহের পরও নিজ গরজে তাকে জানাননি; বরং তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে জানিয়েছেন। তাই বলে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অভিযোগ করেছেন যে, তুমি তো নিজে নিজেই বিয়ে করলে আমাকে ডাকলে না? তা তো করেনইনি, বরং দু'আ করেছেন, بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَعَلَيْكَ (আল্লাহ তা'আলা এ বিবাহে তোমাকে বরকত দান করুন) সেই সংগে হুকুম দিয়েছেন, একটা ছাগল যবাহ করে হলেও ওলীমা কর।

আজকাল যদি কেউ এভাবে বিবাহ করে এবং তাতে নিজের ঘনিষ্ঠ লোকদেরকে দাওয়াত না করে, চিন্তা করে দেখুন তার অবস্থা কি দাঁড়ায়। কত অভিযোগ ও কত সমালোচনা তার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যাবে। এত বড় কথা! নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলল ! আমাদেরকে জানাল না পর্যন্ত ! অথচ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন অভিযোগ করেননি।

হযরত জাবির (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন আনসারী সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ প্রিয়পাত্র। হাদীছের কিতাবসমূহে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধ শেষে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফিরে আসছিলেন। তাঁর উটটি ছিল অত্যন্ত ধীরগতি। তিনি দ্রুত হাঁকানোর চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু সেটি চলছিল

না। কাফেলার সকলে সামনে চলে গেল আর তিনি পেছনে পড়ে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন, তিনি বারবার পেছনে পড়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর কাছে চলে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাফেলার সাথে কেন চলছ না? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটটি ভালো চলছে না। আমি একে দ্রুত চালানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু এটি পেছনে পড়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটবর্তী ঝোঁপ থেকে একটা লাঠি ভেংগে নিলেন এবং চাবুকের মত সেটি দিয়ে উটটিকে মৃদু একটা আঘাত করলেন। যেই না তিনি আঘাত করলেন অমনি তাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এমনই দ্রুত সেটি ছুটতে শুরু করল যে, গোটা কাফেলাকে পেছনে ফেলে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফের তাঁর কাছে পৌছলেন। বললেন, এবার তো তোমার উট খুব দৌড়াচ্ছে। হযরত জাবির (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বরকতে এটা দ্রুতগামী হয়ে গেছে। এখন কাফেলার সকলের আগে ছুটছে।

তিনি বললেন, এটি তো খুবই ভালো উট। আমার কাছে বেচবে কি? হযরত জাবির (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিক্রির কি প্রয়োজন; আপনার পছন্দ হলে এটি আমি আপনাকে হাদিয়া দিলাম। আপনি কবুল করুন। তিনি বললেন, হাদিয়া নয়; বরং দাম দিয়েই নেব। বিক্রি করতে চাও তো বল। হযরত জাবির (রাযি.) বললেন, অগত্যা যদি কিনতেই চান, আপনার যা ইচ্ছা একটা দাম দিয়ে দিন। বললেন, না, তুমিই বল, কি দাম হলে বেচবে। হযরত জাবির (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক উকিয়া রূপা (প্রায় চল্লিশ দিরহাম) হলে বিক্রি করব। তিনি বললেন, তুমি খুব বেশি দাম চাইলে। এ দামে তো আরও অনেক বড় উট কেনা যায়। জাবির (রাযি.) বললেন, আপনার যা ইচ্ছা দিন। তিনি বললেন, আচ্ছা এক উকিয়া রূপার বিনিময়েই কিনলাম; মদীনায় পৌছে দাম পরিশোধ করব।

হযরত জাবির (রাযি.) উট থেকে নেমে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নামলে কেন? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, উটটি তো আপনি কিনে নিয়েছেন। এখন এটা আপনার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে কি তুমি পায়ে হেটে মদীনায় ফিরবে? তার চে' বরং তুমি উটে চড়েই আস। মদীনায় পৌছে এটি আমাকে দিও এবং দামও আমি তখনই আদায় করব।

মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছে তিনি উটটি নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাম হিসেবে এক উকিয়া রূপা তাকে পরিশোধ করলেন। তারপর দাম নিয়ে যখন

ফিরে যাচ্ছিলেন, আবার ডেকে পাঠালেন এবং উটটিও তাঁকে দিয়ে দিলেন বস্তুত এটা ছিল বেচাকেনার ছলে তাঁর প্রতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক অনুদান।

হযরত জাবির (রাযি.)-এর বিবাহ

হাদীছ শরীফে আছে, উটটি যখন দ্রুত চলছিল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সাথে চলছিলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ? জাবির (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যুদ্ধে আসার কিছু আগে আমি বিয়ে করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন কুমারীকে বিবাহ করেছ, না পূর্ব বিবাহিতাকে? উত্তর দিলেন, এক পূর্ববিবাহিতাকে। তার পূর্বের স্বামী ইন্তিকাল করেছে। তারপর আমি তাকে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কুমারীকে বিবাহ করলে না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতার তো ইন্তিকাল হয়ে গেছে। (তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন) আমার ছোট ছোট বোন আছে। তাই আমার এমন এক মহিলার দরকার ছিল, যে তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। অল্প বয়সের কোন মেয়েকে বিয়ে করলে সে ঠিকমত তাদের পরিচর্যা করতে পারবে না। সে জন্যেই এক বিধবাকে বিবাহ করা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হলেন। তিনি তার জন্য দু'আ করলেন–

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَعَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বরকত দান করুন এবং মহব্বত ও ভালোবাসার সাথে তোমাদের মিলিয়ে রাখুন'।

(বুখারী, হাদীছ ৪৯৪৮ : মুসলিম, হাদীস ২৬৬৪ :
মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ১৪৪৮২)

বিষয়টা ভেবে দেখুন, হযরত জাবির (রাযি.) যুদ্ধে যাওয়ার আগে মদীনা মুনাওয়ারায় বিবাহ করেছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত রয়েছেন। তারপব তাঁর সাথেই তিনি যুদ্ধে যোগদান করলেন। যাওয়ার পথে তো নয়ই, ফেরার পথেও নিজের পক্ষ থেকে তিনি এ সম্পর্কে তাঁকে কিছু জানাচ্ছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যখন তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বিবাহ করেছেন কিনা, কেবল তখনই জানালেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বিবাহ করেছি। এর আগ পর্যন্ত তিনি তাঁকে বিবাহের মজলিসে তো ডাকেনইনি, বিবাহ করেছেন এই খবরটুকু পর্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্চ করেননি যে, তুমি আমাকে ডাকলে না কেন।

অন্যদেরকে ডাকার রেওয়াজ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমগ্র জীবনে বিয়ে-শাদির এই সাদামাঠা দৃশ্যই চোখে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা এ বিধানটিকে যেমন সহজ-সরল রূপে দিয়েছিলেন, সাহাবায়ে কিরামও বিষয়টিকে ঠিক সেভাবেই রেখেছিলেন। তাঁরা অনুষ্ঠানের আড়ম্বরতা ও দাওয়াত-নিমন্ত্রণের ঘটার পেছনে পড়েননি। সবটাই সহজ-সরলভাবে সম্পাদন করেছেন। আমি বলছি না, বিবাহে বড়দেরকে ডাকা ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করা হারাম ও নাজায়েয। হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বিবাহকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আবূ বকর ও উমরকে ডাক। ফাতিমার বিবাহ হবে। এভাবে তিনি বিশেষ বিশেষ লোককে ডেকেছিলেন। সুতরাং এটাও জায়েয। কথা হচ্ছে বাড়াবাড়ি নিয়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক না আসবে, যতক্ষণ এই এই শর্ত পূরণ না হবে এবং এই এই প্রথা ও রসম-রেওয়াজ পালন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ হতে পারবে না এ জাতীয় বাড়াবাড়ির কোন সুযোগ শরী'আতে নেই।

বর্তমানে আমরা সহজকেও কঠিন বানিয়ে ফেলেছি

আমরা বিবাহকে বড় কঠিন বানিয়ে ফেলেছি। ফলে হালালের দরজা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আর তাতে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। যখন হালালের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি, স্বাভাবিকভাবেই হারামের দরজা খুলে যাচ্ছে। বর্তমানকালে কেউ হালাল পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তাতে রাজ্যের প্রতিবন্ধকতা। তারপর গ্যাটের পয়সা খরচ। লাখ-লাখ টাকা ব্যয় না করলে হালাল পন্থা অবলম্বন করা যায় না। এরই কুফল হল হারামের প্রতি মানুষের ঝোঁক। হালালকে কঠিন করে ফেলার কারণে হারামের দরজা খুলে গেছে আর সেই দরজা দিয়ে সমাজে কদর্যতার ক্রম বিস্তার ঘটছে।

তিনটি কাজে বিলম্ব পরিহার করুন

একটি হাদীছ সর্বক্ষণ মনে রাখার মত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 'আলী (রাযি.)কে লক্ষ করে বললেন–

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا اَلصَّلَاةُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا

'তিনটি জিনিসে কখনও বিলম্ব করো না। নামাযে, যখন তার ওয়াক্ত হয়ে যায়। জানাযায়, যখন তা হাজির হয়ে যায় আর সাবালিকার বিবাহে, যখন উপযুক্ত পাত্র পেয়ে যাও।' (তিরমিযী, হাদীছ ১৫৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ৭৮৭)

জানাযা প্রস্তুত হয়ে গেলে জানাযার নামাযে দেরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। শরীআতে জানাযার নামায আদায়ে দেরি না করা ও যথাসম্ভব শীঘ্র আদায়ের জোর তাগিদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, নামাযের জামাত প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার সময় যদি জানাযা এসে যায়, তবে জামাতের সাথে ফরয আদায়ের পর সুন্নতের জন্যও আর দেরি করা যাবে না; বরং প্রথমে জানাযার নামায পড়া হবে, তারপর সুন্নত পড়া হবে। কেউ কেউ বলেন, ফরযের পর সুন্নতও পড়া জায়েয আছে, কিন্তু নফলে লিপ্ত হয়ে জানাযায় বিলম্ব ঘটানো জায়েয হবে না। এরই উপর ফতোয়া। অনেকের এ মাসআলা জানা নেই। তারা ফরয নামাযের পর জানাযার ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও নফলে লিপ্ত হয়ে পড়ে; অথচ নফলের কারণে জানাযায় দেরি করা জায়েয নয়।

এ হাদীছে ওয়াক্ত অর্থাৎ মুস্তাহাব ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর নামায আদায়ে দেরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নামায পড়ে নিতে হবে। তাতে পরে সময় থাকুক বা না থাকুক এবং পরিস্থিতি অনুকূলে থাকুক বা না থাকুক।

তৃতীয় নির্দেশ হল, মেয়ে বড় হয়ে গেলে যদি উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায়, তবে বিবাহে দেরি করবে না। উল্লিখিত হাদীছে বিশেষভাবে এ তিনটি কাজে বিলম্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্য এক হাদীছে আছে–

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

'তোমাদের কাছে যদি এমন কোন পাত্র প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারী ও আখলাক-চরিত্রে তোমরা খুশি, তবে তার সাথে মেয়ের বিয়ে দাও। তা যদি না কর, তবে যমীনে ফিতনা দেখা দেবে ও মহা অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়বে।'

(তিরমিযী, হাদীছ ১০০৫)

সেই অনিষ্ট হল হারামের বিস্তার। যখন হালালের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হবে, অনিবার্যভাবে হারামের পথ খুলে যাবে।

ফুযুল রসম-রেওয়াজ ছেড়ে দিন

বলছিলাম, শরীআত বিবাহকে যতটা সহজ করে দিয়েছিল, আমরা তাকে ততটাই কঠিন বানিয়ে ফেলেছি। নানা আনুষ্ঠানিকতায় জড়িয়ে একে একটা আযাবে পরিণত করেছি। আল্লাহই জানেন, এতে নিজেদের পক্ষ থেকে কত

রকমের রসম-রেওয়াজ আমরা চালু করে দিয়েছি। প্রথমে বাগদান (এনগেজমেইন্ট) হতে হবে। তাতে এই এই আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। তারপর গায়ে হলুদ হবে। তাতে নানা আয়োজন থাকবে। এসব রসম পালন না করে বিবাহ হতে পারে না। আমরা মনগড়াভাবে এসব প্রথা চালু করে দিয়েছি। এরই পরিণামে এখন আর বিবাহে সেই বরকত নেই; বরং নানা বেবরকতি দেখা যাচ্ছে।

বিবাহ প্রকাশ্যে হওয়া চাই

দ্বিতীয় হল বিবাহকালীন অবস্থা। এ সময় কিছু করণীয় বিষয় আছে। আমি আগেই বলেছি, বিবাহ একটি ইবাদত। এ ইবাদত সম্পাদনের জন্য যেসব কাজ জরুরি তার একটি হল প্রকাশ্য ঘোষণা। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَعْلِنُوا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ

'তোমরা এ বিবাহের ঘোষণা দাও এবং তা মসজিদে সম্পাদন কর।'

(তিরমিযী, হাদীছ ১০০৯ : ইবন মাজা, হাদীছ ১৮৮৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ১৫৫৪৫)

বিবাহের ঘোষণা দেওয়ার অর্থ তা প্রকাশ্যে সম্পাদন করা। হালাল ও হারামের মধ্যে এটাই পার্থক্য যে, হারাম কাজ লুকিয়ে করা হয়, সকলের অজান্তে গোপনে সেরে ফেলা হয়। বিবাহ কোন হারাম কাজ নয়। একটা বৈধ কাজ ও ইবাদত। তাই শরীআত প্রকাশ্যে সম্পাদন করার আদেশ দিয়েছে, যাতে সকলে জানতে পারে, অমুকের সাথে অমুকের বিয়ে হয়ে গেছে এবং কারও মনে কোন রকম সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ না থাকে।

এ হাদীছের দ্বিতীয় নির্দেশ হল, বিবাহ মসজিদে সম্পাদন কর। এটাও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। বিবাহ যেহেতু একটা 'ইবাদত ও আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন, তাই নামাযের মত বিবাহকেও মসজিদে সম্পাদন করতে বলা হয়েছে। নামায এক 'ইবাদত, শরীআতের হুকুম হল তা মসজিদে আদায় কর। তেমনি বিবাহও এক ইবাদত। এ ব্যাপারে হুকুম হলো, তা মসজিদে অনুষ্ঠিত কর। এটাও সুন্নত।

বিবাহের পর মসজিদে শোরগোল

তবে এস্থলে আরও একটি মাসআলা জেনে নিন। নবী হওয়ার কারণেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি এ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

মসজিদে বিবাহানুষ্ঠানের আদেশ সংক্রান্ত অপর এক হাদীছে তিনি আরও ইরশাদ করেন—

وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ

'হাটবাজারের মত কোলাহল থেকে বিরত থাক।'

(মুসলিম, হাদীছ ৬৫৫; তিরমিযী, হাদীছ ২১১; আবূ দাঊদ, হাদীছ ৫৭৭)

বর্তমানকালে মসজিদে বিবাহানুষ্ঠানের রেওয়াজ পাচ্ছে। এটা একটা আশার কথা। কিন্তু সেই সংগে হাদীছের দ্বিতীয় অংশের প্রতিও লক্ষ থাকা উচিত ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহকে মসজিদে অনুষ্ঠিত করার আদেশ দানের সাথে এদিকেও তো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, মসজিদে এটা অনুষ্ঠিত করতে গিয়ে যেন বাজারের মত হইচই না হয়। কিন্তু আজকাল এদিকে লক্ষ রাখা হয় না। দেখা যায়, বিবাহ হয়ে যাওয়ার সাথে-সাথে মসজিদ গরম হয়ে যায়। এক সাথে সকলে হইচই শুরু করে দেয়। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মানুষ এ আদেশ পালন করতে গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। মসজিদে হট্টগোল করা গুনাহ। মানুষ পাছে এ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাই আগেভাগেই সাবধান করে দিয়েছেন, হাটবাজারের মত কোলাহল থেকে মসজিদকে রক্ষা কর।

'ইবাদতে গুনাহের মিশ্রণ

বিবাহ যখন একটি 'ইবাদত, তখন 'ইবাদতের মর্যাদা দিয়েই একে সম্পাদন করতে হবে। সাবধান থাকতে হবে, যাতে এ 'ইবাদত গুনাহের মিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকে। কি আশ্চর্য ! একদিকে 'ইবাদতও হচ্ছে, অন্যদিকে হারাম কাজও করা হচ্ছে, গুনাহও হচ্ছে। এটা যেন এ রকমের যে, এক ব্যক্তি নামাযও পড়ছে আবার সেই সাথে রেকর্ড চালু করে গানও শুনছে। একই সাথে নামায ও গানবাদ্য চলছে। বাস্তবে এটা ভাবা যায় না। কেননা, একজন লোক, সে যেমনই হোক না কেন, অনন্তপক্ষে নামায পড়ার সময় গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। নামায পড়ার সময় সামনে ছবি থাকলে তা সরিয়ে দেবে এবং গানবাদ্য চললে তা বন্ধ করে দেবে।

এক সময় হিন্দুস্তানে নামায আদায়কালে কোন কাফের মসজিদের সামনে বাদ্য বাজালে দাঙ্গা লেগে যেত। মুসলিমগণ তার প্রতিরোধে জান দিয়ে দিত। কিন্তু এখনকার অবস্থা কতইনা দুঃখজনক। নিজেরাই এখন মসজিদের সামনে গানবাদ্য চালাচ্ছে।

বলছিলাম, নামায ও 'ইবাদতকালে মানুষ বিশেষ লক্ষ রাখবে যাতে কোন গুনাহের কাজ না হয়ে যায়।

বিবাহের মজলিস যেন থাকে গুনাহমুক্ত

বিবাহ একটি ইবাদত। এর দাবি হল বিবাহের মজলিস সব রকম গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবে। এটা ইবাদতের মজলিস, সুন্নত আদায়ের মজলিস এবং ছওয়াব ও পুণ্যার্জনের মজলিস। এ মজলিসে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত নাযিল হয়। এ রকম এক পবিত্র মজলিস গুনাহের দ্বারা অপবিত্র হয়ে যাবে তা মেনে নেওয়া যায় না। কাজেই একে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে পবিত্র রাখার অংগীকার নিতে হবে।

আমরা এ মজলিসকে পঙ্কিল করে ফেলেছি। এতে সব ধরনের গুনাহ হচ্ছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হচ্ছে। মহিলারা সেজেগুজে সর্বসমক্ষে আসছে। আবার সেই সাথে বিবাহের 'ইবাদতও হচ্ছে'। এটা কী ধরনের ইবাদত এটা সুন্নতের কেমন অনুসরণ?

আয়াতে তো নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে 'আল্লাহকে ভয় কর'। বিবাহ সম্পাদন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানির সাথে বিবাহ সম্পন্ন করা হলে তাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রহমত ও বরকত কিভাবে লাভ হতে পারে? বরকত কেবল তখনই হতে পারে, যখন বিবাহনুষ্ঠানে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা হবে, তাঁর হুকুম পালন করা হবে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে সাদাসিধাভাবে তা সম্পন্ন করা হবে। সেই সাথে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বিবাহানুষ্ঠানকে মুক্ত রাখা হবে। অনুষ্ঠান করা ও মানুষজনকে ডাকা গুনাহের কাজ নয়। দাওয়াত করতে কোন সমস্যা নেই। এসবই করা হোক। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোন গুনাহের কাজ না হয়। কেননা, বিবাহ একটা ইবাদত। এটা করা হয় বৈধ পন্থায় স্বভাবগত চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করার জন্য। এর সাথে কোন গুনাহের কাজ করা হলে তা বিবাহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। সুতরাং বিবাহের মজলিসকে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য তাক্‌ওয়া অপরিহার্য

তৃতীয় ধাপ হল বিবাহের পরবর্তীকালীন। এসময় তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা জরুরি। আমার পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে তাক্‌ওয়া ও আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না। চিন্তা করে দেখুন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কি রকমের। এ সম্পর্ক এমনই ঘনিষ্ঠ যে, অন্য কোনও ক্ষেত্রে দু'জন মানুষের মধ্যে এরকম ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করা যায় না এবং তা হওয়া সম্ভব নয়। তারা দু'জন পরস্পরে একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে থাকে। একে অন্যের

এতটাই কাছের, যার চে' বেশি কাছের ইহজগতে কেউ কারও হতে পারে না। এই সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতার সময়, যখন তারা অন্য কারও দৃষ্টির সামনে থাকে না, যদি একজন অন্যজনকে কোন রকম কষ্ট দেয় বা একে অন্যের হক নষ্ট করে, তবে সেই অন্যায় আচরণে বাধা সৃষ্টি করবে এমন কে আছে, না কারও পক্ষে তা সম্ভব ?

মানুষের পারস্পারিক হক ও অধিকারসমূহ সমপর্যায়ের নয়। কোন কোন হক এমনও আছে, যা নষ্ট করা হলে পুলিশের মাধ্যমে তা উসূল করা যায়। কিংবা আদালতে মামলা দায়ের করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক হকসমূহের অধিকাংশই সে রকমের নয়। সেজন্য পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া যায় না এবং আদালতেরও আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয় না। আদালত বড়জোর খোরপোষ ও মোহরানা আদায়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীর সামনে ভার হয়ে থাকে বা রূঢ় ভাষায় কথা বলে আর এভাবে অনবরত স্ত্রীর মনে আঘাত দিতে থাকে, তবে তা বন্ধ করার উপায় কি হতে পারে? কোন আদালত বা পুলিশ এসে এর সুরাহা করে দিয়ে যাবে? এমন কি আছে, যা স্ত্রীর সে মনোবেদনা দূর করতে ভূমিকা রাখতে পারে ?

এমন কিছু যদি থাকে, তবে তা কেবল একটা জিনিসই। তাহলো তাক্ওয়া বা আল্লাহভীতি। কেবল আল্লাহর ভয়ই পারে সকল অন্যায় আচরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে। স্বামীর অন্তরে যখন এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই স্ত্রীর জীবনকে আমার সংগে জড়িয়ে দিয়েছেন; আমার উপর তার কিছু হক আছে, যা আমাকে আদায় করতে হবে, তা আদায় না করলে আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তখন মুক্তির কোন উপায় থাকবে না। এ অনুভূতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষের দ্বারা স্ত্রীর যাবতীয় হক আদায় হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতি একমাত্র শক্তি, যা স্ত্রীর হক আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারে। কোন আদালত বা পুলিশের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

হিংস্র পশুর স্বভাব

আমার এক সহপাঠী ছিল। একবার সে গর্বচ্ছলে বলছিল, আমি যখন ঘরে ঢুকি, স্ত্রী বা সন্তানদের সাহস হয় না, আমার সাথে কোন কথা বলবে বা আমার কথা অমান্য করবে। সে এই বলে নিজের পৌরুষ জাহির করছিল। আমি তাকে বললাম, তুমি যা বললে, এটা কোন হিংস্র জীবের চরিত্র হতে পারে, সত্যিকার কোন মানুষের চরিত্র হতে পারে না।

মানুষের চরিত্র তো হবে অন্যরকম, যে রকম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিল। আম্মাজান হযরত 'আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন, যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে আসতেন, তাঁর পবিত্র চেহারা থাকত প্রফুল্ল, মুখে থাকত মুচকি হাসি। আমি যতকাল তাঁর সাথে কাটিয়েছি, কখনও তিনি আমাকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেননি।

(সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭ম খণ্ড, ১২১; কানযুল-উম্মাল, হাদীছ ১৮৭১৯)

হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.)-এর কারামত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করে দেখিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে এটাই মানুষের কাজ। অন্তরে তাক্ওয়া না থাকলে এরূপ কাজ করে দেখানো সম্ভব নয়। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, এরূপ অসাধারণ দৃষ্টান্ত পেশ কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব। আমার শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি – আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উঁচু মর্যাদা দান করুন – নিজ কর্মপন্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন, পঞ্চান্ন বছর হয়েছে বিয়ে করেছি; কিন্তু আজ পর্যন্ত পরিবারের সাথে এমন কোন আচরণের অবকাশ আসেনি, যাতে রাগত স্বরে কথা বলতে হয়েছে। মানুষ তো বাতাসে উড়ে চলা বা আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়াকে কারামত মনে করে; কিন্তু প্রকৃত কারামত তো হযরত শায়খ (রহ.)-এর এ আচরণ। পঞ্চান্ন বছরের দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সাথে রাগত স্বরে কথা না বলা চরিত্রের কি দৃঢ়তা প্রমাণ করে ভেবে দেখুন তো! প্রকৃত কারামত তো এটাই।

হযরত শায়খ (রহ.)-এর মুহ্তারামা স্ত্রী নিজেই বলতেন, সারা জীবনে হযরত (রহ.) আমাকে কখনও কোন কাজের আদেশ করেননি। কখনও বলেননি, আমাকে পানি দাও বা এ কাজটি করে দাও; বরং আমি নিজ আগ্রহেই যা করার করেছি।

বস্তুত স্ত্রীর সংগে রাগতস্বরে কথা না বলার মত উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ কেবল তাক্ওয়ার ভিত্তিতেই হতে পারে। অন্তরে যখন আল্লাহভীতির প্রহরা থাকে, কেবল তখনই মানুষের দ্বারা এ রকম সুষ্ঠু ও শুদ্ধ আচরণ সম্ভব হয়। কোন পুলিশী পাহারা বা আদালতের খবরদারিতে এটা সম্ভব নয়।

স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কে ?

এমনিভাবে স্ত্রী যদি স্বামীকে কষ্ট দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে যায়, তাকেইবা রুখতে পারে কে? কোন আদালত বা পুলিশের পক্ষে কি তা সম্ভব?

কস্মিনকালেও তা সম্ভব নয়। তাকে রুখতে পারে কেবল একটা জিনিসই, যা স্বামীকে তার অন্যায়-অনাচার থেকে রোখার শক্তি রাখে। অর্থাৎ তাক্‌ওয়া ও আল্লাহভীতি।

এ কারণেই জীবনপথের এই নতুন বাঁকে, এই নাজুক ও স্পর্শকাতর ধাপে বিশেষভাবে আল্লাহভীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। সুতরাং খুত্‌বার যে সুন্নতসম্মত বিধান আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাতে তাক্‌ওয়াসংক্রান্ত তিনটি আয়াতই বেছে নেওয়া হয়েছে। তাতে অত্যন্ত জোরালো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি কর এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার চেতনা সঞ্চার কর। তবেই তোমরা একে অন্যের হক আদায়ে সক্ষম হবে। অন্যথায় তা আদায় করা কখনও সম্ভব হবে না।

যে কোনও কাজের সুষ্ঠুতা তাক্‌ওয়ার মধ্যেই নিহিত

সত্য কথা হচ্ছে, তাক্‌ওয়া ও আল্লাহভীতি ছাড়া দুনিয়ার কোন কাজই বিশুদ্ধভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। বিশেষত বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক হকসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহভীতিই পারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে। তা ছাড়া এ হক পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হওয়া সম্ভব নয়। যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শে দৃষ্টি থাকে, অন্তরে সুন্নত মেনে চলার প্রেরণা থাকে, হৃদয়-মন আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত থাকে এবং থাকে আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি, তবেই পারস্পরিক হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় হতে পারে। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, প্রতিটি হকের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা তা কতটুকু আদায় করেছ এবং এক্ষেত্রে কোন আত্মীয়ের সাথে কিরকম ব্যবহার করেছ?

বিবাহ করা সুন্নত

বিবাহের খুত্‌বায় উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ ছাড়া কিছু হাদীছও পড়া হয়। সুতরাং আমি একটি হাদীছ পড়েছি–

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ

'বিবাহ আমার সুন্নত'। (ইবনে মাজা, হাদীছ ১৮৩৬)

এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, বিবাহ কেবল দুনিয়াদারী কাজ নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা এ কাজে ছওয়াবও রেখেছেন। তাই এটা একটা ইবাদতও বটে।

এর দ্বারা আরও একটা জিনিস স্পষ্ট হয় যে, যে সকল কাজকে আমরা কেবল পার্থিব বিষয় মনে করি, তাতে যদি দৃষ্টিকোণ ও নিয়ত বদলে ফেলা যায় এবং সঠিক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তবে সেই কাজই দ্বীন বনে যায় এবং তাতে ছওয়াব পাওয়া যায়। সেই হিসেবে যেমন এ বিবাহও দ্বীন, তেমনি বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, চাকরি-বাকরি, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে আনন্দ-ফুর্তি সবই দ্বীন। শর্ত একটাই, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা। আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার নিয়ত থাকলে পানাহার করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা ও অন্যসব দুনিয়াবী কাজ করাও দ্বীন হয়ে যায় এবং তাতে অশেষ পুণ্য লাভ হয়।

বিবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন বংশের মধ্যে প্রীতিবন্ধন হয়

দ্বিতীয় যে হাদীছটি পড়েছিলাম, তা হচ্ছে-

لَمْ تُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দুই গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি থাকলে তা সুদৃঢ় করার জন্য বিবাহের মত কার্যকর কোন জিনিস দেখা যায়নি। (ইবনে মাজা, হাদীছ ১৮৩৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৪/১২৮)

বিবাহ দ্বারা নতুন আত্মীয়তা জন্ম নেয় এবং দুই গোত্রের মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে পূর্বে যে সুসম্পর্ক ছিল তা আরও প্রাণবন্ত ও পরিপক্ক হয় আর এভাবে পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি আরও বরকতময় হয়ে উঠে। তবে এর জন্য উভয় পক্ষে তাক্ওয়া-পরহেযগারি থাকা এবং একে অন্যের হক আদায়ে যত্নবান থাকা শর্ত।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহুবিবাহের পেছনে এ কারণটিও কার্যকর ছিল। অর্থাৎ আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তিনি সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি সেসব গোত্রে বিবাহ করেন। সেকালে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপনের রেওয়াজ ছিল। কেউ কোন গোত্রে বিবাহ করলে সেই গোত্রের সাথে তার মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠত। যদি পূর্ব থেকেই সম্পর্ক থাকত, তবে বিবাহের মাধ্যমে সে সম্পর্ক আরও পাকাপোক্ত হত।

দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হল পুণ্যবতী স্ত্রী

আমি তৃতীয় যে হাদীছটি পড়েছি, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

'দুনিয়ার সবটাই সম্পদ ও উপকার লাভের জিনিস। আর দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল পুণ্যবতী স্ত্রী।'

(মুসলিম- হাদীছ ২৬৬৮; নাসায়ী- হাদীছ ৩১৮০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ৬২৭৯)

আল্লাহ তা'আলা এ জগতকে মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। এর সব কিছুই মানুষের জন্য কল্যাণকর যদি বৈধ পন্থায় ব্যবহার করা হয়। মানুষ যাতে বৈধপন্থায় উপকৃত হতে পারে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার যা দ্বারা লাভ করা যায়, তা হচ্ছে ভালো স্ত্রী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেককার স্ত্রীকে সবচে' বড় নিআমত সাব্যস্ত করেছেন।

শাইখুল ইসলাম 'আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উছমানী (রহ.) বলতেন, স্বামী-স্ত্রী যদি হয় এক ও নেক সেটাই দুনিয়ার জান্নাত। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যদি থাকে ঐক্য ও মহব্বত এবং উভয়েই হয় নেক ও দ্বীনদার, এ দু'টি জিনিস একত্র হলে সেই পরিবার দুনিয়ার জান্নাত হয়ে যায়। সেই পরিবার সুখ-শান্তিতে ভরে ওঠে। এ দু'টির কোনও একটি অনুপস্থিত থাকলে দুনিয়া জাহান্নাম হয়ে যায়। সেই পরিবারে চরম অশান্তি দেখা দেয়, দাম্পত্য জীবন নিরানন্দ ও বিস্বাদ হয়ে যায় এবং নানা যন্ত্রণায় জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে।

তিনটি জিনিস সৌভাগ্যের লক্ষণ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়ার কারও তিনটি জিনিস অর্জিত হয়ে গেলে তা তার জন্য খোশনসীব হয়। সেটা তার সৌভাগ্যের আলামত

ক. প্রশস্ত নিবাস

খ. নেক স্ত্রী ও

গ. উপযুক্ত বাহন।

এ তিনটি জিনিসই যদি বেতালা হয়, তবে দুর্গতির সীমা থাকে না। সারাটা জীবন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছ দ্বারা স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অর্থাৎ স্ত্রী নির্বাচনে স্বামীকে এবং স্বামী গ্রহণে স্ত্রীকে লক্ষ রাখতে হবে তার মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং দ্বীনের উপর চলার আগ্রহ কতটুকু আছে। কেননা, এ ছাড়া কখনও বিয়ের প্রকৃত উপকারিতা লাভ করা যায় না।

বরকতপূর্ণ বিবাহ

চতুর্থ হাদীছটি পাঠ করেছিলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً

'সর্বাপেক্ষা বেশি বরকতপূর্ণ বিবাহ সেটি, যাতে কষ্ট ও খরচ কম হয়।'
(মুসনাদে আহমাদ-হাদীছ ২৩৩৮৮)

অর্থাৎ বিবাহ যত সাদামাটা হবে, যত সহজ সরলভাবে তা সম্পন্ন করা হবে, তাতে বরকতও তত বেশি লাভ হবে।

এ হল বিবাহ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা। এর যথাযথ অনুসরণ করা হলে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়বিধ কল্যাণ নিশ্চিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতেও সুখ-শান্তি লাভ হবে, দাম্পত্য জীবন আনন্দময় হবে এবং আখিরাতের জীবনও সাফল্যমণ্ডিত হবে। বর্তমানে আমাদের সমাজে যে নানারকম ফিত্না-ফাসাদ বিস্তার লাভ করছে, চতুর্দিক থেকে অশান্তি ও অনাসৃষ্টি ঘিরে ধরছে, তার মূল কারণ এসব নির্দেশনায় আমল না দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর যথাযথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ১১ খণ্ড, ৫২-৮১ পৃষ্ঠা

বিবাহ ইন্দ্রিয়চাহিদা নিবারণের বৈধ উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

অর্থ: 'নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মু'মিনগণ, যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত সম্পাদনকারী, যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালংঘনকারী'। (মুমিনূন : ১-৭)

মুহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমি আপনাদের সামনে যা তিলাওয়াত করলাম, তা সূরা মু'মিনূনের শুরুর কয়েকটি আয়াত। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা যে সব মু'মিন কৃতকার্য হবে, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। বিষয়টাকে এভাবেও বলা যায় যে, একজন মু'মিনের কৃতকার্যতা যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এ আয়াতসমূহে তা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য এসব গুণ অর্জনের ফিকির ও চেষ্টা করা। পূর্বের জুমু'আগুলোতে এর মধ্য হতে তিনটি গুণ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। গুণগুলো ছিল –

এক. নামাযে খুশূ'-খুযূ' অবলম্বন করা

দুই. ফুযূল-অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম পরিহার করা এবং

তিন. যাকাত আদায় করা ও আখলাক-চরিত্র সংশোধন করা।

বিবাহ করা মুমিনদের বিশেষ গুণ

এ আয়াতসমূহে সফল মু'মিনদের চতুর্থ গুণ বলা হয়েছে, তারা নিজ লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। নিজ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া অন্যকিছুতে লিপ্ত হয় না। এই বৈধ উপায়ে কেউ নিজ কামচাহিদা নিবারণ করলে সেজন্য তারা নিন্দনীয় হবে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যৌনচাহিদা পূরণ করতে চাইলে সেটা হবে চরম সীমালংঘন ও নিজ সত্তার উপর কঠিন অবিচার। এ হল আয়াতের সারমর্ম।

ইন্দ্রিয় চাহিদা মানুষের স্বভাবগত বিষয়

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিষয়টি মানুষের যৌনচাহিদা পূরণ সংক্রান্ত। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষকে এ চাহিদা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। এ চাহিদা প্রত্যেকের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ বিপরীত লিংগের প্রতি আকর্ষণ মানুষের একটি মজ্জাগত বিষয়। তার মাধ্যমে কামনিবারণের ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই মানবমনে দেখা দেয়।

এ চাহিদা নিবারণের দু'টি বৈধ উপায়

আল্লাহ তা'আলা এ চাহিদার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি যে, এটা কোনওভাবেই পূরণ করা যাবে না। বরং এটা পূরণ করার জন্য দুটি বৈধ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, যা কুরআন মাজীদের এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কামেচ্ছা পূরণ করা সম্পূর্ণ হারাম। একজন মু'মিনের তা থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য।

বৈধ দুই উপায়ের একটি হল বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমে মানুষ নিজ স্ত্রীর দ্বারা তার এ স্বভাবগত চাহিদা পূরণ করতে পারে। এটা তার জন্য সম্পূর্ণ বৈধ; বরং পুণ্যের কাজও বটে। এর বিনিময়ে ছওয়াব পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল অধিকারভুক্ত দাসীতে উপগত হওয়া। এককালে এটা চালু ছিল। মানুষের নিজ মালিকানায় দাসী থাকত। তখন যুদ্ধকালে যারা বন্দী হত, তাদের দাস-দাসী বানিয়ে নেয়া হত। নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে সারা জগতে এর রেওয়াজ ছিল। তাঁর পরেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এটা বহাল ছিল। আল্লাহ তা'আলা বাঁদীদেরকে তাদের মনিবদের জন্য হালাল করে দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল, সে দাসীকে মুসলিম বা কিতাবী হতে হবে। কুরআন মাজীদ বলেছে, যৌনচাহিদা পূরণের জন্য এ দু'ই পন্থা হালাল। এ ছাড়া অন্য যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, তা

কিছুতেই হালাল নয়; সম্পূর্ণ হারাম। সে রকম কোন পন্থা যে ব্যক্তি অবলম্বন করবে, সে সীমলংঘনকারী ও আত্মপীড়ক সাব্যস্ত হবে।

ভারসাম্য ইসলামী শিক্ষার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, তার প্রতিটি শিক্ষাতেই ভারসাম্য বিদ্যমান। একদিকে মানুষের মধ্যে রয়েছে শারীরিক চাহিদা। কোন মানুষই এ চাহিদার ব্যতিক্রম নয়। বড়-বড় নবী, ওলী, মুত্তাকী, পরহেযগার, সকলেরই এটা এক স্বভাবগত চাহিদা। এর থেকে মুক্ত নয় কেউ। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এ চাহিদাকে মানবপ্রজন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার একটি মাধ্যম বানিয়েছেন। এ চাহিদা পূরণের পথ ধরেই মানবপ্রজন্ম সামনে চলছে। কাজেই এটা এক স্বভাবগত ব্যাপার। স্বভাবগত হওয়ার কারণেই শরীআত এ চাহিদার বিপক্ষে অবস্থান নেয়নি। ঘোষণা দেয়নি, এ চাহিদা মন্দ, এটি অপবিত্র ও হারাম। বরং শরীআত এ চাহিদা পূরণের জন্য একটা নির্দেশনা দিয়েছে, যাতে এর অপব্যবহার না হয়। শরী'আত নির্দেশিত সে পন্থাই হল কামনিবারণের বৈধ পন্থা। সে বৈধ পথে তুমি যতটা ইচ্ছা এ চাহিদা পূরণ করতে পার। তা তোমার জন্য হালাল। সে পথ ছাড়া আর যত পথ আছে তার কোনওটি অবলম্বন করতে যেও না। কেননা, তা বিশৃংখলা ঘটায়, কলুষতা বিস্তার করে, মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে এবং তাকে পাশবিকতার পঙ্কে নিমজ্জিত করে। হ্যাঁ, তা পাশবিকতার পন্থাই বটে। আর এ কারণেই শরী'আত তাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং তাকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ স্বভাবগত চাহিদ পূরণের জন্য নির্মল পন্থাকে জায়েজ করেছে এবং পঙ্কিল পন্থাকে নিষিদ্ধ করেছে। এটাই ইসলামের ভারসাম্য, ইসলামের প্রতিটি বিধানে এই ভারসাম্য বিদ্যমান।

খৃষ্টধর্মে বৈরাগ্যের ধারণা

খৃষ্টধর্মের প্রতি লক্ষ করলে রাহিব ও সংসারবিরাগীদের একটা বিশেষ স্থান দেখতে পাবেন। রাহবানিয়্যাত (বৈরাগ্যবাদ) এ ধর্মের একটা প্রসিদ্ধ নিয়ম। এ নিয়ম যারা মেনে চলে, তাদেরকে রাহিব বলে। খৃষ্টান রাহিবদের কথা হল, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে 'রাহবানিয়্যাত' অবলম্বন করা জরুরি। এ ছাড়া আল্লাহকে পাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। দুনিয়ায় যত রকম ভোগ-আস্বাদ আছে সব পরিত্যাগ করতে হবে। আনন্দের সব উপকরণ পরিহার করতে হবে। তা না করলে আল্লাহকে কিছুতেই পাবে না। খাবার খাবে কেবল প্রাণবাঁচে পরিমাণ। তাও রুক্ষ ও বিস্বাদ ধরনের খাদ্য। কোন নরম-সুস্বাদু খাবার খাবে না। খেলে আল্লাহকে পাবে না।

এমনিভাবে যৌনচাহিদাকেও দমন করতে হবে। এ চাহিদা পূরণের জন্য যদি বিবাহের পন্থা অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হবে না, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে-শাদি, ঘর-সংসার, সন্তান-সন্ততি এবং পার্থিব সকল কাজ-কারবার ত্যাগ না করবে, ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলাকে কিছুতেই পাবে না। এ ধারণার বশবর্তীতে তারা আশ্রম তৈরি করল আর দলে দলে রাহিবগণ এসে তাতে অবস্থান নিল। তাদের দাবি, আমরা দুনিয়া পরিত্যাগ করে এসেছি।

খৃষ্টান সন্ন্যাসিনী

আপনি খৃষ্টান 'নান'দের কথা শুনে থাকবেন। এ নাম নিশ্চয়ই আপনার কানে পড়েছে। 'নান' কারা ? নান হল আশ্রমবাসিনী নারী, যারা আশ্রমের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা বিয়ে-শাদি করে না জীবনভর কুমারীর জীবন যাপন করে। একদিকে হল 'রাহিব', (পুরুষ সন্ন্যাসী) যাদের অংগীকার কখনও বিবাহ করবে না। করলে আল্লাহ তা'আলা নারাজ হয়ে যাবেন। অন্যদিকে 'নান' (নারী সন্ন্যাসী) যাদেরও একই অংগীকার যে, কখনও তারা বিবাহ করবে না। কেননা, তা করলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। তাদের কথা হল, আত্মনিগ্রহ ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মনের সব কামনা-বাসনা দমন না করা হবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে না।

স্বভাবের সাথে বৈরিতা

বস্তুত রাহবানিয়্যাতের ধারণাটি সম্পূর্ণ স্বভাববিরোধী। এটা প্রকৃতির সাথে বৈরিতাপূর্ণ ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা যখন মানবস্বভাবে যৌনচাহিদা রেখেছেন এবং কোন মানুষই এর ব্যতিক্রম নয়, তখন এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি স্বভাবের ভেতর কোন চাহিদা রাখবেন, অথচ তা পূরণের বৈধ কোন সুযোগ রাখবেন না? এটা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও হিকমতের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তা সত্ত্বেও খৃষ্টান সম্প্রদায় স্বভাববিরোধী সন্ন্যাসবাদকেই বেছে নিল। পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হল। খৃষ্টান সাধু-সন্ন্যাসিনীরা যে আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল ইন্দ্রিয় দমনের নেক চেতনা নিয়ে, সেই আশ্রমই রঙ্গালয়ে পরিণত হল। তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা, নান-রাহিবগণও তো আর সব মানুষেরই মত মানুষ। অন্যদের মত তাদেরও রয়েছে শারীরিক চাহিদা, আছে ইন্দ্রিয় বাসনা। বৈধ পথে যখন সেই চাহিদা পূরণ করা হবে না, তখন অবৈধ পথের দুয়ার খুলতে বাধ্য। শয়তান তাদেরকে সে পথেই নিয়ে গেছে।

শয়তানের প্রথম চাল

শয়তানই তাদেরকে এই মন্ত্র শিখিয়েছে যে, নিজ প্রবৃত্তিকে চূর্ণ কর। শরীরের কামনা-বাসনাকে দমন কর। এটা যত বেশি করতে সক্ষম হবে, ততটাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে। যদি ইন্দ্রিয় চাহিদাকে পুরোপুরি দমন করতে পার এবং প্রবৃত্তিকে চূড়ান্ত রূপে বশীভূত-করতে সক্ষম হও, তবে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে খুশী হয়ে যাবেন। এ লক্ষে একটা কাজ কর। নারী ও পুরুষ সন্ন্যাসী একই কক্ষে থাক। এতে কামভাব তীব্র হয়ে উঠবে। তখন তা দমনের জন্য প্রবৃত্তির উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে আত্মনিগ্রহের মাত্রা অনেক বেশি হবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর খুশি হয়ে যাবেন। সেমতে সাধু-সন্ন্যাসিনীগণ একই কক্ষে থাকতে শুরু করে দিল।

শয়তানের দ্বিতীয় চাল

তারপর শয়তান তার দ্বিতীয় চাল চালল। বলল, আত্মনিগ্রহের মাত্রা আরও বাড়ানো দরকার। ইন্দ্রিয় চাহিদার একদম মূলোৎপাটন করে ফেলতে হবে। এজন্য কেবল এক কক্ষে থাকা যথেষ্ট নয়। একই বিছানায় রাত কাটাতে হবে। এতে কামভাব চরমাকার ধারণ করবে। তখন যদি তা দমন করতে সক্ষম হও, তবেই আল্লাহ তা'আলার সত্যিকার সন্তুষ্টি অর্জিত হবে। তারা সেই পরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হল। একই খাটে তারা রাত্রিযাপন শুরু করে দিল। এর পরিণতি যে কি দাঁড়াতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। তাদের আশ্রমগুলো, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আত্মিক শুচিতা, কর্মের শুদ্ধতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের অনুশীলনী গ্রহণের জন্য, তা অবৈধ ইন্দ্রিয়চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হল। আশ্রমের বাইরে মানুষের সাধারণ জীবনে অতটা পাপ ছিল না, যা আছে রাহেব-রাহিবদের এই আস্তানায়। এ সবই স্বভাব-প্রকৃতির সাথে বৈরি আচরণের পরিণতি।

ইসলামী বিবাহের সহজতা

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, তা স্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল। স্বভাবগত প্রতিটি চাহিদাকে এ দ্বীনে মূল্যায়ন করা হয়েছে। শারীরিক চাহিদার এ ব্যাপারটা যেহেতু মানবস্বভাবের মধ্যেই নিহিত, তাই এ চাহিদা নিবারণের একটা বৈধ উপায় থাকা জরুরি ছিল। ইসলাম সে উপায় দান করেছে এবং তা-ই বিবাহ। শরী'আত এ বিবাহকে করেছে অতি সহজসাধ্য। এতে তেমন একটা টাকা-পয়সা খরচের দরকার হয় না এবং কোন অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন পড়ে না। এমনকি মসজিদে যাওয়া, কারও

মাধ্যমে বিবাহ পড়ানোরও শর্ত নেই। বরং কনের সামনে যদি দুজন সাক্ষী থাকে এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বর বলে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম আর কনে বলে আমি কবুল করলাম, কিংবা কনে বলে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম আর বর বলে কবুল করলাম, তাতেই বিবাহ হয়ে যায়।

খৃষ্টধর্মে বিবাহের জটিলতা

পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্মে বিবাহ অত্যন্ত জটিল কাজ। তার জন্যে অনেক নিয়ম কানূন আছে। এ ধর্মে গীর্জার বাইরে কোন বিবাহ হতে পারে না। গীর্জার বাইরে কোথাও সাক্ষীদের সামনে বর-কনে যদি প্রস্তাব-গ্রহণের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করতে চায়, তাতে কাজ হবে না। সে বিবাহ এ ধর্মে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ ধর্মে বিবাহ সংঘটিত হবে কেবল তখনই, যখন বর-কনে গীর্জায় যাবে, সেখানে পাদ্রিকে খোশামোদ করবে, তাকে নির্ধারিত ফি দেবে, ফি পাওয়ার পর পাদ্রী বিবাহের জন্য কোন একটা সময় স্থির করে দেবে আর সেই নির্দিষ্ট সময়ে পাদ্রী বিবাহ পড়াবে। এই এত কিছু আনুষ্ঠানিকতার পরই তাদের বিবাহ সম্পন্ন হবে। তা ছাড়া এ ধর্মে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলামী শরী'আতে এ রকমের কোন নিয়ম নেই যে, বিবাহ অন্য কাউকে দিয়ে পড়াতে হবে এবং তা বিশেষ কোন স্থানে হতে হবে। বরং পাত্র-পাত্রি যদি দু'জন সাক্ষীর সামনে ঈজাব-কবূল করে নেয় এবং তাতে মোহরানা ধার্য করা হয়, ব্যস তাতেই বিবাহ হয়ে যায়।

বিবাহের খুত্বা ওয়াজিব নয়

হাঁ বিবাহে খুতবা পড়া সুন্নত বটে, কিন্তু সেই সুন্নত বিশেষ কোন ব্যক্তিকে দিয়ে আদায় করানো শর্ত নয়। স্বামীর যদি পড়ার ক্ষমতা থাকে, তবে সে নিজেও পড়তে পারে। কিন্তু সাধারণত বর খুতবা পড়তে পারে না আর সে কারণেই কাজী ডেকে তাকে দিয়ে খুত্বা পড়ানো হয় ও তার মাধ্যমে ঈজাব-কবূল করানো হয়, যাতে বিবাহ সুন্নত মোতাবেক হয়। বর নিজে পড়তে পারলে কাজী ডাকার দরকার হত না। তারপরও খুতবা পড়া কেবল সুন্নত, যার অবশ্যই গুরুত্ব আছে, কিন্তু তা না হলে যে বিবাহই হবে না এমন নয়। আল্লাহ তা'আলা ইসলামী বিবাহকে এমনই সহজ করে দিয়েছেন। তা করেছেন এজন্য, যাতে স্বভাবগত চাহিদা পূরণের পন্থা কঠিন হওয়ার ফলে মানুষকে অবৈধ পন্থা খুঁজতে না হয়। বরং যখনই মানুষ নিজের ভেতর এ চাহিদা বোধ করবে, তখন তা পূরণের জন্য যেন একটা হালাল উপায় তার হাতে থাকে আর এভাবে সে নিজের দেহ-মনের শুচিতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

আমরা বিবাহকে আযাব বানিয়ে ফেলেছি

বর্তমানে আমরা ইসলামের দেওয়া এ সহজ ব্যবস্থাটিকে অত্যন্ত কঠিন বানিয়ে ফেলেছি। বিবাহকে একটি আযাবে পরিণত করেছি। এখন কারও কাছে লাখ টাকা না থাকলে সে বিবাহের চিন্তা করতে পারে না। কেননা, বাগদান, গায়ে হলুদ, বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের দরকার হয়। এর প্রতিটির জন্য অনুষ্ঠান করতে হয়। তাতে অনেক লোকজনকে দাওয়াত করতে হয়, বিবাহের পোশাকাদি, সাজ-সজ্জার উপকরণ, অলংকার ইত্যাদি কিনতে হয়, বিবাহের পর ওলিমার আয়োজন করতে হয়, তা ছাড়া আরও নানা রকমের রসম-রেওয়াজ পালনের ব্যাপার তো আছেই। এসব মনগড়া নিয়ম-নীতির ভার বিবাহকে অত্যন্ত কঠিন করে ফেলেছে এবং এভাবে বিবাহ মানুষের পক্ষে একটা আযাবে পরিণত হয়েছে। অথচ শরী'আত বিবাহকে বড় সহজ করেছিল। এসব নিয়ম-কানূনের কোন বালাই তার বিধানে নেই।

হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রাযি.)- এর বিবাহ

হাদীছ শরীফে হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রাযি.)-এর বিবাহের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে আমাদের শিক্ষার অনেক কিছু আছে। হযরত 'আব্দুর রহমান (রাযি.) একজন বিখ্যাত সাহাবী। একদম শুরুর দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাদের একজন এবং তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যমত। অর্থাৎ যে দশজন ভাগ্যবান সাহাবী সম্পর্কে নবীজি এক বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছিলেন হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রাযি.)-এর নামও তাঁদের মধ্যে রয়েছে।

হিজরতের পর একদা তিনি মসজিদে নববীতে নামায পড়তে এলে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে তাঁর দেখা। তাঁর গায়ের কাপড়ে হলুদ রঙের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। তা ছিল সুগন্ধির দাগ। দেখে নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি হে আব্দুর রহমান, এ দাগ কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। বিবাহকালে যে খোশবু মাখিয়েছিলাম, এটা তার দাগ।

ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখুন। এমন একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকলেন না পর্যন্ত। কিন্তু তাই বলে কি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করেছেন? কিছুমাত্র অভিযোগ তুলেছেন? বলেছেন যে, এ কি কথা ভাই? তুমি একাকি বিয়ে করে ফেললে? আমাকে জানানোরও দরকার মনে করলে না?

(বুখারী, হাদীছ ১৯০৭; মুসলিম, হাদীছ ২৫৫৬; তিরমিযী, হাদীছ ১০১৪; নাসাঈ, হাদীছ ১২২২৪; আবূ দাউদ, হাদীছ ১৮০৪; ইব্‌ন মাজা, হাদীছ ১৮৯৭; আহমাদ, হাদীছ ১২২২৪)।

এই ছিল সেকালের বিবাহ। আমাদেরই কালে বিবাহে নানা রকমের ঘটা। বহু লোকজন দাওয়াত করতে হবে। প্যান্ডেল করতে হবে অথবা কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করতে হবে। আরও কত কি। এসব না হলে বিয়ে হবে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এসব মানুষের কল্পনায়ও ছিল না। খুব সহজেই বিয়ে হয়ে যেত। শরী'আত বিষয়টাকে করেছেই সহজ, যাতে বাড়তি চাপের কারণে স্বভাবগত চাহিদা পূরণের বৈধ পথ রুদ্ধ না হয়ে যায় এবং মানুষ হারাম উপায় সন্ধান না করে।

হযরত জাবির (রাযি.)-এর বিবাহ

হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন প্রসিদ্ধ আনসারী সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। একবার তিনি কথা প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজ বিবাহের কথা জানালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী বিবাহ করেছ না বিধবা? যখন জানালেন, বিধবা, তখন বললেন, কোন কুমারীকে বিবাহ করলে না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছয়টি ছোট বোন আছে? তাদের জন্য এমন কোন মহিলার দরকার ছিল, যার সংসারজীবনের অভিজ্ঞতা আছে এবং তাদের ভালো দেখাশোনা করতে পারবে। কোন কুমারীকে বিবাহ করলে সে তাদের ভালো খোঁজখবর রাখতে পারত না। এজন্যই আমি বিধবাকে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে খুশি হলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন।

(বুখারী, হাদীছ ৪৯৪৮; মুসলিম, হাদীছ ২৬৬৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ১৪৪৮২)

এ ঘটনায়ও দেখা যাচ্ছে, হযরত জাবির (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকেননি এবং না ডাকার কারণে তিনি তাকে এতটুকু তিরস্কার করেননি বা এই অভিযোগ তোলেননি যে, আমাকে ছাড়া একাকিই বিয়ে করে ফেললে?

এটাই ছিল বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামের মেজায, এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হিন্দু ও অমুসলিমদের সাথে মিলেমিশে থাকার কারণে তাদের সংস্কৃতি দ্বারা আমরা প্রভাবিত হয়ে গেছি। আমাদের বিয়ে-শাদিতে তাদের রসম-রেওয়াজের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছি। ফলে আজ আমাদের সমাজে বিবাহ একটা আযাবে পরিণত হয়েছে। আমজনগণের জন্য এখন বিবাহ করা কঠিন হয়ে গেছে।

মোটকথা, শরীআত বিবাহকে খুব সহজ করে দিয়েছে। রাহবানিয়্যাত বা সন্ন্যাসব্রতেরও আহবান জানায়নি যে, তোমরা ঘর-সংসার বিয়ে-শাদি পরিহার করে ইন্দ্রিয়দমনে লেগে যাও। আবার অবাধ ইন্দ্রিয়সেবারও পথ খুলে দেয়নি যে, যে যেভাবে পার ফুর্তি উড়াও। বরং সহজ বিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছে, যাতে প্রত্যেকে বৈধ উপায়ে স্বভাবগত চাহিদা পূরণের সুযোগ পায়।

বৈধ সম্পর্কের দ্বারাও ছওয়াব পাওয়া যায়

ইসলাম যে কেবল বিবাহ জায়েয করেছে তাই নয়; বরং এর জন্য ছওয়াবেরও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক সম্পর্ক দ্বারা বৈধ উপায়ে প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ছওয়াবেরও অধিকারী হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেকথা জানালে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীর সাথে আমাদের যে বৈবাহিক সম্পর্ক, তা দ্বারা তো আমরা আমাদের শারীরিক চাহিদা মিটিয়ে থাকি, সে কারণে ছওয়াব দেওয়া হবে কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যদি এ চাহিদা অবৈধ উপায়ে মেটাতে, তবে গুনাহ হত কি না? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই গুনাহ হত। তিনি বললেন, তোমরা যখন হারাম পন্থা পরিহার করে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হালাল পন্থা অবলম্বন করলে, তখন তাঁর এ হুকুম পালন করার কারণে তিনি তোমাদেরকে ছওয়াব দান করবেন। এভাবে হালাল পথে চাহিদা পূরণ করাও তোমাদের জন্য পুণ্যার্জনের উপায় হয়ে যায়। (মুসনাদে আহমাদ, ৫/৬৭)

বিবাহে বিলম্ব করা উচিত নয়

তারপর আবার আল্লাহ তা'আলা এ হালাল পদ্ধতিটির মধ্যেও ব্যাপক স্বাধীনতা দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর উপর সময়, পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদির কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। বিষয়টাকে সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছা ও অভিরুচির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে মানুষ কোন অবৈধ পন্থা তালাশ না করে। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাছে (মেয়ের বিয়ের জন্য) যদি এমন কোন পাত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারিতে তোমরা সন্তুষ্ট ও আখলাক-চরিত্র তোমাদের পসন্দ এবং সে তোমাদের সমপর্যায়েরও হয়, তবে তার সাথে মেয়ের বিয়ে দিও। তা না করলে যমীনে ব্যাপক ফিৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে'।

(তিরমিযী, হাদীছ ১০০৫)

সেই ফিত্না তো বিস্তার লাভ করছেই। ঘরে ঘরে বয়স্কা মেয়ে। তাদের বিয়ের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু কেবল দেরিই হচ্ছে। কেননা,

যৌতুকের ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়ের সাথে নানা রকম আসবাবপত্র দিতে হবে। তা জোগার করতে লাখ-লাখ টাকার দরকার। বাবার কাছে সেই টাকা নেই। টাকার ব্যবস্থা যখন হবে, তখনই সে মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ নিতে পারবে, তার আগে নয়। ওদিকে মেয়ের বয়স বেড়েই চলছে। সেও তো মানুষ। তারও দেহ-মন আছে। চাহিদা আছে, কামনা আছে। আছে প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়। যখন বৈধ পথে তার ইন্দ্রিয়চাহিদা পূরণ হচ্ছে না, তখন তা পূরণের উপায় কী? এখানেই শয়তান এগিয়ে আসে। সে তাকে প্ররোচনা দেয় ও অবৈধ পথে নেওয়ার চেষ্টা করে। এভাবেই সমাজে ফিতনার বিস্তার হচ্ছে। সমাজের উপর দৃষ্টিপাত করুন, পরিস্কার দেখতে পাবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরিউক্ত নির্দেশনা অমান্য করার পরিণামে কি রকম ফিত্না-ফাসাদের বিস্তার ঘটছে।

বিবাহ ছাড়া আর সবই অবৈধ পথ

শরী'আত মানুষের ইন্দ্রিয়চাহিদা নিবারণের জন্য একদিকে এই বৈধ ব্যবস্থা দিয়েছে, অন্যদিকে জানিয়ে দিয়েছে, এ ছাড়া যত পথ আছে, সবই হারাম। তা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাক। যারা সে সব পথ পরিহার করবে না : বরং বৈধ পথ ছেড়ে সেই অবৈধ পথের দিকেই ছুটবে তারা সীমালংঘণকারী সাব্যস্ত হবে এবং নিজেদের জন্য আল্লাহর আযাবকে অবধারিত করে তুলবে। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন–

'যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে, অর্থাৎ পবিত্র জীবন যাপন করবে, চারিত্রিক শূচিতা রক্ষা করবে, ইন্দ্রিয়চাহিদা পূরণের যে বৈধ ব্যবস্থা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, তারাই কৃতকার্য হবে। বস্তুত দুনিয়ার সফলতা ও আখিরাতের মুক্তি এ ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই হতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নয়।

এবার দেখার বিষয় হল, পবিত্রতা ও চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষার পদ্ধতি কী? এর জন্য কুরআন-সুন্নাহ বিস্তারিতভাবে কি বিধিবিধান দিয়েছে? এটা একটা স্বতন্ত্র বিষয়। সে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ তা'আলা আগামীতে আলোচনার চেষ্টা করব। আজ এ পর্যন্তই শেষ করছি। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদেরকে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় সাহায্য করুন এবং নিজ সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন যাপনের তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ১৫ খণ্ড, ১৩৭-১৫০ পৃষ্ঠা

বিবাহের খুত্‌বা : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

ইনশাআল্লাহ এক আনন্দময় অনুষ্ঠান এখনই শুরু হতে যাচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী দু' নর-নারী দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বন্ধনকে বরকতময় করুন।

আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে, যেন বিবাহ পড়ানোর আগে আপনাদের সামনে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি। একথা সত্য যে, বর্তমানকালের পরিবেশ-পরিস্থিতি হিসেবে বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠান ওয়াজ-নসীহতের জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের আয়োজকগণ বলছেন, আমন্ত্রিত অতিথিগণও এ সুযোগে দ্বীনের কিছু কথা শুনতে চাচ্ছেন। সুতরাং হুকুম পালনার্থে আপনাদের সামনে কয়েকটি কথা আরয করছি।

বিবাহের খুত্‌বায় পাঠ্য তিন আয়াত

ইনশাআল্লাহ এখনই বিবাহের খুতবা পড়া হবে। এ খুত্‌বা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। মূলত বিবাহও তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। তাঁর ইরশাদ, اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ 'বিবাহ আমার একটি সুন্নত'।

(ইবনে মাজাহ, হাদীছ ১৮৩৬)

শর'ঈ বিধান অনুযায়ী যদিও দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ঈজাব-কবূল (প্রস্তাব ও গ্রহণ) দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়; কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজের যে সুন্নত আমাদের জন্য রেখে গেছেন, তাও যত্নের সংগে পালন করা চাই। তাঁর সুন্নত হল ঈজাব-কবূলের আগে একটি খুত্‌বা পড়া। সে খুতবায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়, মহানবী

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা হয় এবং সাধারণত তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহের খুত্বায় আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করার তালিম দিয়েছেন। তার মধ্যে সর্বপ্রথম হল সূরা নিসার এ আয়াতে

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

'হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে (অর্থাৎ হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম থেকে হাওয়া 'আলাইহাস-সালামকে) তারপর তাদের দু'জন থেকে বিস্তার ঘটিয়েছেন বহু নর-নারীর (সুতরাং পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করেছে, সকলেই সেই দু'ই মহান ব্যক্তির বংশধর)। ভয় কর আল্লাহকে, যার নামের অছিলায় তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজের হক) দাবি কর (অর্থাৎ কেউ যখন অন্যের কাছে নিজের প্রাপ্য দাবি করে, তখন সাধারণত আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার প্রাপ্য আমাকে বুঝিয়ে দাও) আর আত্মীয়-স্বজন (এর হকসমূহ)-এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর (যাতে কারও কোন হক ধূলিসাৎ করা না হয়)। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (যাবতীয় কর্মের) প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (অর্থাৎ তিনি দেখছেন তোমরা কি বলছ এবং কি করছ।)

দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের। ইরশাদ হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না; তবে কেবল এ অবস্থায় যে, তখন তোমরা মুসলিম'। (সূরা আলে ইমরান : ১০২)

খুত্বায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় যে আয়াত তিলাওয়াতের শিক্ষা দিয়েছেন, তা হল-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল। (যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোল, তবে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কাজ কবূল করে নেবেন এবং তোমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবে, সে নিশ্চিত মহাসাফল্য অর্জন করবে'। (সূরা আহযাব : ৭০-৭১)

খুতবায় যে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে এ তিনটি আয়াত বেছে নিয়েছেন, তার কারণ এ তিনও আয়াতে সাধারণভাবে একটা বিষয়ে জোর তাকিদ করা হয়েছে, তা হচ্ছে তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতি। সুতরাং এ আয়াত তিনটির মাধ্যমে তিনি বিশেষভাবে দাম্পত্য জীবনে তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

এমনিতে তো প্রতিটি মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখনই সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। কিন্তু তারপরও বিবাহকালে এ বিষয়টাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এ কারণে যে, বিবাহ মানবজীবনের একটা বিশেষ বাঁক। এখান থেকে তার একটা নতুন জীবনের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে জীবনের অনেক বড় পরিবর্তন ঘটে এবং আগে ছিল না এ রকম নতুন-নতুন বিষয় ও নতুন-নতুন অবস্থার সে সম্মুখীন হয়। সেসব ক্ষেত্রে সফলতা লাভ ও শর'ঈ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাক্ওয়ার বড় প্রয়োজন। সে জন্যই বিবাহের এ মুহূর্তে তাক্ওয়ার বিষয়টাকে নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে বান্দা তার জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে পুরনো সেই প্রতিশ্রুতির নবায়ন করে নেয়। এটাই বিবাহের খুত্বায় বিশেষ এ তিন আয়াত তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আয়াতসমূহের এ তাৎপর্য ভালোভাবে হৃদয়ংগম করার তাওফীক দিন এবং প্রত্যেকে যাতে তাক্ওয়া অবলম্বনের ফিকির ও যথাযথ চেষ্টা করি সেই তাওফীকও দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ৩য় খণ্ড, ২৪৯-২৫৩ পৃষ্ঠা

বিবাহের খুত্‌বায় কী বার্তা দেওয়া হয়?

আমাদের মধ্যে হয়ত এমন একজনও নেই, যে জীবনে কখনও কোন বিবাহানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেনি। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বিবাহের অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং তাতে বহু লোকজন উপস্থিত থাকছে। সে সব অনুষ্ঠানে আপনারা দেখে থাকবেন, বিবাহের ঈজাব-কবূলের আগে কাজী সাহেব বা যিনি বিবাহ পড়ান তিনি একটি খুত্‌বা পড়েন এবং তারপর ঈজাব-কবূলের মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হয়। বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য খুত্‌বা সুন্নত। ঈজাব-কবূলের আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত খুত্‌বা দিতেন। তিনি খুত্‌বার প্রাথমিক বাক্যসমূহ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। খুত্‌বার সে বাক্যসমূহই আমরা সাধারণত বিবাহানুষ্ঠানে কাজীকে পড়তে শুনি। যুগ-যুগ ধরে এ রেওয়াজ চলে আসছে এবং মুসলিমদের বিবাহানুষ্ঠানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুন্নত যথারীতি চালু আছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়, চালু যা আছে, তা কেবলই সুন্নতটির বহিরাঙ্গ। অর্থাৎ খুতবার বাহ্যিক শব্দাবলী। তার প্রাণবস্তু যেন দিন দিন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। খুত্‌বার উদ্দেশ্য ও তার মর্মবাণী আজ বিবাহের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও অনুষ্ঠানের কোলাহলের মধ্যে চাপা থেকে যাচ্ছে। রেওয়াজ হিসেবে খুত্‌বা পড়তে হয়, তাই পড়া হচ্ছে, কিন্তু সেদিকে শ্রোতাদের মনোযোগ কতটুকু? সম্পূর্ণ অবহেলাভাবে তা শোনা হচ্ছে। সমাবেশ যদি বড় হয় এবং তাতে মাইকের ব্যবস্থা না থাকে, তবে তো অধিকাংশ লোক তা শুনতেই পায় না। একদিকে খুত্‌বা পড়া হচ্ছে, অন্যদিকে লোকজন আলাপ-আলোচনায় মেতে থাকছে। এ রকম দৃশ্য হর হামেশাই নজরে পড়ছে। খুত্‌বার প্রতি মানুষের যে কতটা অবহেলা তার একটা প্রমাণ এইও যে, যেখানে একটা বিবাহানুষ্ঠানের আয়োজন করতে লাখ-লাখ টাকা খরচ হচ্ছে, সেখানে আর কয়েকটা টাকা খরচ করে মাইকের ব্যবস্থা করা হবে, এই গরজটুকু কেউ বোধ করছে না। অথচ সে ব্যবস্থা করা হলে অনর্থক হইচই ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশের বদলে মানুষ একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিবাহের বরকতপূর্ণ খুতবা সকলে শুনতে পেত। খুত্‌বা ও ঈজাব-কবূলই তো এ মজলিসের

প্রাণবন্ত। তাই যদি সকলকে শোনানো না গেল আর পুরোটা মজলিস ফুযূল কথাবার্তায় গরম হয়ে থাকল, তবে এ মজলিসের সার্থকতা কোথায়?

যা হোক এটা তো একটা প্রাসঙ্গিক কথা। মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। কথা হচ্ছিল খুতবা শোনা নিয়ে যে, অধিকাংশ লোকেই তা মনোযোগ দিয়ে শোনে না। আর কেউ যদি শোনেও, তবে একে কেবল তাবাররুকের বিষয় মনে করে। সাধারণ লোকদের ধারণা, খুত্‌বা পড়াই হয় কেবল বরকতের জন্য। এর বেশি কোন লক্ষ-উদ্দেশ্য তার নেই। যে কারণে খুত্‌বার অর্থ বোঝা ও তার তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা বা সে দিকে লক্ষ কম লোকেরই আছে। ক'জনে চিন্তা করে যে, বিবাহের মজলিসে খুত্‌বা কেন পড়া হয় এবং বিবাহের সাথে এর কী সম্পর্ক?

খুতবার বাক্যাবলী যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত বরং তিনি যথারীতি এটা শিক্ষা দিয়েছেন। তাই এর অর্থ বোঝা ও লক্ষ-উদ্দেশ্য হৃদয়ংগম করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যাতে এই বরকতময় সুন্নতটি দ্বারা আমরা যথাযথ উপকার লাভ করতে পারি।

খুতবা শুরু হয় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা দ্বারা। মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রতি হুকুম হল, আমরা যেন যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও প্রশংসা দ্বারা শুরু করি। কেননা, দুনিয়ার কোন কাজই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া সম্পন্ন করা যায় না। বিবাহও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এটা দু'জন লোকের জীবনের এক বিশেষ বাঁক। এখান থেকে তাদের এক নবজীবনের যাত্রা শুরু হয়। তাই এ সময়ের জন্যও আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেন এ যাত্রা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করি। তাঁর প্রশংসা ও স্তুতিগানের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে বাক্যসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন, তা কতই না চমৎকার, পূর্ণাঙ্গ ও তাৎপর্যপূর্ণ! বাক্যগুলি নিম্নরূপ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি। আমরা তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই কাছে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমরা তাঁরই প্রতি ঈমান আনি ও তাঁরই উপর ভরসা করি। আমরা নিজেদের

কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের কর্মের মন্দত্ব হতে আল্লাহ তা'আলার পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন, কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না এবং আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি অফুরন্ত শান্তি ও বরকত নাযিল করুন।

বিবাহের সময়টি কেবল বর-কনের জন্যই নয়, উভয়পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সময় সন্ধিক্ষণ সকলের জীবনেই এ সময় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। মনের সাথে মন মিলে গেলে জীবনটা জান্নাতের নমুনা হয়ে যায়। আর আল্লাহ না করুন, মনে মনে যদি মিল না খায়, তবে উভয় পক্ষের জন্যই এ আত্মীয়তা এক যন্ত্রণাদায়ক শিরপীড়ায় পরিণত হয়। সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন যাতে না হতে হয়, তাই আল্লাহ তা'আলার হামদ ও প্রশংসার সাথে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

অনেক সময় দাম্পত্য জীবনের দুঃখ-দুর্দশা নিজেদেরই দুষ্কর্ম ও কুস্বভাবের কারণে দেখা দিয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে এবং প্রার্থনা জানানো হয়েছে, তিনি যেন কর্ম শোধরানোর তাওফীক দেন, চরিত্র সংশোধনের চেষ্টায় সাহায্য করেন, হিদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন।

আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও প্রশংসা এবং তাঁর কাছে দু'আ করা সহ যত ভালো কাজ আছে তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে বিশুদ্ধ ঈমানের উপর। তাওহীদ ও রিসালাতের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন সৎকর্মেরই কিছুমাত্র মূল্য নেই। তাই এ খুতবায় তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদাত অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই ও হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এই সাক্ষ্যের নবায়ন করা হয়েছে। সবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা হয়েছে, যেহেতু তিনিই আমাদের জন্য হিদায়াতের আলো নিয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন।

এই হল বিবাহের খুত্‌বার প্রারম্ভিক বাক্যসমূহের তাৎপর্য, সাধারণত এর পর কুরআন মাজীদের তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয়। তার মধ্যে প্রথমটি সূরা আলে 'ইমরানের ১০২ নং আয়াত-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۝

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেমন তাকে ভয় করা উচিত। আর তোমাদের মৃত্যু যেন মুসলিম অবস্থায়ই হয়'।

দ্বিতীয়টি সূরা নিসার প্রথম আয়াত, ইরশাদ হয়েছে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا۝

'হে মানুষ ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ (অর্থাৎ আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই থেকে তার স্ত্রী (হাওয়া) কে সৃষ্টি করেছেন। তারপর উভয়ের দ্বারা বহু নর-নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে হক দাবি করে থাক আর সতর্ক হও আত্মীয়দের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

আর তৃতীয় হল সূরা আহযাবের ৭০-৭১ নং আয়াত। তাতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا۝

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বলঃ আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে নিশ্চিত মহাসাফল্য লাভ করে ফেলে'।

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ২৯৭ পৃষ্ঠা

বিবাহে গোত্র বিচার প্রসংগ

বিবাহ-শাদিতে মানুষ এখনও পর্যন্ত নিজেদের মনগড়া রীতি নীতির বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে কিছুতেই যেন তা থেকে মুক্ত হতে পারছে না বা সেই চেষ্টাই করছে না। এ ক্ষেত্রে মানুষ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে চরম উদাসীন এবং এ উদাসীনতা সর্বব্যাপী। এ বিষয়ে কিছু লোক শরীয়তী নির্দেশনা জানার লক্ষ্যে আমার কাছে যেসব ঘটনা উল্লেখ করে, তা দ্বারা অনুমান করা যায়, মানুষ আজও পর্যন্ত এক্ষেত্রে কি গভীর অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। দিনকতক হল, আমেরিকা থেকে জনৈক নারী একটি চিঠি লিখেছেন। তাতে তিনি যে বেদনাময় কাহিনী উল্লেখ করেছেন, তা যে কাউকে ভারাক্রান্ত করবে। ঘটনার সারমর্ম এরকম। তিনি এক ধনী পরিবারের সন্তান। পিতামাতা কোটিপতি। মেয়েকে বেশ লেখাপড়াও শিখিয়েছে। পিতার জেদ, মেয়েকে নিজ গোত্রের বাইরে বিবাহ দেবে না। তিনি লেখেন, আমি তার বড় মেয়ে। প্রথম দিকে আমার বিয়ের কয়েকটি প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু আমার পিতা এই বলে প্রত্যেকটি প্রত্যাখান করেন যে, ওরা আমার সগোত্রীয় নয়। আমি গোত্রের বাইরে মেয়ে দেব না। এভাবে আমার বয়স বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব আসাই বন্ধ হয়ে যায়।

এ অবস্থায় একদিন আমার পিতা আমাকে বললেন, এখন আর স্বগোত্রে তোমার বিয়ের সম্ভাবনা নেই। আর বাইরে তো বিয়ে দেবই না। সুতরাং তুমি আমার সামনে শপথ কর, জীবনে কখনও বিয়ে করবে না। আমার টাকা-পয়সার অভাব নেই। সারা জীবন তোমাকে লালন-পালন করব। তোমার চলার সব ব্যবস্থা করব, কিন্তু গোত্রের বাইরে কোথাও বিয়ে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বলে তিনি আমাকে শপথ করার জন্য এমনই চাপ দিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি বলতে বাধ্য হলাম, 'জীবনে কখনও বিয়ে করব না'।।

অতঃপর বাস্তবিকই আমি মনস্থির করে ফেললাম যে, আমি বাবার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাব, কখনও বিয়ে করব না, সারা জীবন এভাবেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু আমার ছোট বোন, এক ভাই ও মা এতে রাজি নয়। তারা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। এ দিকে এক ব্যক্তি বহুদিন থেকে আমাকে

বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল এবং এখনও পর্যন্ত তার সে আগ্রহ বহাল আছে। বাবা কঠিনভাবেই তাকে 'না' করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরও সে আশা ছাড়েনি। এর মধ্যে একদিন আমার ভাই-বোন তার সাথে কথা বলল। বাবাকেও রাজি করতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত এই বলে সম্মতি জানাল যে, ঠিক আছে; বিয়ে হোক, কিন্তু এরপর আর মেয়ের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। বোন আমার কাছে বাবার একথা গোপন রাখল, কেবল তার সম্মতির কথাটুকুই জানাল। শেষে বিয়ে হয়ে গেল। আমি স্বামীর সাথে আমেরিকায় চলে এসেছি। এতদিনে আমি জানতে পেরেছি, বাবা সারা জীবনের জন্য আমার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। তিনি ফোনেও আমার সাথে কথা বলেন না। এমনকি আমাকে নিজ কন্যা বলে পরিচয় দিতেও রাজি না।

এই হল আমেরিকা প্রবাসিনী সে মহিলার ঘটনা। কী সীমাহীন বাড়াবাড়ি। সত্য বটে, এতটা বাড়াবাড়ি সচরাচর ঘটে না। কিন্তু স্বগোত্রে বিবাহের প্রতি মানুষের যে একটা রোখ্ আছে এবং তাতে যে মানুষ নানারকম বিভ্রান্তির শিকার তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের কাছে এ রকম অনেক কথাই আসে এবং আকছার চোখেও পড়ে।

একথা ঠিক যে, বিবাহের ক্ষেত্রে শরী'আত কুফু বা সমতার প্রতিও লক্ষ রেখেছে, কিন্তু তারও একটা পর্যায় আছে। তাতে এরকম বাড়াবাড়ির কোন সুযোগ নেই। ব্যাপার এই যে, বিবাহ একটা স্থায়ী আত্মীয়তার ব্যবস্থা। এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রী ও দুই খান্দানের মধ্যে সারা জীবনের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই এতে স্বামী-স্ত্রী ও দুই খান্দানের মধ্যে মন মানসিকার মিল থাকা দরকার। তাদের থাকা-খাওয়া, চিন্তা-ভাবনা ও মন-মানসিকতার মধ্যে বেশি দূরত্ব থাকলে পরস্পরে বনিবনাও কঠিন হয়ে পড়ে। তাই উভয় খান্দান যাতে কাছাকাছি পর্যায়ের হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সমপর্যায়ের কোন প্রস্তাব না পাওয়া গেলে সারা জীবনের জন্য বিবাহকে স্থগিত করে দেওয়া হবে এবং কুমারজীবন যাপনের জন্য শপথ নেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত কুফুর অর্থ স্বগোত্র হওয়ার অপরিহার্যতা নয় যে, কেবল নিজ গোত্রের মধ্যেই আত্মীয়তা করতে হবে, তার বাইরে নয়। কাজেই বাইরের যত উপযুক্ত প্রস্তাবই আসুক না কেন তা কুফুবহির্ভূত বা অসম গণ্য করা হবে। কুফু সম্পর্কে এ সবই ভুল ধারণা।

এ প্রসংগে কয়েকটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা অগ্রাহ্য করার কারণেই আমাদের সমাজে নানা রকম বিভ্রান্তি শিকড় ছড়িয়েছে।

এক. যে ব্যক্তি বংশ, দ্বীনদারী ও পেশার দিক থেকে কোন মেয়ে ও তার খান্দানের সমপর্যায়ের হয়, তাকে সেই মেয়ের কুফূ (সমস্তরের) গণ্য করা হবে। অর্থাৎ কুফূ হওয়ার জন্য স্বগোত্রীয় হওয়া শর্ত নয়; বরং অন্য গোত্রের লোক হয়েও কুফূ হতে পারে, যদি তার গোত্র মেয়ের গোত্র অপেক্ষা খাটো না হয়, বরং সমপর্যায়ের হয়। যেমন সাইয়্যেদ, সিদ্দীকী, ফারুকী, 'উছমানী, আলাবী তথা কুরায়শের সকল শাখা গোত্রই একে অন্যের কুফূ। এমনিভাবে আমাদের দেশে রাজপুত, খান প্রভৃতি গোত্রগুলোকেও পরস্পর সমপর্যায়ের গণ্য করা হয় কাজেই এরা একে অন্যের কুফূ।

দুই. কোন কোন হাদীছে বিবাহের ক্ষেত্রে কুফূর দিকে লক্ষ রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যাতে মন-মানসিকতায় কাছাকাছি হওয়ার ফলে উভয় খান্দানে বনিবনাও সহজ হয়। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, কুফূর বাইরে বিবাহ সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং শরীআতে এরূপ বিবাহ গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ মনে করলে সেটা মারাত্মক ভুল হবে। মেয়ে ও তার অভিভাবকগণ কুফূর বাইরে বিবাহে সম্মত হলে শরী'আত সে বিবাহকে বৈধ গণ্য করে এবং এতে কোন রকম গুনাহ নেই। সুতরাং কোন মেয়েকে যদি কুফূর ভেতর বিবাহ দেওয়া না যায় আর কফূর বাইরে উপযুক্ত কোন পাত্র পাওয়া যায়, তবে সেখানে বিবাহ দেওয়াতে কোন দোষ নেই; বরং সেখানে বিবাহ দেওয়াই উচিত। কুফূর ভেতর উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ার অজুহাতে মেয়েকে বসিয়ে রাখা কোনওক্রমেই জায়েয নয়। শরী'আত এটা অনুমোদন করে না।

তিন. অভিভাবক ছাড়া নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলা কোন মেয়ের পক্ষে কিছুতেই উচিত নয়। শরীআত তা পসন্দ করে না। বিশেষত সে বিবাহ যদি হয় কুফূর বাইরে। কুফূর বাইরে এরূপ বিবাহ অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে বৈধ নয়। কিন্তু অভিভাবকেরও কর্তব্য কুফূ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা এবং এ ব্যাপারে এমন জিদ না ধরা, যার পরিণামে মেয়েকে জীবনভর বিবাহ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। স্বগোত্র হওয়ার শর্ত তো আরও বাড়াবাড়ি। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অনর্থক প্রয়াস। এর কোনও বৈধতা নেই।

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

'যার দ্বীনদারী ও আখলাক-চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয় এমন কোন ব্যক্তি প্রস্তাব নিয়ে এলে তার সাথে (তোমাদের মেয়ের) বিয়ে দাও। তা না করলে পৃথিবীতে কঠিন ফিৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে'।

(তিরমিযী, হাদীছ ১০০৫)

চার. মানুষের মধ্যে আরও একটা ধারণা আছে। অনেকেই মনে করে, সাইয়্যেদ বংশের মেয়ের বিবাহ অন্য বংশে দেওয়া যায় না। এটাও শরীয়তসম্মত ধারণা নয়। আমাদের পরিভাষায় সাইয়্যেদ বলা হয় এমন লোককে, যার বংশধারা বনূ হাশিমের সাথে মিলেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বংশের হওয়ায় নিশ্চয়ই এ বংশের একটা বাড়তি মহিমা আছে এবং এ বংশের সাথে কারও বংশের সম্পর্ক থাকাটাও অনেক বড় সৌভাগ্য। কিন্তু তাই বলে এ বংশের কোন মেয়েকে অন্য বংশে বিয়ে দেওয়া যাবে না এরকম কোন বিধিনিষেধ শরীআত আরোপ করেনি। বরং আমি যেমন আরয করেছি, কেবল চার খলীফার বংশই নয়, কুরায়শের সবগুলো শাখা গোত্রই সাইয়্যেদ বংশের কুফূ। তাদের পরস্পরে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে শর'ঈ কোন বাধা নেই। এমনকি কুরায়শের বাইরেও যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আত্মীয়তা করা হয়, তাও নিঃসন্দেহে বৈধ।

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ৩১৫ পৃষ্ঠা

বিবাহে বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ

হযরত আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ রাযিয়াল্লাহ আনহু একজন বিখ্যা
সাহাবী। তিনি সেই সৌভাগ্যবান দশজনের অন্যতম, যাদেরকে মহান
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই সাথে জান্নাতের সুসংবা
দিয়েছিলেন। এক দিনের ঘটনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লা
তাঁর কাপড়ে হলদে ছাপ দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ দাগ কিসের
তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি বিবাহ করেছি (অর্থাৎ বিবাহকা
যে সুগন্ধি মাখিয়েছিলাম, এটা তারই দাগ, যা এখনও কাপড়ে রয়ে গেছে)
মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরকতের দু'আ করলেন এ
বললেন, ওলীমা কর, তা একটা ছাগল দিয়েই হোক না কেন।

(বুখারী, হাদীছ ১৯০৭; মুসলিম, হাদীছ ২৫৫৬; তিরমিযী, হাদীছ ১০১৪; আ
দাউদ, হাদীছ ১৮০৪; নাসাঈ, হাদীছ ৩২৯; ইবন মাজাহ, হাদীছ ১৮৯৭; আহমা
হাদীছ ১২২২৪;)

চিন্তা করে দেখুন, বিশিষ্ট ও সর্বশীর্ষ দশ সাহাবীর একজন হওয়া সত্ত্বে
তিনি নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ও
সাল্লামকে বিয়ের মজলিসে ডাকার পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁ
কাপড়ে হলদে দাগ দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা
কারণ জিজ্ঞেস করেন আর এর জবাবেই তিনি তাকে নিজ বিবাহ সম্পর্কে
অবহিত করেন। অন্যদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
এরকম কোন অভিযোগ করেননি যে, মিয়া, নিজে নিজে বিয়ে করে ফেললে,
আমাকে জিজ্ঞেসও করলে না। অভিযোগ তো করেনইনি, বরং তিনি তাঁর জন্য
বরকতের দু'আ করেছেন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে হুকুম করেছেন যে,
এবার একটা ছাগল দিয়ে হলেও ওলীমা কর।

বস্তুত ইসলাম বিবাহের বিষয়টিকে খুবই সহজ করেছে এবং এর জন্য
খুবই সাদামাটা ব্যবস্থা দিয়েছে। দু'পক্ষ সম্মত হয়ে গেলে বিশেষ কোন
আয়োজন ছাড়াই তারা বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলতে পারে। অনর্থক কোন
প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন তাদেরকে হতে হয় না। কোন কাজী বা আলেমকে

বিয়ে পড়াতে হবে এমন কোন শর্তও নেই। শরীআতের পক্ষ থেকে শর্ত কেবল এতটুকুই যে, বিবাহের মজলিসে দু'জন সাক্ষী থাকতে হবে এবং তাদের সামনে ঈজাব কবুল হতে হবে। অর্থাৎ পাত্র-কনে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের একজন অন্যজনকে বলবে, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম আর অন্যজন বলবে, আমি কবূল করলাম। ব্যস বিবাহ হয়ে গেল। এর জন্য না কোন আদালতে যাওয়ার দরকার আছে, না কোন অনুষ্ঠান করার শর্ত আছে। দাওয়াত, যৌতুক কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ: কনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে মোহরানা জরুরি আর বিবাহকালে তা ধার্য হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে ঘটনাক্রমে বিবাহকালে যদি মোহরানা ধার্য না হয়, তবুও বিবাহ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে 'মাহ্‌রে মিছ্‌ল' (অর্থাৎ কনের বংশে সাধারণত যে মোহরানা ধার্য হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ) দেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়।

বিবাহকালে খুত্‌বা সুন্নত এবং যথাসম্ভব এ সুন্নতের উপর আমল করে তার বরকত হাসিল করা চাই। কিন্তু বিবাহের বৈধতা খুত্‌বার উপর নির্ভরশীল নয়। খুত্‌বা ছাড়াও যদি সাক্ষিদের উপস্থিতিতে কেবল ঈজাব ও কবূল হয়ে যায়, তাতেও বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায় এবং সে বিবাহে কোন অসম্পূর্ণতা থাকে না।

বিবাহের পর ওলীমা সুন্নাত, যেমন পূর্বোক্ত হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ (রাযি.)-কে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু তা ফরয বা ওয়াজিব নয় যে, তা ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তা ছাড়া শরী'আত এর কোন পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং কত সংখ্যক মেহমান হতে হবে তাও স্থির করেনি। প্রত্যেকে নিজ আর্থিক সংগতি অনুযায়ী তা স্থির করে নিতে পারে। এর জন্য ধারকর্জ করারও কোন প্রয়োজন নেই। বরং তা করাটা শরী'আতে পসন্দনীয়ও নয়। স্বাভাবিকভাবে যার পক্ষে যে মানের ওলীমার আয়োজন করা সম্ভব, সে তা করেই ক্ষান্ত থাকবে। আর যদি মোটেই করতে না পারে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। তাতে বিবাহে কোন ত্রুটি দেখা দেবে না।

ইসলাম বিবাহকে এতটা সহজ কেন করেছে? তা করেছে এজন্য যে, বিবাহ মানুষের ইন্দ্রিয়চাহিদা পূরণের একটা উত্তম ও বৈধ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাকে যদি কঠিন করে দেওয়া হত বা এর সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা রাখা হত, তবে তার অনিবার্য ফল দাঁড়াত বিপথগামিতা। তখন মানুষ এ বৈধ ব্যবস্থা থেকে বিমুখ হয়ে অবৈধ উপায় অবলম্বন করত। কেউ যখন নিজের স্বভাবগত চাহিদা পূরণের বৈধ পথ বন্ধ দেখবে, তখন তার মন অবৈধ পথের দিকেই ঝুঁকবে। ফলে গোটা সমাজে অন্ধকার নেমে আসবে।

কিন্তু আফসোস, ইসলাম বিবাহকে যতটা সহজ বানিয়েছিল আমাদের বর্তমান সমাজ তাকে ততটা সহজ রাখেনি। বরং তার বিপরীতে ঠিক অতটাই কঠিন করে ফেলেছে। বিবাহের বরকতপূর্ণ চুক্তিকে নানা রকম রসম রেওয়াজের ঘেরাটোপে বন্দী করে ফেলেছি এবং বিশাল ব্যয়ের বোঝা এর উপর চাপিয়ে দিয়েছি। ফলে একজন গরীব লোক, বরং মধ্য আয়ের লোকের পক্ষেও আজ বিবাহ এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি সাধারণ একজন লোকও আজ দু-এক লাখ টাকা পকেটে না থাকলে বিবাহের কথা কল্পনা করতে পারে না। সেই দু-এক লাখ টাকাও বিবাহের প্রকৃত যিম্মাদারি আদায়ের জন্য নয়, বরং কেবল ফুযুল রসম-রেওয়াজ পালনের জন্য দরকার হয়। অথচ সে অর্থব্যয় জীবনের মৌলিক প্রয়োজন সমাধায় কোন ভূমিকা রাখে না।

শরী'আতের পক্ষ থেকে বিবাহে খরচের ব্যাপার বলতে সুন্নত পর্যায়ে এক ওলীমার অনুষ্ঠানই ছিল এবং তাও ছিল প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী। কিন্তু সমাজ তাতে নানা রকম অনুষ্ঠান ও দাওয়াতের সিলসিলা যোগ করে দিয়েছে এবং দিন দিন সে সিলসিলা বাড়ছে। বাগদানের অনুষ্ঠানটি তো রীতিমত এক বিবাহানুষ্ঠানেরই মর্যাদা লাভ করেছে। পূর্ণ বিবাহানুষ্ঠানের মতই বড় রকমের আয়োজন এতে করতে হয়। তারপর আছে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। বিবাহের পর নানা রকম নিয়ম ও একেক দিন একেক অনুষ্ঠান। সামাজিকভাবে এগুলোকে এতটাই জরুরি মনে করা হয় যে, এসব ছাড়া বিবাহের কল্পনাই করা যায় না। অনুষ্ঠানগুলিতেও যুগের নিত্য-নতুন ফ্যাশন অনুযায়ী ব্যয়ের নতুন-নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। নতুন-নতুন দাবি-দাওয়া সামনে আসছে। নতুন-নতুন প্রথা অস্তিত্ব লাভ করছে। মোটকথা ফালতু রসম-প্রথার এক সুদীর্ঘ তালিকা। এসব প্রথা বিবাহের বিষয়টাকে এক ব্যয়বহুল দায়ভারে পরিণত করেছে। সাধারণত হালাল উপার্জন দ্বারা যা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য কোনও না কোনওভাবে হারাম উপার্জনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। না জানি বিবাহের পুণ্যকর্মটি এভাবে কত রকমের গুনাহ ও অসৎকর্মের উপলক্ষ হয়ে যায়। বলাবাহুল্য যে, বিবাহের সূচনাই হয় গুনাহ দ্বারা, অসৎকর্মই হয় যার ভিত্তিপ্রস্তর, তাতে কিভাবে বরকতের আশা করা যায় এবং কিভাবেই তা দাম্পত্য জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে?

আনন্দের স্থানে পরিমিত আনন্দ উদ্‌যাপনে শরীআত কোন বাধা দেয়নি। কিন্তু যে আনন্দ উদ্‌যাপনে পরিমিতিবোধের পরিচয় দেওয়া হয় না। কোন ভারসাম্য রক্ষা করা হয় না, শরীআত তা কখনও অনুমোদন করে না। আজ আনন্দ উদ্‌যাপনের নামে আমরা যে নিজেদেরকে রসম-রেওয়াজের

বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছি, তা যে কেবল বৈবাহিক আনন্দের ভারসাম্য নষ্ট করেছে তাই নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে তা বিবাহের আনন্দকেই মাটি করে ফেলেছে। যে আনন্দ ছিল মানসিক স্ফূরণের নাম, আধুনিক বিয়ে-শাদীতে তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। তদস্থলে গুচ্ছের প্রথা পালনই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে কণামাত্র ত্রুটি করা যাবে না। ত্রুটি হয়ে গেলে নিন্দা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। হাজারও রকমের অভিযোগ তোলা হয়। তাই চেষ্টা করা হয় যাতে বিবাহের সবগুলো প্রথা নিখুঁতভাবে পালন হয়ে যায়। আর এভাবে বিবাহের অনুষ্ঠানসমূহ সত্যিকারের আনন্দের বদলে রীতি-রেওয়াজের ঘর পূরণেই সাবাড় হয়ে যায়। তাতে টাকা-পয়সা তো পানির মত খরচ হয়ই, সেই সংগে প্রথাগত নিয়ম-নীতির ঝক্কি-ঝামেলায় মন–মেজাযও ভালো থাকে না। যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে, তাদের আরাম হারাম হয়ে যায়। রাজ্যের কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে গিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারপরও কোনও না কোনও খুঁত থেকে যায় আর তা নিয়ে অভিযোগের ঝড় ওঠে। অনেক সময় তা ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়।

আমরা সকলেই মনে করি, এ অবস্থার সংশোধন দরকার এবং মুখে তা উচ্চারণও করি, কিন্তু কাজের বেলায় তার প্রমাণ দিতে পারি না। যখন সামাজিক রীতি-নীতি পালনের জন্য বহুমুখী চাপ শুরু হয়ে যায়, তখন আর কথা ঠিক রাখতে পারি না; সেই চাপের সামনে আত্মসমর্পণ করি।

তবে কি এ অবস্থার সংশোধন সম্ভব নয়? অবশ্যই সম্ভব এবং তার একমাত্র উপায় হল একাজে স্বচ্ছল ও প্রভাবশালী লোকদের এগিয়ে আসা। তারা যদি নিজেদের বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠান যথাসম্ভব সাদামাঠাভাবে সম্পন্ন করে এবং যে সব রসম-রেওয়াজ বিবাহকে আযাবে পরিণত করেছে, হিম্মতের সাথে তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে, তবে তাদের দেখাদেখি অন্যরাও এরূপ করতে সাহস পাবে।

ধনী শ্রেণী যদি এগিয়ে না আসে এবং তারা এসব সামাজিক প্রথা ছাড়তে রাজি না হয়, তবে অন্ততপক্ষে সীমিত আয়ের লোকেরাই তা করুক না। তারা ধনী শ্রেণীর সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের টাকা পয়সা নষ্ট না করে বরং নিজ অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। নিজ সামর্থ্যের সীমানা কিছুতেই অতিক্রম করবে না।

এ ব্যাপারে যদি আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখি, আশা করা যায়, উপরে বর্ণিত অনর্থসমূহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

এক.

বিবাহ ও ওলীমার অনুষ্ঠান ছাড়া বাগদান, গায়ে হলুদ ইত্যাদি যত প্রথা আছে, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দেওয়া। সংকল্প করে নেওয়া যে, আমাদের বিয়ে-শাদীতে এসব প্রথা বিলকুল পালন করব না। উভয়পক্ষ সানন্দচিত্তে ও মহব্বতের সাথে একে অন্যকে কোন হাদিয়া-তোহ্ফা দিতে চাইলে তা সাদামাঠাভাবে দিয়ে দেবে, তার জন্য কোন রকম ঘটা করবে না এবং লোক-লস্কর জমিয়ে জমজমাট আয়োজনের দিকে যাবে না।

দুই.

আনন্দ প্রকাশের জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতিকে অপরিহার্য মনে করবে না, সে পদ্ধতি যাই হোক না কেন। বরং প্রত্যেকে নিজ অবস্থা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সহজ-সরলভাবে যে কর্মপন্থা সমীচীন মনে হয় তাই অবলম্বন করবে। এ ব্যাপারে কারও লোভ-লালসার শিকার হবে না এবং কোনও রকম রসম-প্রথার কাছে বাঁধা পড়বে না। আর এই সহজ সরল ব্যবস্থার কারণে কেউ তার সমালোচনাও করবে না।

তিন.

বিবাহ ও ওলীমার অনুষ্ঠানও যথাসম্ভব সহজ-সরলভাবে সমাপন করবে। নিজ সাধ্য ও সামর্থ্যের গণ্ডি অতিক্রম করবে না। মনে রাখতে হবে, নিজ গোষ্ঠীগত ও আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী কাকে দাওয়াত দেওয়া হবে আর কাকে নয়, এটা আয়োজকের সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার। কাজেই এক্ষেত্রে সে যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে, তা নিয়ে কোন রকম মন্তব্য করা হতে বিরত থাকতে হবে। অমুককে কেন দাওয়াত দেওয়া হল আর অমুককে দেওয়া হল না, এরকম অভিযোগ করা যাবে না।

চার.

সর্বদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীর প্রতি দৃষ্টি রাখবে যে,

أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً

সেই বিবাহই সর্বাপেক্ষা বেশি বরকতপূর্ণ, যাতে সর্বাপেক্ষা কম ভার বহন হয়, (মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৩৩৮৮)। অর্থাৎ টাকা পয়সাও কম খরচ হয় এবং অহেতুক শ্রম-মেহনতও বরদাশত করতে হয় না।

১৫ জুমাদাল উলা ১৪১৬ হিঃ ১৫; অক্টোবর, ১৯৯৫ ইং

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ২৬৬ পৃষ্ঠা

শর'ঈ মোহ্‌র প্রসংগ

কিছুদিন আগে একটি কাবিননামা আমার চোখ পড়েছে। তাতে দেনমোহরের ঘরে লেখা ছিল, দেন মোহরের পরিমাণ শর'ঈ মোহর বত্রিশ টাকা। এর আগেও অনেকের সাথে আলাপ-আলোচনা প্রসংগে এ বিষয়টা সামনে এসেছে এবং তা দ্বারা আমার অনুমান হয়েছে, লোকে বত্রিশ টাকাকে শরঈ মোহর মনে করে থাকে। জানি না, তাদের মধ্যে এ ধারণা কোত্থেকে জন্ম নিল। সেই সংগে এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মোহরের পরিমাণ যত কম ধরা হবে, শরীআতের দৃষ্টিতে তা ততই পসন্দনীয়। মোহর সম্পর্কে এ ছাড়া আরও নানা রকম ভুল ধারণা লক্ষ করা যায়, যার সংশোধন অতীব জরুরি।

মোহর মূলত স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীকে প্রদত্ত একটি সম্মাননা (Honorarium)। স্ত্রীকে সম্মান ও মর্যাদা দেখানোই এর উদ্দেশ্য। এটা কিছুতেই স্ত্রীর মূল্য নয় যে, এর বিনিময়ে স্বামীর হাতে স্ত্রী বিক্রি হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হবে এবং তাকে তাঁর বাঁদী বলে অমর্যাদা করা হবে। এমনিভাবে এটা কাগুজে হিসাবমাত্রও নয় যে, কথাতেই শেষ, বাস্তবে পরিশোধের কোন দায় নেই।

শরীআত স্ত্রীকে মোহর দেওয়ার যে দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পণ করেছে, তার উদ্দেশ্য স্ত্রীর সম্মানজনক অবস্থান সম্পর্কে স্বামীকে সচেতন করা। অর্থাৎ স্ত্রী হিসেবে এ নারীর একটি আলাদা মর্যাদা আছে এবং সে মর্যাদার প্রতি লক্ষ করে স্বামীর কর্তব্য তাকে যখন নিজ ঘরে আনবে, তখন তার সামনে এমন এক আর্থিক নজরানা পেশ করবে, যা তার মান-মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। কাজেই শর'ঈ এ দৃষ্টিভংগির দাবি হল, মোহর নির্ধারণকালে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দিকে লক্ষ রাখা। অর্থাৎ মোহরের পরিমাণ এতটা কম হতে পারবে না, যার ভেতর স্ত্রীর মর্যাদার বিষয়টা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় এবং এত বেশিও হতে পারবে না, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়, যদ্দরুন তাকে হয়ত মোহর অনাদায় রেখেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে অথবা স্ত্রীর কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর আসল প্রাপ্য হল 'মাহ্‌রে মিছ্‌ল'। প্রত্যেক নারীর খান্দানে তার সমতুল্য নারীর বিবাহে সাধারণত যে 'মোহর ধার্য করা হয়ে থাকে তাকে 'মাহ্‌রে মিছ্‌ল' বলে। নিজ খান্দানে অন্য কোন নারী না থাকলে খান্দানের বাইরে তার সমতুল্য নারীদের মোহরকেও তার 'মাহ্‌রে মিছ্‌ল' বলা হয়। শরীআতের দিক থেকে নারীর মূল অধিকার হল এই মাহ্‌রে মিছ্‌ল। এ কারণেই বিবাহকালে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কোন মোহর নির্ধারণ করা না হলে সেক্ষেত্রে আপনা আপনিই 'মাহ্‌রে মিছ্‌ল' নির্ধারিত হয়ে যায় এবং স্বামীর পক্ষে তা আদায় করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে যায়। তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে মাহ্‌রে মিছ্‌ল অপেক্ষা কম নিতে রাজি থাকলে বা স্বামী মাহ্‌রে মিছ্‌ল অপেক্ষা বেশি দিলে ভিন্ন কথা। তাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এরূপ কমবেশি করার অবকাশ আছে।

তবে শরীআত এ ক্ষেত্রেও সর্বনিম্ন মোহরের একটা সীমারেখা দিয়ে দিয়েছে, যার নিচে নামা জায়েয নয়। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল দশ দিরহাম। দশ দিরহাম হল দু'তোলা সাড়ে সাত মাশা পরিমাণ রুপা। বর্তমান কালের মূল্য অনুযায়ী তাতে দু'শ টাকার কাছাকাছি হয়।[1] এই সর্বনিম্ন পরিমাণের অর্থ এ নয় যে, শরীআত এ পরিমাণ মোহর নির্ধারণকে পসন্দ করে; বরং এর অর্থ হচ্ছে, মাহ্‌রের এই সর্বনিম্ন সীমার নিচে নামা স্ত্রীর জন্যও জায়েয নয় অর্থাৎ এর কম পরিমাণে স্ত্রী রাজি থাকলেও শরীআত রাজি নয়। কেননা, সে ক্ষেত্রে মোহর নির্ধারণ দ্বারা শরীআতের যা উদ্দেশ্য, তা পূরণ হয় না। কেননা অতটা কম মোহর স্ত্রীর পক্ষে মর্যাদাকর নয়।

মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণটাও নির্ধারণ করা হয়েছে আর্থিক দিক থেকে দুর্বলদের প্রতি লক্ষ করে। অর্থাৎ যারা বেশি দেওয়ার সামর্থ্য রাখে না, তারা যাতে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে সর্বনিম্ন মোহর দিয়ে বিবাহ করতে সক্ষম হয়, কেবল সেই সুযোগটা তাদের জন্য রাখা হয়েছে। নচেত সচ্ছল-সামর্থ্যবান লোকেরাও এ পরিমাণ মোহরেই বিয়ে করবে এবং শরীআতের অভিপ্রায়ই হল মোহরের পরিমাণ দু'শ দিরহাম রাখা আর সে অর্থে এটাই শর'ঈ মোহর, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ গলত।

বর্তমানকালে যারা বত্রিশ টাকাকে শার'ঈ মোহর বলছে, তারা দু'টো ভুল করছে। এক তো স্থায়ীভাবে দশ দিরহামের মূল্য স্থির করে নিয়েছে বত্রিশ

---

১. এটি বহু বছর আগের হিসাব। বর্তমানে (রমযান ১৪৩৫ হিজরী) প্রতি তোলা রূপার পাইকারী মূল্য ৭২০ টাকা। –সম্পাদক

টাকা। অথচ কোনও কালে এর মূল্য বত্রিশ টাকা থাকলেও পরবর্তীকালে তা ক্রমে বাড়তে থেকেছে এবং বর্তমানে তো বহুগুণ উপরে উঠে গেছে। দ্বিতীয় ভুল হল, শরীআত যে পরিমাণকে মোহরের সর্বনিম্ন স্তর সাব্যস্ত করেছে, তারা তাকেই শরীআতের পসন্দনীয় পরিমাণ ধরে নিয়েছে এবং মনে করছে, এর বেশি মোহর ধার্য করা ঠিক নয়, অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এটা যে কতবড় ভুল তা মোহরে ফাতিমীর দিকে লক্ষ করলেই অনুমান করা যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার মোহর ধার্য করেছিলেন পাঁচশ' দিরহাম (কান্যুল-উম্মাল, হাদীছ ৩৭৭৪৩ (১৩খ, ৬৫৭ পৃঃ). যা ১৩১ তোলা তিন মাশা রূপার সমপরিমাণ। বর্তমানকালে এর মূল্য হয় প্রায় দেড় লাখ টাকা। তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীদের মোহরও এর কাছাকাছিই ছিল। মধ্যবিত্তদের হিসাবে এ পরিমাণটি খুবই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য।

আবার অনেকে মোহরে ফাতিমীকে শর'ঈ মোহর শব্দে ব্যক্ত করে এবং এর দ্বারা তারা বোঝাতে চায়, এর কম-বেশি মোহর ধার্য করা শরীআতে পসন্দনীয় নয়। অথচ এটাও একটা ভুল ধারণা।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উভয় পক্ষ যদি মোহরে ফাতিমীতে একমত হয় এবং এই চিন্তায় তারা তার সমপরিমাণ মোহর ধার্য করে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় এটা ভারসাম্যমান ও বরকতপূর্ণ হবে এবং সুন্নতের অনুসরণ করার ছওয়াবও পাওয়া যাবে; তবে এ জযবা অবশ্যই প্রশংসনীয় ও মূল্যায়নযোগ্য; কিন্তু তাই বলে এটাকে এই অর্থে শর'ঈ মোহর সাব্যস্ত করা যে, এর কম-বেশি করা শরীআতে পসন্দনীয় নয়, সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন ধারণা। প্রকৃতপক্ষে মোহরে ফাতেমীর চেয়ে কম বা বেশি মোহর ধার্য করলে তাতে শরীআতের দৃষ্টিতে দোষের কিছু নেই। হাঁ পরিমাণ নির্ধারণে এদিকে লক্ষ রাখা অবশ্যকর্তব্য যে, তা যেন স্ত্রীর পক্ষে মর্যাদাকর হয় এবং স্বামীরও সামর্থ্যের মধ্যে হয়।

যারা বেশি মোহ্র ধরতে নিষেধ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল মোহরের বিধানকে কার্যত প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ সামর্থ্যের বাইরে মোহর ধরলে তা একটি কাগুজে কারবার রূপেই থেকে যায়। বাস্তবে তা কখনও আদায় করা হয় না। ফলে স্বামীর ঘাড়ে মোহর অনাদায়ের গুনাহ থেকে যায়। তা ছাড়া অনেক সময় বেশি পরিমাণ মোহর ধরার উদ্দেশ্যই থাকে কেবল লোক দেখানো। নিজের শান-শওকতের মহড়া হিসেবেই অস্বাভাবিক রকমের মোহর ধার্য করা হয়। বলাবাহুল্য, উভয়টাই ইসলামী মেজায ও চরিত্রের

সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই বুযুর্গানে দ্বীনের অনেকেই অস্বাভাবিক বেশি মোহর ধরতে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটা ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজ খিলাফত আমলে একদিন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। প্রসংগত তিনি বলছিলেন, তোমরা বেশি পরিমাণ মোহর ধার্য করবে না। তখন এক মহিলা এই বলে আপত্তি জানাল যে, কুরআন মাজীদে তো এক স্থলে মোহর সম্পর্কে 'কিনতার' (সোনা-রুপার স্তূপ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (নিসা : ২০) বোঝা গেল মোহর সোনা-রুপার স্তূপ পরিমাণও হতে পারে। তা হলে আপনি বেশি মোহর ধরতে নিষেধ করছেন কিভাবে? একথা শুনে হযরত উমর (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ: তার বক্তব্য সঠিক। সুতরাং বেশি মোহর ধার্য করার প্রতি সাধারণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ সংগত নয়।

(আল-মাকাসিদুল-হাসানা : ১ খ. ১৭১: কাশফুল খাফা ১/২৬৯)

অর্থাৎ উদ্দেশ্য যদি নাম ডাক না হয় এবং আদায় করার সামর্থ্য ও ইচ্ছাও থাকে, তবে বেশি পরিমাণ ধার্য করাও জায়েয। কিন্তু এর কোনও একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকলে তা জায়েয হবে না।

প্রসংগত আরও একটা বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়া জরুরি মনে করছি। মোহর সাধারণত দু'ভাবে ধরা হয়ে থাকে। নগদ (মু'আজ্জল) ও বাকি (মুয়াজ্জাল)। যেহেতু বিবাহের মজলিসেই শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাই এর প্রকৃত অর্থ অনেকেরই জানা থাকে না। মু'আজ্জাল বা নগদ মোহর বলা হয় ওই মোহরকে, যা বিবাহ হওয়ামাত্র স্বামীর উপর অবধারিত হয় এবং বিবাহকালে বা তারপরে যথাসম্ভব শীঘ্র তা আদায় করা জরুরি হয়ে যায়। স্ত্রীরও তা যখন ইচ্ছা আদায় করে নেওয়ার অধিকার থাকে। আমাদের সমাজে স্ত্রীগণ সাধারণত এ রকম দাবি করে না। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করার কোন সুযোগ নেই যে, আমার জন্য তা পরিশোধ করা জরুরি নয়। বরং স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকর্তৃক দাবি জানানোর অপেক্ষায় না থেকে যথাসম্ভব শীঘ্র পরিশোধ করে নিজেকে দায়মুক্ত করে ফেলা।

আর মুয়াজ্জাল বলা হয় এমন মোহরকে, যা আদায়ের জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কোন মেয়াদ স্থির করে নেওয়া হয়। নির্ধারিত সেই মেয়াদের আগে স্বামীর উপর তা পরিশোধ করা ওয়াজিব হয় না এবং স্ত্রীরও তা দাবি করার অধিকার থাকে না। তো মোহর মুয়াজ্জাল হওয়ার অর্থ তো এটাই যে, বিবাহকালে তা পরিশোধের জন্য কোন মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে, কিন্তু আমাদের সমাজে এর জন্য কোন মেয়াদ স্থির করা ছাড়াই শুধু এতটুকুই বলে

দেওয়া হয় যে, এ পরিমাণ মাহ্‌র মুয়াজ্জাল বা বাকি। আর সমাজের প্রচলন অনুযায়ী এর অর্থ হয়ে থাকে, এ পরিমাণ মোহর আদায় করা কেবল তখনই জরুরি হবে, যখন বিবাহ খতম হয়ে যাবে, অর্থাৎ তালাক বা স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে কারও মৃত্যু হয়ে যাবে। তালাক বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তা আদায় করা জরুরি হয় না।

আর একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য, আমাদের সমাজে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে যে অলংকার দেওয়া হয়, মূলত মোহরের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সমাজের রেওয়াজ অনুযায়ী এসব অলংকারের মালিক স্ত্রী নয়, বরং স্বামী। সে তা সাময়িকভাবে স্ত্রীকে ব্যবহার করতে দেয় মাত্র। এ জন্যই স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী তা বিক্রি করতে, কাউকে উপহার দিতে বা অন্য কোন কাজে লাগাতে পারে না। আর একারণেই আল্লাহ না করুন স্বামী-স্ত্রীতে তালাক হয়ে গেলে স্ত্রীর কাছ থেকে সে সব অলংকার ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং অলংকার দ্বারা মোহর আদায় হয় না। হ্যাঁ: স্বামী যদি স্ত্রীকে পরিষ্কার বলে দেয়, এ অলংকার তোমাকে মোহর বাবদ দেওয়া হচ্ছে আর এভাবে স্ত্রী তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তা দ্বারা মোহর আদায় হয়ে যাবে। এ অবস্থায় স্ত্রী তার মালিক হয়ে যাবে এবং মালিক হিসেবে সে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে ও যে-কোন কাজে লাগাতে পারবে। স্বামীর তা কোনও অবস্থায়ই ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে না।

যা হোক, শরী'আতে মোহরের বিষয়টা কাগুজে কারবার মাত্র নয় যে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া বলে ফেললেই হল। বরং এটা একটা অবশ্যপরিশোধ্য দেনা, যা চিন্তা-ভাবনা করে সম্পন্ন করা চাই। এটা একটা আর্থিক লেনদেন। কাজেই এর সর্বদিক পরিষ্কার হওয়া চাই। এর চুক্তি ও কথাবার্তা যেভাবে হবে, আদায়ও সেভাবেই করতে হবে। ধার্য করার পর আদায় সম্পর্কে উদাসিনতা দেখানো এবং পরিশেষে মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া – যখন সামাজিক চাপের কারণে মাফ করা ছাড়া তার উপায় থাকে না – একটা গুরুতর অবিচার ও কঠিন পাপকর্ম।

১৮ জুমাদাছ-ছানিয়া- ১৪১৬ হিঃ

১২ নভেম্বর ১৯৯৫ খৃঃ

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র

যৌতুক প্রসংগ

বছর কয়েক আগে শামের এক বুযুর্গ আলেম শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ (রাহ.) আমাদের এখানে তাশরীফ এনেছিলেন। ঘটনাক্রমে স্থানীয় এক বন্ধু উপস্থিত হন এবং আরব দেশীয় একজন বুযুর্গকে দেখে তাঁর কাছে এই বলে দু'আ চান যে, আমার দু'টি মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেছে। দু'আ করবেন, আল্লাহ তা'আলা যেন বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে দেন। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, কেন উপযুক্ত কোন পাত্র কি পাওয়া যাচ্ছে না? বন্ধু বলল, তা পাওয়া যাচ্ছে, দু'মেয়ের জন্যই যোগ্য পাত্র আছে, কিন্তু আমার কাছে এমন টাকা পয়সা নেই, যা দ্বারা তাদের বিবাহ সম্পন্ন করতে পারব। শুনে শায়খ তাজ্জব বনে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তারা আপনার পুত্র, না কন্যা? বলল, কন্যা। তিনি চরম বিস্ময়ে বললেন, কন্যাদের বিবাহের জন্য টাকা-পয়সা দরকার হবে কেন? সে বলল, তাদের বিবাহে যৌতুক দেওয়ার মত টাকা আমার নেই। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, যৌতুক কি জিনিস? এর জবাবে উপস্থিত লোকজন বলল, আমাদের দেশে প্রচলন হল, বিয়েতে মেয়ের বাবা, মেয়ের অলংকার, পোশাক ও ফার্নিচার ইত্যাদিসহ অনেক কিছু দিয়ে দেয়। একেই যৌতুক বলে। যৌতুক দেওয়াকে মেয়ের বাবার এক অপরিহার্য কর্তব্য মনে করা হয় এবং এছাড়া আমাদের দেশে বিবাহের কল্পনা করা যায় না। মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে এর অনেক চাহিদা। তারা সরাসরি এর দাবি করে থাকে, এসব বিবরণ শুনে শায়খ দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন এবং বললেন, মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি একটা অপরাধ, যেজন্য তার বাব্যকে এরকম শাস্তি দিতে হবে? তারপর বললেন, আমাদের দেশে এ জাতীয় কোন রেওয়াজ নেই। অধিকাংশ স্থানে তো এটা স্বামীরই কর্তব্য গণ্য করা হয় যে, স্ত্রীকে আনার আগেই সে তার প্রয়োজনীয় সবরকম সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রাখবে। মেয়ের বাবাকে কোন খরচই করতে হয় না। কোন কোন স্থানে এরকম প্রচলন আছে যে, মেয়ের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তার পিতাই কিনে দেয়, কিন্তু টাকা দেয় ছেলে। হাঁ স্বামীগৃহে যাওয়ার সময় পিতা চাইলে মেয়েকে কোন হাদিয়া-তোহফা দিতে পারে; কিন্তু সেটাকে তার অবশ্য কর্তব্য গণ্য করা যায় না। আমাদের এ অঞ্চলে যৌতুক দেওয়াকে যেমন বিবাহের এক অবিচ্ছেদ্য

অংগ মনে করা হয়, মুসলিম জাহানের অন্যত্র বিষয়টা ঠিক এরকম নয়। বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

উপরে শায়খের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে, মেয়ের বিদায়কালে পিতা যদি তাকে কোন উপহার দিতে চায়, তা দিতে পারে এবং এক্ষেত্রে তার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখাই শ্রেয়। অর্থাৎ মেয়ের কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রী পিতা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী হাদিয়াস্বরূপ দিলে তাতে কোন দোষ নেই। ব্যস শরীআতের মাপকাঠিতে যৌতুক সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভংগি এতটুকুই। এর বেশি যৌতুককে বিবাহের অপরিহার্য শর্ত গণ্য করা বা শ্বশুর পক্ষ হতে যৌতুকের দাবি করা এবং তা না দিলে বা প্রত্যাশা অনুযায়ী দেওয়া না হলে সেজন্য মেয়েপক্ষের সমালোচনা করা ও মেয়েকে মানসিক কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ শরীআতবিরোধী কাজ। এমনিভাবে যৌতুক কোন প্রদর্শনের বস্তুও নয় যে, বিবাহকালে তা দেখিয়ে নিজের শান-শওকত প্রকাশ করবে ও বাহাদুরি ফলাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে নানা রকম ভুল ধারণা চালু হয়ে আছে এবং উত্তরোত্তর তা আরও বিস্তার লাভ করছে। নিচে এর সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল।

এক. যৌতুককে বিবাহের এক অবশ্যপালনীয় শর্ত মনে করা হয়। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত যৌতুক কেনার অর্থ সংগ্রহ না হয়, ততক্ষণ মেয়ের বিবাহ দেওয়া যায় না। নাজানি আমাদের সমাজে এমন কত মেয়ে আছে, যাদের কেবল এ কারণেই বিবাহ হচ্ছে না যে, তার বিয়েতে যৌতুক দেওয়ার মত অর্থ তার বাবার নেই। এমনকি উপযুক্ত কোন সম্বন্ধ আসলে মেয়ের বাবা যৌতুকের অর্থ সংগ্রহের জন্য অবৈধ উপায় পর্যন্ত অবলম্বন করে, তা সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, তসরূফ, প্রতারণা যাই হোক না কেন। যে সকল পিতা চরিত্রবান হওয়ার কারণে কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে না, তারাও অন্ততপক্ষে ধার-কর্জে জড়িয়ে নিজেকে সর্বশ্বান্ত করার জোগাড় করে ফেলে।

দুই. যৌতুকের পরিমাণও দিন দিন বাড়ছে এবং তার অপরিহার্য সামগ্রীর তালিকায় নতুন-নতুন জিনিস যোগ হচ্ছে। এখন আর যৌতুক পিতার পক্ষ হতে কন্যাকে দেওয়া কোন উপহার নয়, যা সে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খুশিমনে দেওয়ার চেষ্টা করবে, বরং এটা একটা সামাজিক বাধ্যবাধকতা, যা সাধ্যের অতীত হলেও সমাজের চাপে তাকে দিতেই হবে। সুতরাং তা আর এখন মেয়ের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং জামাইয়ের দরকারি জিনিসপত্রও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এমনকি জামাইয়ের ঘর দুয়ার সাজিয়ে দেওয়াও যৌতুকের অপরিহার্য অংগ হয়ে গেছে, তা দেওয়ার

মত সামর্থ্য পিতার থাকুক বা না থাকুক এবং সে তাতে খুশি থাকুক বা না থকুক।

তিন. যৌতুক দেওয়ার ক্ষেত্রে এখন কেবল মেয়ে-জামাইয়ের মন সন্তুষ্ট করার দিকে নজর রাখলেই চলে না, বরং এটা এমন এক প্রদর্শনীর স্তরে পৌঁছে গেছে যে, তাতে দর্শকদেরও খুশি করার চেষ্টা থাকতে হবে, যাতে তা দেখে যে কেউ খুশিতে ডগমগ হয়ে যায় এবং প্রশংসা করতে বাধ্য হয়।

চার. যৌতুক প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা নীচতা হল, তার মান ও পরিমাণের প্রতি পাত্রপক্ষের নজরদারি। তারা কোন রাখঢাক ছাড়াই দামী-দামী যৌতুকের দাবি জানায়। অনেকে অতটা খুলে না বললেও ইশারা-ইঙ্গিতে তা বোঝানোর চেষ্টা করে। অন্ততপক্ষে এই আশা তো রাখেই যে, বধূ যেন দামী-দামী যৌতুক নিয়ে স্বামীগৃহে আসে। সেই আশা পূরণ না হলে নিন্দা-ধিক্কারের একশেষ করা হয় এবং নববধূকে নানাভাবে যন্ত্রণা পোহাতে হয়।

যৌতুকের সাথে এ জাতীয় যেসব রসম-রেওয়াজ ও দৃষ্টিভংগি জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর কারণে যেসব সামাজিক অনাচার জন্ম নিয়েছে ও নিচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তাবিদগণ অনবহিত নন। এ সম্পর্কে বহু লেখা-জোখা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। এমনকি যৌতুক রোধের জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন আইন-কানুনও তৈরি করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ এসব প্রচেষ্টার কিছু সুফলও অবশ্যই পাওয়া গেছে। যৌতুক সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় এখন বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যৌতুককে প্রদর্শন করার মানসিকতা অনেকটাই কমে গেছে। আইনের চাপে যৌতুকের বাধ্যবাধকতায় শিথিলতা এসেছে, কিন্তু তারপরও সমাজের একটা বড় অংশের ভেতর থেকে উপরিউক্ত ধ্যান-ধারণার প্রবল প্রতাপ অদ্যাবধি খতম হয়নি।

কারও কারও প্রস্তাব হল, আইন করে যৌতুককে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একটা সামাজিক সমস্যা। কেবল আইন দ্বারা এ জাতীয় সমস্যার সমাধান করা যায় না। তা ছাড়া এজাতীয় আইনও সব সময় মেনে চলা সম্ভব হয় না। আসলে এর জন্য দরকার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে অনুকূল চিন্তা-চেতনা ও মন–মানসিকতা তৈরি করা। এমনিতে তো এটা শরীআতের কোন নিষিদ্ধ কাজ নয় এবং নয় অনৈতিক আচরণও। একজন পিতা তার আদরের কন্যাকে স্বামীগৃহে যাওয়ার সময় এমন কোন উপহার দিতেই পারেন, যা তার ভবিষ্যত জীবনে কাজে আসবে। এটা সম্পূর্ণ মনের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার। খোদ নবী কারীম

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহেবযাদী হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু 'আনহাকে তাঁর বিবাহকালে সাদামাঠা কিছু যৌতুক দান করেছিলেন। এজাতীয় উপহারের জন্য শরী'আত কোন সীমাও নির্ধারণ করে দেয়নি। অন্য কোন ফ্যাসাদ না থাকলে যে-কোন পিতা তার মনের আবেগে যা কিছু দিতে চান দিতে পারেন। কিন্তু এতে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেছে, তা মানুষেরই কৃতকর্মের পরিণাম। এক তো তারা এটাকে এক প্রদর্শনীর ব্যাপারে পরিণত করেছে ও বাহাদুরি ফলানোর মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত পাত্রপক্ষ কার্যত এটাকে নিজেদের প্রাপ্য মনে করছে, অন্ততপক্ষে এর আকাঙ্ক্ষা তো তাদের মনে থাকেই। সবচে' খারাপ কথা হল, যৌতুকের মান ও পরিমাণ আশানুরূপ না হলে বউ ও তার পরিবারের লোককে হেনস্থা করা হয় ও নিন্দা-সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেওয়া হয়।

যৌতুকের এসব বিপত্তি দূর করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের লোককে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে এসব ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসীহত ও প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে এর মন্দত্ব মানুষকে বোঝাতে হবে এবং বহুমুখী পদক্ষেপ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ ব্যাপারে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এমন একটা আবহ তৈরি করতে হবে, যাতে সাধারণ-বিশেষ সকলের চোখে যৌতুক গ্রহণের প্রবণতা একটা চরম নিন্দনীয় খাসলতে পরিণত হয়ে যায় এবং তা গ্রহণ করাকে যে-কেউ নিজের পক্ষে অবমাননাকর গণ্য করে।

যে-কোন সামাজিক ব্যাধি একদিনেই নির্মূল করা যায় না। তা নির্মূল হয় নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ও পর্যায়ক্রমিক মেহনতের মাধ্যমে। প্রথমে ক্ষমতাবান, বিদ্বান, বিজ্ঞজন ও প্রভাবশালী মহল সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গণসচেতনতা গড়ে তোলে। সেই গণসচেতনতাই ক্রমে শক্ত-পোক্ত হয়ে মানুষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এর জন্য চাই দরদী মন, চাই অবিরাম চেষ্টা। আফসোস আমাদের এই স্তরের অধিকাংশ লোকই এ নিয়ে বেশি ভাবার অবকাশ পায় না। তারা নানা কাজে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, সমাজ সংস্কার ও মানুষের চিন্তা-চেতনা নির্মাণের দিকে নজর দেওয়ার সময় তাদের নেই। অথচ জাতি গঠনের জন্য এটা ভিত্তিপ্রস্তরের মর্যাদা রাখে। এ ছাড়া কোন সুস্থ ও আদর্শ জাতি গঠন করা কোনও দিন সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনীতি ও দলাদলির ডামাডোলে গণসচেতনতা তৈরির চিন্তা-ভাবনা এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, এখন তার নাম নেওয়াটাও যেন একটা তামাশার ব্যাপার। তবে এ পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে বসে যাওয়াটাও কোন কাজের কথা নয়। একজন

সত্যের ঘোষক ও আলোর পথের দিশারীকে হতাশ হলে চলে না। সে তার কথা বলতে থাকবে। একাকি হলেও সত্যের পথে চলতে থাকবে। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাবে। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়বে না। এভাবে চেষ্টা চালাতে থাকলে একটা সময় আসে, যখন সত্যের বাণী আপন বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং অন্যকে নিজের দিকে টানতে শুরু করে। আর এভাবে কেবল জাতির চিন্তা-চেতনায়ই নয়! বরং তাদের কার্যকলাপেও মহাবিপ্লব ঘটিয়ে দেয়।

২৫ জুমাদাহ-ছানিয়া ১৪১৬ হিঃ
১৯নভেম্বর ১৯৯৫ খৃঃ

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ২৮২ পৃষ্ঠা

বিয়ের দাওয়াত ও বরযাত্রা

পূর্বের নিবন্ধে যৌতুক সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। নিবন্ধটি লেখার পর ইষ্টান ব্রিস্টল (ব্রিটেন) থেকে জনৈক ব্যক্তির একটি চিঠি আমার হাতে আসে। তাতে তিনি লেখেন–

আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তার সূচনা কখন থেকে তা নির্ণয় করা তো ইতিহাসবিদের কাজ, কিন্তু তার ক্ষতি সকলেরই চোখের সামনে। বিষয়টি হচ্ছে যৌতুক। যৌতুক প্রথাটি যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলিমদের মধ্যে প্রবল-পরাক্রমে বিরাজ করছে, তাই সেখান থেকে যারা এদেশে এসেছে, তারা এ প্রথাটিও সংগে নিয়ে এসেছে এবং বর্তমানে পশ্চিমেও বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। আপনার কাছে অনুরোধ আপনি শরী'আতের দৃষ্টিতে এ প্রথাটি ঠিক কেমন তা ব্যাখ্যা করে দেবেন, যাতে ইউরোপের নতুন প্রজন্ম এ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং যেই হাজার হাজার মেয়ে এই কুপ্রথার অভিশাপে অবিবাহিতা থেকে যাচ্ছে তাদেরও সৌভাগ্যের দুয়ার খুলতে পারে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন হচ্ছে,

১. যৌতুক দেওয়া কি অবশ্যকর্তব্য?

২. অবশ্যকর্তব্য হলে তার পরিমাণ কি?

৩. যৌতুক দেওয়ার পর কি পিতা-মাতার মীরাছে মেয়ের কোন অধিকার থাকে না?

৪. সাধারণত মেয়েরা মীরাছ থেকে নিজ অধিকার এই চিন্তা করে ছেড়ে দেয় যে, সে তো যৌতুক পেয়ে গেছে এবং সুখে দুঃখে বাবার থেকে সহযোগিতা পায় ও আরও পাওয়ার আশা থাকে। তাছাড়া তার বিয়েতেও তো বহু টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসব ব্যাপার ছেলের বেলায়ও কি কার্যকর থাকে না? তা সত্ত্বেও সে মীরাছ পাবে, আর মেয়ে পাবে না-এ কেমন কথা?

৫. মেয়ের বাবা বরযাত্রীকে যে খাবার খাওয়ায় শরীআতের দৃষ্টিতে তার বিধান কী?

৬. আরব দেশগুলোতে মেয়ের বাবা-মা যে খরচ করে, তার টাকা পাত্রকে পরিশোধ করতে হয়, কিন্তু আমাদের দেশে পিতা-মাতার ঘাড়েই এটা চাপানো হয়। এর কী যুক্তি?

৭. কোন কোন এলাকায় পণপ্রথা চালু আছে। অর্থাৎ মেয়ের বাবা পাত্রপক্ষ থেকে বিয়ের খরচ ছাড়াও বাড়তি টাকা দাবি করে থাকে। এর শরঈ বিধান কী?

আপনার রচনাবলী দ্বারা অগণ্য মানুষ উপকৃত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 'জংগ' পত্রিকায় আপনার যে ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ হয়ে থাকে, সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য হওয়ার কারণে তার তাছীর অনেক বেশি। আপনি আমার উপরিউক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর যদি এ পত্রিকাতেই ছাপিয়ে দেন, আশা করি তাতে বহু লোকের সন্দেহ নিরসন হবে ও ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন হয়ে যাবে।

ইতি আব্দুল মজীদ

ইষ্টান, ব্রিস্টল, বৃটেন।

পত্রলেখকের কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আমার পূর্বের নিবন্ধে এসে গেছে, যেমন যৌতুক সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা আদৌ বিবাহের অপরিহার্য অনুষংগ নয়। কাজেই যৌতুক দেওয়ার সামর্থ্য না থাকার বাহানায় মেয়েকে অনূঢ়া বসিয়ে রাখার কোন বৈধতা নেই। পিতা তার মেয়ের স্বামীগৃহে যাত্রাকালে যদি খুশীমনে সামর্থ্য অনুযায়ী কোন হাদিয়া-তোহ্ফা দিতে চায়, তবে নিঃসন্দেহে সে তা দিতে পারে, এতে দোষের কিছু নেই। দোষ হয় তখনই, যখন তাকে বিবাহের অপরিহার্য শর্ত মনে করা হয় বা তাতে বাহাদুরি ফলানোর ইচ্ছা থাকে। এমনিভাবে স্বামী বা তার পরিবার যদি যৌতুকের দাবি করে বা তার আশায় থাকে, তাও অত্যন্ত গর্হিত ও দূষণীয় সাব্যস্ত হবে।

পত্রলেখক নতুন যে কথা লিখেছে তার সম্পর্ক মীরাছের সাথে। তার প্রশ্ন হচ্ছে যৌতুক দেওয়ার পর কি পিতামাতার মীরাছে মেয়ের কোন হক থাকে না? বস্তুত মহল বিশেষে এ ধরনের একটা ভুল ধারণা আছেও এবং তার ব্যাপকতা বড় কম নয়।

এ প্রসংগে আরয হল, মীরাছের সাথে যৌতুকের কোন সম্পর্ক নেই। পিতা যদি যৌতুক হিসেবে তার যথাসর্বস্বও মেয়ের পায়ে লুটিয়ে দেয়, তবুও তার উত্তরাধিকার লোপ পায় না। বাবার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদে মেয়ের প্রাপ্য অংশ যথারীতি সংরক্ষিত থাকবে। বোনকে বঞ্চিত করে

নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেওয়ার কোন অধিকার তার ভাইদের থাকবে না। বোনকে যথেষ্ট পরিমাণে যৌতুক দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে মীরাছ থেকে তাকে বঞ্চিত করার কোন বৈধতা নেই। ছেলে হোক বা মেয়ে, পিতা নিজ জীবদ্দশায় তাকে যা-কিছুই দিয়েছে, সে কারণে তার মীরাছের অংশে কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। তবে সন্তান-সন্ততিকে কোন কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা পিতার অবশ্যকর্তব্য। কোন এক সন্তানের প্রতি দানের বারি বর্ষণ করে অন্যদেরকে বঞ্চিত করা কোনও ক্রমেই জায়েয নয়। তবে এটা এক স্বতন্ত্র মাসআলা, যে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

যা হোক এটা এক স্থিরীকৃত মাসআলা যে, যৌতুক দেওয়ার কারণে মীরাছ থেকে মেয়ের উত্তরাধিকার লোপ পায় না এবং এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এমনকি যৌতুক হিসেবে তাকে যা দেওয়া হয়েছে, মীরাছের প্রাপ্য অংশ থেকে তা বিয়োগও করা যাবে না। মীরাছে তার ওয়ারিসী স্বত্ব পুরোপুরিই বহাল থাকবে।

পত্রলেখক দ্বিতীয় যে প্রশ্ন তুলেছে, তা হচ্ছে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন সম্পর্কে। অর্থাৎ বরের সাথে আগত লোকজনকে যে খাবার খাওয়ানো হয়, সে ব্যাপারে শরীআতের দৃষ্টিভংগী কী? এ সম্পর্কেও আমাদের সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট বাড়াবাড়ি আছে। কেউ কেউ তো মনে করে, ছেলের বিয়েতে যেমন ওলীমা করা সুন্নত, তেমনি মেয়ের বিয়েতেও তা সুন্নত বা অন্ততপক্ষে পসন্দনীয় কাজ তো বটেই। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পাত্রীপক্ষের দিক থেকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা সুন্নত তো নয়ই, এমনকি মুস্তাহাবও নয়। বরং অন্য কোন অনিষ্ট না থাকলে তা কেবলই জায়েয পর্যায়ের। একই কথা বরানুগমন সম্পর্কে অর্থাৎ ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া সুন্নত-মুস্তাহাব কিছুই নয় এবং শরীআত বিবাহকে এর উপর মওকুফ রাখেনি। সেই সংগে একথাও ঠিক যে, অন্য কোন বিপত্তি না থাকলে বরযাত্রা কোন গুনাহের কাজও নয়।

সুতরাং যারা বরযাত্রী গমন এবং মেয়েপক্ষ কর্তৃক তাদের আপ্যায়নকে এমন পাপকর্ম গণ্য করে যেন কুরআন-হাদীছ এ কাজকে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাদের এ কঠোরতাও সমীচীন নয়। এটাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি।

সঠিক কথা হচ্ছে, বিবাহকালে বরের সাথে যদি পরিমিত সংখ্যক লোক কনের বাড়িতে যায় (যে সংখ্যা মেয়ের বাবার জন্য কোন বোঝা হবে না) এবং কনেপক্ষ মেয়েকে পাত্রস্থ করার আনন্দে তাদেরকে সহ নিজ আত্মীয়-স্বজনকেও আপ্যায়িত করে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে এ কারণেই যে, এ বরযাত্রা ও তাদের আপ্যায়নকে সমাজ তার আপন স্থানে রাখেনি। বরং এটাকে বিবাহের অপরিহার্য অনুষংগ বানিয়ে ফেলেছে। ফলে এসব আঞ্জাম দেওয়ার সামর্থ্য যাদের নেই, তাদেরও এর থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক এ ভার বহনে বাধ্য হয়ে যায়। আর এর জন্য অনেক সময় তারা অবৈধ পন্থা পর্যন্ত অবলম্বন করে ফেলে। অন্ততপক্ষে ধার-কর্জের বোঝা তো মাথায় চাপায়ই। আর কেউ যদি তা না করে এবং নিজ আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে মেয়ের বিয়েতে বড় ধরনের আয়োজন করতে সম্মত না হয়, তবে সমাজে তাকে নিন্দা কুড়াতে হয়।

কাউকে হাদিয়া-তোহফা দেওয়া বা আপ্যায়ন করার কাজটি যদি মহব্বতের সাথে ও খুশি মনে হয়, তবে গুনাহের তো প্রশ্নই আসে না, বরং এটা একটা বরকতপূর্ণ কাজ। বিশেষত যাদের সাথে নতুন আত্মীয়তা হতে যাচ্ছে, তাদের সাথে এরূপ সৌজন্য প্রদর্শন পারস্পরিক সম্প্রীতির পক্ষেও সহায়ক। শর্ত হল, তা হতে হবে আন্তরিকতার সাথে এবং সামর্থ্য অনুপাতে। যদি উদ্দেশ্য থাকে নাম কুড়ানো ও বাহাদুরি ফলানো অথবা থাকে বিনিময়ের প্রত্যাশা, তবে বরকত লাভ তো হবেই না; উল্টো গুনাহগার হতে হবে। এমনিভাবে সমাজের চাপে পড়ে করাও সংগত নয়। অর্থাৎ মনে তো ইচ্ছে নেই, কিন্তু নাক কাটা যাবে সেই ভয়ে যদি জবরদস্তিমূলক উপহার দেওয়া হয় বা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাতে আদৌ বরকত লাভ হবে না; বরং তা গুনাহ ও অমংগলের কারণ হবে। বরং এর পরিণামে সমাজে বিভিন্ন রকম অনৈতিকতা জন্ম নেয়, মানুষ নানা চারিত্রিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এটা আমাদেরই কর্মফল যে, আমরা নানা রকম মনগড়া রসম-রেওয়াজের চক্করে পড়ে ভালো-ভালো কাজকেও নিজেদের জন্য মসিবত বানিয়ে ফেলেছি। অথচ সহজ সরলভাবে ও আন্তরিকতার সাথে করলে এসব কাজে কোন দোষ ছিল না। রসম-প্রথার বাধ্যকাধকতা, নাম-ডাকের প্রত্যাশা ও সামাজিক জোর-জবরদস্তিই যত অনর্থের মূল। এরই কারণে আজ এসব ভালো কাজ অতি বড় মন্দ কাজে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং কোন মেয়ের পিতা যদি মেয়ের বিবাহে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন, নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে খুশীমনে খাওয়ায় এবং এটাকে বিবাহের অপরিহার্য অনুষংগ মনে না করে এবং সুন্নতও গণ্য না করে, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। অনুরূপ কেউ যদি নাও খাওয়ায় তাও কোন অপরাধ নয় যে, সেজন্য তার নিন্দা-সমালোচনা করা যাবে। বরং তার সে সরলতা সুন্নতেরই বেশি কাছাকাছি। তাই এর প্রশংসাই করা উচিত।

মনে করুন, কেউ পরীক্ষায় তার পুত্রের ভালো ফলাফল করার কারণে কিংবা কেউ ভালো চাকরি পাওয়ার আনন্দে তার বিশেষ-বিশেষ লোকদেরকে দাওয়াত করে খাওয়াল। এ খাওয়ানোটা কি কিছু দোষের কাজ? নিশ্চয়ই নয়। অপরদিকে কত লোকের ছেলে-পুলে পরীক্ষায় ভালো পাশ করে কিংবা তারা পসন্দের চাকরি পেয়ে যায়, অথচ সে আনন্দে কোন অনুষ্ঠান করার কথা চিন্তাই করে না আর এজন্য সমাজ চোখে তারা নিন্দিতও হয় না এবং কেউ তাদের সমালোচনাও করে না।

ঠিক এই একই পন্থা যদি বিবাহের ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হয়, তাতে অসুবিধা কোথায়? অর্থাৎ যার ইচ্ছা হয় অনুষ্ঠান করবে আর যার ইচ্ছা না হয় করবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো বিষয়টাকে সেভাবে ভাবা হয় না। বরং পাত্রপক্ষ থেকে পুরাদস্তুর দাবি থাকে যে, তাদের এত এত লোক যাবে এবং মেয়েপক্ষকে তাদের খাওয়াতে হবে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিতে যেন বিয়েই হল না। যারা বরযাত্রী ও মেয়েপক্ষের অনুষ্ঠানকে নিষেধ করেন, তারা মূলত এই বাড়াবাড়ির দিকেই লক্ষ করেছেন। তারা উৎসাহ দিয়েছেন, যেন প্রভাবশালী কিছু লোক এসব বরযাত্রা পরিহার করে এবং বিশেষ আয়োজন ছাড়াই মেয়ের বিয়ে দেয়। তা হলে তাদের দেখাদেখি সেসব দুর্বল ও সাধারণ শ্রেণীর লোকও সাদামাঠাভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে সাহস করবে, যারা সমাজের চাপে সামর্থ্যের বাইরে খরচ করতে বাধ্য হয়।

পত্রলেখক সবশেষে প্রশ্ন করেছিল, কোন কোন এলাকায় প্রচলন আছে, মেয়েপক্ষ ছেলেপক্ষ হতে পণ গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিয়ের খরচাদি ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা ছেলের কাছে দাবি করা হয়। তা ছাড়া তারা মেয়ে দিতে রাজি হয় না। এ প্রথা কতটা শরীআত সম্মত?

সন্দেহ নেই এটাও একটা ভিত্তিহীন প্রথা। কোন কোন এলাকায় এ প্রথা শক্তভাবে শেকড় গেড়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। আমাদের ফকীহগণ মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্রের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণকে ঘুষ সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মতে এটা ঘুষের মতই গুনাহের

কাজ। বরং এটা এক ধরনের নির্লজ্জতা ও আত্মাবমাননাও বটে। এ যেন টাকার বিনিময়ে মেয়েকে বিক্রি করা। এ কারণেই যেসব এলাকায় এর প্রচলন আছে, সেখানে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী দাসীসুলভ ব্যবহারই করে থাকে। সুতরাং শরী'আত ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রথাটি অতি ন্যাক্কারজনক এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য।

৩ রজব ১৪১৬ হিঃ
২৬ নভেম্বর ১৯৯৫ খৃঃ
সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ২৮৭ পৃষ্ঠা

বিবাহ ও ওলীমা : কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

পূর্বের নিবন্ধসমূহে আমরা বিবাহের বিভিন্ন দিক ও তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু রসম-প্রথা সম্পর্কে আলাচনা করেছিলাম। বোঝা যাচ্ছে, তাতে বেশ সাড়া পড়েছে। কেননা, তার পরই আমার কাছে এ সম্পর্কে পাঠকদের পক্ষ হতে বিভিন্ন প্রশ্ন ও প্রস্তাবনা আসতে শুরু করে এবং দেখতে দেখতে এ সংক্রান্ত চিঠির একটা স্তূপ জমা হয়ে যায়। তা দ্বারা কয়েকটি জিনিস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়,

এক. বিয়ে-শাদী সম্পকির্ত রসম-রেওয়াজ নিয়ে মানুষ বড় পেরেশান। তারা এ সম্পর্কে স্পষ্ট সমাধান পেতে চায়।

দুই. বিয়ে-শাদী সম্পর্কে শরীআত যে বিধি-বিধান দিয়েছে, সে সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ব্যাপক। যেসব সাধারণ বিষয় মুসলিম পরিবারের প্রতিটি সদস্যই এককালে বেশ জানত, আজ ভালো লেখা পড়া করা লোক পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোন খবর রাখে না। উল্টো তার বিপরীতে ভিত্তিহীন ও মনগড়া নানা আচার-অনুষ্ঠানকে তারা দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

তিন. মানুষ এখন আবার দ্বীন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তারা এসব বিষয় সম্পর্কে সঠিক শরীআতী সমাধান জানতে চায়।

কিছু কিছু প্রশ্ন ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। আমি তার উত্তর পত্রিকায় প্রচার করা অপেক্ষা আলাদাভাবে তাদেরকে জানানো বেশি সমীচীন মনে করেছি। আর কিছু প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ এবং তা জানা দরকার বলে মনে হয়েছে। তাই পত্রিকার কলামকেই তার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। যাতে বৃহত্তর পরিসরে তা পাঠ করা যায় এবং সধারণভাবে সকলে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

উল্লেখ্য, প্রত্যেকটি চিঠি তার আপন-আপন ভাষায় উল্লেখ না করে সামষ্টিক আলোচনার অধীনে সবগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

বিবাহের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে 'ওলীমা'র অনুষ্ঠান এক বিশেষ মর্যাদা রাখে। কেননা, এটি সুন্নত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সরাসরি এর উৎসাহ দিয়েছেন। তবে মনে রাখতে হবে, এ অনুষ্ঠান ফরয বা ওয়াজিব স্তরের নয় যে, তা ছুটে গেলে বিবাহ না হওয়ার বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা আছে। তবে এটা যেহেতু সুন্নত, তাই যথাসম্ভব এ সুন্নতের অনুসরণ করা কাম্য।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ সুন্নত আদায়ের জন্য শরীআত মেহমানদের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং খানারও কোন পদ ও মান-পরিমাণ স্থির করা হয়নি। বরং প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যেই মান-পরিমাণে ইচ্ছা হয় ওলীমার অনুষ্ঠান করতে পারে। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ওলীমা করেছিলেন মাত্র দু'সের জব দিয়ে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যাঃ (রাযি.)-এর বিবাহের ওলীমা করা হয়েছিল সফর অবস্থায় এবং তা এভাবে যে, একটি দস্তরখান বিছিয়ে তাতে কিছু খেজুর, কিছু পনির ও কিছু ঘি রেখে দেওয়া হয়। ব্যস এই ছিল তার ওলীমার আয়োজন। (বুখারী-হাদীছ নং ৪৯৬৮)

অবশ্য উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনত জাহ্‌শ (রাযি.) এর বিবাহে যে ওলীমা করা হয়েছিল তাতে আপ্যায়ন করা হয়েছিল রুটি ও ছাগলের গোশত দ্বারা। (বুখারী, অধ্যায় বিবাহ, হাদীছ ৪৭৭০)

সুতরাং ওলীমা সম্পর্কে এরূপ ধারণা ঠিক নয় যে, তাতে বিপুলসংখ্যক লোক দাওয়াত দিতে হবে এবং উৎকৃষ্ট মানের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনিভাবে এ ধারনাও ভুল যে, যার সামর্থ্য নেই, তাকেও ধার-কর্জ করে হলেও উন্নত মানের ওলীমার ব্যবস্থা করতে হবে। বরং শরীআতে কাম্য কেবল এতটুকুই যে, প্রত্যেকে আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী ওলীমার অনুষ্ঠান করবে। যার সামর্থ্য কম সে তা সংক্ষিপ্ত ও সাদামাঠাভাবেই করবে আর যার সামর্থ্য বেশি, সে চাইলে বেশি মেহমানকে দাওয়াত করে তাদের জন্য উৎকৃষ্ট মানের খাবারের এন্তেজামও করতে পারে, যদি তাতে মানুষকে দেখানো ও গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্য না থাকে।

উপরিউক্ত সীমারেখার ভিতর থেকে ওলীমা করা অবশ্যই সুন্নত এবং সে হিসেবে ছওয়াবের কাজ। কাজেই এরূপ একটি বরকতপূর্ণ কাজকে মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ও গুনাহের দ্বারা পঙ্কিল করে তোলা, কাজটিকে অবমূল্যায়ন, বরং অবমাননা করারই নামান্তর। কাজেই শান-শওকত জাহির করা, সুনাম, সুখ্যাতি যাতে হয় সেদিকে মনোযোগী হওয়া, অনুষ্ঠানের ব্যতিব্যস্ততায় নামায নষ্ট করা, সাজগোজ করে আসা নর-নারীদের অবাধ মেলামেশা করা, অনুষ্ঠানের ভি.ডি.ও করা এবং এজাতীয় আরো যেসব অনুচিত কর্মকাণ্ড হয়ে

থাকে তা অবশ্যই পরিহার করা উচিত। কেননা, এসব অনাসৃষ্টি দ্বারা এ মুবারক অনুষ্ঠানটির বরকত নষ্ট করে ফেলা কিছু বুদ্ধির কাজ নয়।

ওলীমা সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা অতি ব্যাপক। বহু লোক সে কারণে পেরেশান থাকে। এক ব্যক্তি বিশেষভাবে তার সে পেরেশানির কথা উল্লেখ করত তার সমাধান জানতে চেয়েছে। ভুল ধারণাটি হল অনেকে মনে করে বর-কনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীসুলভ ঘনিষ্ঠতা না হওয়া পর্যন্ত ওলীমা করা যায় না। করলে তা সঠিক হয় না।

প্রকৃতপক্ষে বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর থেকে কনের স্বামীগৃহে গমন এবং তার পরেও যে-কোনও সময়ই ওলীমা করার অবকাশ আছে। মুস্তাহাব হল বধূকে তুলে আনার পর করা। তুলে আনা বলতে তুলে আনাই। এর বেশি কিছু নয়। অর্থাৎ কনেকে বরের বাড়িতে নিয়ে আসা ও উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হয়ে যাওয়ার পরই ওলীমা করা যাবে। এর জন্য উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীসুলভ ঘনিষ্ঠতা হওয়া শর্ত নয়। সে ঘনিষ্ঠতা না হলেও ওলীমা করতে কোন দোষ নেই এবং তাতে ওলীমা নাজায়েয হয়ে যায় না এবং একথা বলারও অবকাশ থাকে না যে, এভাবে ওলীমা করলে তাতে ওলীমা করার সুন্নত আদায় হয় না, বরং এটা নফল ওলীমারূপে গণ্য হয়। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ওলীমা তো নববধূর স্বামীগৃহে গমনের আগেও করা যায়। শুধু এতটুকু কথা যে, তা মুস্তাহাব সময়ে করা হয় না, কিন্তু ওলীমা ঠিকই হয়ে যায়, (এস্থলে দলীল-প্রমাণ উল্লেখের অবকাশ নেই। যারা দলীল-প্রমাণ জানতে আগ্রহী, তারা ইবন হাজার (রহ.) কৃত ফাতহুল-বারী, (৯ম, খন্ড, ২৩১ পৃঃ গ্রন্থে ৫১৭৭ নং হাদীছের অধীনে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা দেখে নিতে পারেন)।

আরেক ব্যক্তির প্রশ্ন ছিল, বিবাহকালে যখন কনের অনুমতি চাওয়া হয়, তখন কি তার মৌখিক অনুমতি দেওয়া জরুরি, না কাবিননামায় দস্তখত করলেই যথেষ্ট?

এ ব্যাপারে আরজ হল, আমাদের এলাকায় সাধারণ নিয়ম হল, বিবাহের মজলিসে কনে নিজে উপস্থিত থাকে না, বরং বিবাহের আগে তার পরিবারের কেউ তার সম্মতি (ইয্ন) নিয়ে আসে। কনের পক্ষ থেকে তাকে উকিল গণ্য করা হয়। কাবিননামায়ও উকিলের ঘরে তার দস্তখত নেওয়া হয়। উকিল যখন কনের ইয্ন আনতে যায়, তখন বিবাহের ইজাব-কবুল হয় না, কেবল কনের সম্মতি নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে সম্মতি গ্রহীতার কর্তব্য মেয়েকে এই কথা বলা যে, আমি অমুকের পুত্র অমুকের সাথে এত টাকা মোহরের বিনিময়ে তোমার বিবাহ সম্পন্ন করতে চাই। তুমি কি তাতে সম্মত আছ?

মেয়ে কুমারী হলে মৌখিকভাবে সম্মতি জানানো অপরিহার্য নয়; বরং প্রত্যাখ্যান না করাই যথেষ্ট। অবশ্য মুখে সম্মতি জানালে বেশি ভালো। যদি কাবিননামায় দস্তখত করে দেয়, তাও সম্মতি হয়ে যাবে। হাঁ কোন মহিলা যদি পূর্ববিবাহিতা হয়, তবে এই দ্বিতীয় বিবাহে তার মৌখিক সম্মতি জানানোই জরুরি। অন্য কোন পন্থায় তার সম্মতি জানানো যথেষ্ট হবে না।

কনের পক্ষ থেকে এভাবে সম্মতি গ্রহণের পর সম্মতি গ্রহীতা উকিল হিসেবে যিনি বিবাহ পড়াবেন, তাকে বিবাহ পড়ানোর অনুমতি দেবে। তিনি বরকে যে কথা বলেন তা হয় বিবাহের ঈজাব আর বর যে উত্তর দেয় তা হচ্ছে কবুল। এই ঈজাব ও কবুল হয়ে গেলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়।

১১ রজব ১৪ হিঃ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ খৃঃ

সূত্র : যিক্র ও ফিক্র ২৯৩ পৃষ্ঠা

তালাকের সঠিক পদ্ধতি

বিভিন্নভাবেই মুসলিম জনসাধারণের পারিবারিক কলহ, বিশেষত দাম্পত্য কলহ নিষ্পত্তির সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। দেখে দুঃখ লাগে যে, আমাদের সমাজে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা চরম আকার ধারণ করেছে। আগে ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত যেসব কথা জানত এখন বড়দেরও সে সম্পর্কে কোন খবর নেই। তাই কয়েক মাস আগে আমি এই স্বতন্ত্র কলামটি চালু করেছি এবং এতে বিবাহসংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করছি। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বিভিন্ন শিরোনামে তা প্রকাশ হচ্ছে। বিবাহের পর অনেক সময়ই তালাকের ঘটনা ঘটে, যে কারণে বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনার ধারায় তালাক সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজন বোধ করছি। সামাজিক অজ্ঞতা এখন এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তালাক সম্পর্কিত একদম প্রাথমিক মাসাইলও আম মুসলিমদের জানা নেই। ফলে তারা নানা রকম ভুল-ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

সর্বপ্রথম ভুল হল রাগের বশে তালাক দেওয়া। লোকে এখন রাগ ঝাড়ার মাধ্যম হিসেবে তালাককে বেছে নিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীতে কোন বিষয় নিয়ে মতভিন্নতা দেখা দিলে তা কেবল রাগারাগিতেই শেষ হয় না; বরং এক পর্যায়ে স্বামী উত্তেজনা বশে তালাক শব্দ উচ্চারণ করে ফেলে। অথচ 'তালাক' তো কোন গালি নয় যে, তা শুনিয়ে দিয়ে মনের ঝাল মেটানো হবে। বরং এটা তো বৈবাহিক সম্পর্ক চুকানোর চরম ব্যবস্থা, যার পরিণাম অতি কঠিন। এর দ্বারা কেবল দাম্পত্য সম্পর্কেরই ইতি ঘটে না; বরং পারিবারিক জীবনে বহু সংকট খাড়া হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জন্য পর হয়ে যায়। সন্তানদের লালন-পালনের ব্যবস্থা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। সম্পদ বন্টনে জটিলতা দেখা দেয়। মোহর, খোরপোষ ও ইদ্দত পালনের উপর তার প্রভাব পড়ে। মোটকথা, কেবল স্বামী-স্ত্রীই নয় বরং সন্তান-সন্ততি পরিবারের সদস্যবর্গ ও খান্দানের অন্যান্য লোকজন পর্যন্ত এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়।

এ কারণেই ইসলাম তালাকের অনুমতি দিলেও একে 'আবগাযুল-মুবাহাত' বা ঘৃণ্যতম বৈধকাজ সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ বৈধ কাজ সমূহের মধ্যে তালাক এমন এক কাজ, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি অপসন্দ। খৃষ্টধর্মে তো তালাকের কোন সুযোগই ছিল না। একবার দুই নারী-পুরুষ পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে সে বন্ধন এমন স্থায়ী হয়ে যেত যে, তা ছিন্ন করার কোন পথ খোলা ছিল না। বাইবেলে তালাককে ব্যভিচারতুল্য বলা হয়েছে।

ইসলাম যেহেতু স্বভাবধর্ম, তাই তালাক সম্পর্কে তার অবস্থান এতটা কঠোর নয়। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর জীবনে কোনও কোনও সময় এমন কঠিন একটা পর্যায় এসে পড়ে, যখন সৌজন্যের সাথে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এ পর্যায়ে ধামাচাপা দিয়ে বিবাহকে টিকিয়ে রাখার অর্থ তাদের জীবনকে দুর্বিবহ শাস্তিতে নিক্ষেপ করা (এ কারণেই খৃষ্টধর্ম তালাকের ক্ষেত্রে তার পুরানো অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ, যা বর্ণনার সুযোগ এখানে নেই) তাই ইসলাম তালাককে নাজায়েয ও হারাম সাব্যস্ত করেনি এবং তার জন্য এমন কঠোর ও কঠিন কারণও নির্দিষ্ট করে দেয়নি, যদ্দরুন বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে তাদেরকে হাত-পা বাধা নিরুপায় মনে করা যাবে।

এক দিকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন, বৈধ কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা অপসন্দ হল তালাক। (আবূ দাউদ, হাদীছ ১৮৬৩; ইবন মাজাহ হাদীছ ২০০৮)

অন্য দিকে স্বামী-স্ত্রীকে এমন উপদেশ ও পথনির্দেশ করা হয়েছে, যা মেনে চললে তালাকের ঘটনা ঘটবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে।

তৃতীয়ত পরিস্থিতি যখন তালাক পর্যন্ত গড়াবে তখন তালাকের জন্য এমন পন্থা শেখানো হয়েছে, যা অনুসরণ করলে ক্ষতির মাত্রা হবে অনেক কম। আজ এসব শিক্ষার বহুল প্রচার ও আন্তরিকতার সাথে তার অনুসরণ করা অতীব প্রয়োজন। তা করলে ইনশাআল্লাহ পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনের বহু সমস্যার আপনা আপনিই সমাধান হয়ে যাবে।

তালাকের দুয়ার বন্ধ করার জন্য যে সব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম নির্দেশনা হল স্ত্রীর পক্ষ হতে অপসন্দীয় কিছু ঘটলে স্বামীর করণীয় সম্পর্কে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স্ত্রীর কোন বিষয় যদি স্বামীর অপসন্দ হয়, তবে সে যেন তার ভালো দিকগুলোর প্রতি লক্ষ করে। বোঝানো উদ্দেশ্য, দুনিয়ায় সম্পূর্ণ

নির্দোষ কোন মানুষ নেই। কারও মধ্যে যদি একটা দোষ থাকে, তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে তার গুণ আছে দশটা। সে ক্ষেত্রে দশটা গুণ সম্পর্কে চোখ বন্ধ রেখে একটা দোষ নিয়ে লেগে পড়া কত বড়ই না অবিচার। এরূপ পন্থা অবলম্বন করলে কখনও কোন সমস্যার সমাধান হওয়ার নয়। কুরআন মাজীদ তো এ পর্যন্ত ইরশাদ করেছে যে,

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

'তোমারা যদি তাদেরকে অপসন্দ কর, তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিসকে অপসন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (সূরা নিসা : ১৯)

কুরআন মাজীদ দ্বিতীয় নির্দেশনা দিয়েছে এই যে, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে যদি নিজেদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে না পারে এবং কোমল-কঠোর সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও বিরোধের কোন সুরাহা না হয়, তবে তালাকের জন্য ব্যস্ত না হয়ে বরং তারা আপন-আপন খান্দান থেকে একজন করে সালিশ নিযুক্ত করবে। উভয় সালিশ বিচক্ষণতার সাথে সব কিছু খতিয়ে দেখবে এবং আপস-রফার কোন উপয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। আল্লহ তা'আলা এ ব্যাপারে আশ্বাসবাণী শোনান-

إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا'

তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকুল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা নিসা : ৩৫)

যদি সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং পরিশেষে তালাকেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হুকুম হল, স্বামী তালাক দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করবে। উপযুক্ত সময় বলতে কী বোঝায়? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাখ্যা দান করেন যে, স্ত্রী যখন পাক-পবিত্র থাকে, তখন তালাক দেবে অর্থাৎ স্ত্রীর মাসিককাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর যতক্ষণ স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ঘনিষ্ঠ না হবে, ততক্ষণই হল তালাকের উপযুক্ত সময়। সুতরাং স্ত্রীর ঋতুকালে তালাক দেওয়া শরীআতের দৃষ্টিতে একটি গুনাহের কাজ (যদিও তালাক হয়ে যাবে)। এমনিভাবে ঋতু শেষ হওয়ার পর যদি তাদের আনন্দ-মিলনও ঘটে যায়, তখনও তালাক দেওয়া নিষেধ। এরূপ ক্ষেত্রে তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীকে পরবর্তী মাসের অপেক্ষা করতে হবে।

এ পন্থার উপকারিতা তো বহু। তন্মধ্যে এক বিশেষ উপকার এইও যে, এর ফলে কোন সাময়িক উত্তেজনা বা কলহের পরিণতিতে তালাক দেওয়ার সুযোগ থাকবে না। এর আরেক সুবিধা হল, উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকলে সেই অবকাশে স্বামী গোটা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করতে পারবে এবং বিবাহ যেমন চিন্তা ভাবনা করেই করেছিল, তেমনি তালাকও সে ভেবে চিন্তেই দিতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে, অপেক্ষার সেই অবকাশে উভয়ের মত বদলে যাবে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং তালাকের আর প্রয়োজন পড়বে না।

অতঃপর উপযুক্ত সময় আসার পরও যদি তালাকের সিদ্ধান্ত বহাল থাকে, তবে তালাক দেওয়ার জন্য শরীআত সঠিক যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে তা এরকম, প্রথমে স্বামী মাত্র এক তালাক দেবে এবং ক্ষান্ত হয়ে যাবে। এতে এক রজ'ঈ তালাক হবে। এভাবে এক তালাকের পর যখন ইদ্দত শেষ হবে, তখন সৌজন্যের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক আপনা-আপনি ছিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর উভয়ে নিজ-নিজ ভবিষ্যত সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

এ পদ্ধতির একটা সুবিধা হল, তালাক দেওয়ার পর স্বামী যদি মনে করে, তার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি এবং এখন অবস্থা ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তবে ইদ্দতের ভেতর সে নিজ প্রদত্ত তালাক প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। এর জন্য মুখে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমি তালাক প্রত্যাহার করে নিলাম। এর ফলে বৈবাহিক সম্বন্ধ আপনিই পুনঃস্থাপিত হয়ে যাবে। এমনকি যদি ইদ্দত শেষও হয়ে যায়, তারপর স্বামী-স্ত্রী যদি মনে করে তাদের শিক্ষা হয়ে গেছে এবং এখন থেকে তারা আরও সহনশীলতা ও আপস-রফার সাথে জীবন যাপন করবে, তবে তাদের জন্য সে পথও খোলা আছে। তারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এর জন্য নতুন মোহরে সাক্ষীদের সামনে ঈজাব, কবুল হওয়া জরুরি।

উপরিউক্ত সুযোগ গ্রহণ করত তারা যদি নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পুনরায় দাম্পত্যজীবন শুরু করে দেয়, তারপর কোন কারণে তাদের মধ্যে আবারও কলহ দেখা দেয়, তবে এ ক্ষেত্রেও আগের মতই তাড়াহুড়ো করে তালাকের পথে অগ্রসর না হয়ে বরং উপরে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং স্বামী তালাক দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে, তখনও এক তালাকই দেবে। এতে মোট দুই তালাক হয়ে যাবে। তারপরও মামলা স্বামী-স্ত্রীর হাতেই থেকে

যাবে। অর্থাৎ ইদ্দতের ভিতর স্বামী চাইলে তালাক প্রত্যাহার করে নিতে পারবে এবং ইদ্দতের পর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারবে।

এই হল কুরআন-হাদীছে বর্ণিত তালাকের পদ্ধতি। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, বিবাহ বহাল রাখা ও বিচ্ছেদ হতে তাকে রক্ষার জন্য শরীআত বিভিন্ন ধাপে তার কত রকম পথ খোলা রেখেছে।

হ্যাঁ: কেউ যদি সবগুলো ধাপ অতিক্রম করে যায় এবং তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে এরপর আর কিছু করার থাকে না। বিবাহ তালাক তো কানামাছি খেলা নয় যে, অনন্তকাল তালাক-বিবাহের খেল খেলতে থাকবে। সুতরাং তৃতীয় তালাকের পর শরীআতের বিধান হল, তাদের মধ্যে পুনর্মিলনের পথ চিরতরে বন্ধ। এখন আর পুনঃবিবাহের কোন সুযোগ নেই। স্বামী তালাক প্রত্যাহারও করতে পারবে না এবং তারা পারস্পরিক সম্মতিতে ফের বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হতে পরবে না। এখন তারা স্থায়ীভাবে পৃথক হয়ে যেতে বাধ্য।

আমাদের সমাজে তালাক সম্পর্কে যে সব মারাত্মক ভুল ধারণা আছে, তার একটি হল, তিন তালাকের কম তালাককে মানুষ তালাকই মনে করে না। মনে করা হয়, তালাক শব্দটি এক-দু'বার বললে বা লিখলে তাতে তালাকই হয় না। সুতরাং তালাক দেওয়ার সময় তিন তালাকের নিচে থামাই হয় না। সর্বনিম্ন তিনবার তালাক উচ্চারণকে জরুরি ভাবা হয়।

অথচ উপরে লেখা হয়েছে যে, মাত্র একবার তালাক দিলেও তাতে তালাক হয়ে যায়। বরং শরীআতের দৃষ্টিতে তালাকের সঠিক ও উত্তম নিয়ম এটাই যে, তালাক শব্দ মাত্র একবার বলা বা লেখা হবে। তারপর বুঝে-শুনে পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্ক নবায়ন করার ইচ্ছা হলে কারও মতেই তার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় না।

কিন্তু একত্রে তিন তালাক দেওয়া এক তো গুনাহ, সেই সংগে হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী চারও মাযহাব অনুযায়ী সে গুনাহের এক নগদ শাস্তি হল পুনঃবিবাহের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তিন তালাক দেওয়ার পর স্বামী যদি প্রত্যাহার করতে চায় বা পুনরায় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যায়, সে সুযোগ আর বাকি থাকে না। ফলে এ চার মাযহাবের অনুসারী কেউ তিন তালাক দিয়ে ফেললে তাকে কঠিন জটিলতার সম্মুখিন হতে হয়।

সুতরাং তালাক সম্পর্কে সর্বপ্রথম এক তালাক দিলে তাতে তালাক হয় না'- এই ভুল ধারণার নিরসন করতে হবে। মনুষকে বোঝাতে হবে যে,

এটাই তালাকের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট নিয়ম। তালাক শব্দ উচ্চারণ করতে হবে মাত্র একবার। তার বেশি নয়। স্বামীর যদি ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করার অধিকার বাতিল করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে এক তালাক বায়েন দিয়ে দেবে। অর্থাৎ তালাকের সাথে 'বায়েন' শব্দ যুক্ত করবে। এভাবে তালাক দেওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্যও তা প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। হ্যাঁ, স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে চাইলে ফের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এক তালাকই যে সর্বোত্তম তালাক এটি গোটা উম্মতের সর্ববাদী সম্মত রায়। এতে কোন দ্বিমত নেই। উলামায়ে কিরামের উচিত বয়ান ও খুতবায় বিষয়টি তুলে ধরা এবং অন্যসব প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করেও তালাকের এসব বিধান সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

৫ মুহার্‌রাম ১৪১৭ হি
২৩ মে ১৯৯৬ খৃঃ
সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ৩১৯ পৃষ্ঠা

ইহ্‌সান ও দাম্পত্য জীবন

ইহ্‌সান-এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে করা। মূলত এটি কুরআন-হাদীছের একটি পরিভাষা। হাদীছে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ রকম– আল্লাহ তাআলার ইবাদত এই ধ্যানের সাথে করা যে, আমি তাঁকে দেখছি। আর ধ্যানের এই স্তরে পৌছতে না পারলে অন্ততপক্ষে এই ধ্যান করা যে, তিনি আমাকে দেখছেন। বলাবাহুল্য যে, কোন কাজে এই ধ্যান থাকলে সে কাজ অত্যন্ত নিখুঁত হবে। এরূপ ধ্যান যার আছে তার দ্বারা আল্লাহ ও বান্দার কোন হক বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না। একবার এক ব্যক্তি হযরত ডা. মুহাম্মাদ আব্দুল হাই 'আরিফী (রহ.) এর কাছে এসে বলল, আলহামদুলিল্লাহ 'ইহ্‌সান'-এর স্তর আমার অর্জিত হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, হযরত ডা. 'আরেফী (রহ.) আমাদের এ যুগের এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি জীবনভর সুনাম, সুখ্যাতি ও পাবলিসিটি থেকে দূরে থেকে নিভৃতচারী হয়ে দিন গুজরান করেছেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র ও কীর্তির সুরভি আপনিই চৌদিকে বিস্তৃত হয়ে মানুষের মন দিল আমোদিত করেছে ও করে যাচ্ছে। তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশারাফ আলী থানভী (রহ.)-এর হাতে গড়া তাঁর এক বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। ফলে আত্মশুদ্ধি প্রয়াসী মানুষ নিজেদের আমল-আখলাক সংশোধনের লক্ষে তার কাছে আসা-যাওয়া করত এবং তাঁর পরামর্শ ও পথনির্দেশ দ্বারা নিজেদের ধন্য করে তুলত। উপরিউক্ত ব্যক্তিও ছিলেন তাদের একজন। তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন, ইবাদত আদায়কালে আল-হামদুলিল্লাহ হাদীছে যাকে 'ইহ্‌সান' বলা হয়েছে, সেই ধ্যান আমার অর্জিত হয়ে গেছে। হযরত ডা. 'আরেফী (রহ.) তাঁর কথার জবাবে তাকে মুবারকবাদ জানালেন এবং বললেন, বাস্তবিকই ইহ্‌সান অতিবড় এক নিআমত। এ নিআমত অর্জিত হলে শুকর আদায় করা উচিত। তবে আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, ইহসানের এ স্তর কি আপনার কেবল নামাযেই অর্জিত হয়েছে, না স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আচরনেও? অর্থাৎ তাদের সাথে যখন কোন আচরণ করেন তখনও কি আপনার অন্তরে এ ধ্যান থাকে যে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছি কিংবা অন্ততপক্ষে তিনি তো আমাকে দেখছেনই? একথা শুনে সেই ব্যক্তি বলল, আমরা তো এ

যাবৎকাল এ কথাই শুনে এসেছি যে, ইহসানের সম্পর্ক কেবল নামায ও অন্যান্য ইবাদতের সাথে। তাই আমি নামাযেই এর অনুশীলন করেছি এবং আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে নামাযের ক্ষেত্রে এ অনুশীলনের সুফল পেয়েছি। কিন্তু নামাযের বাইরে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কখনও ইহসান চর্চার চিন্তা মাথায় আসেনি।

হযরত ডা.'আরেফী (রহ.) বললেন, এই ভুল ধারণা দূর করার লক্ষ্যেই আমি আপনাকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। সন্দেহ নেই, নামায ও অন্যান্য ইবাদতে এ ধ্যান কাম্য যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। কিন্তু এ ধ্যানের প্রয়োজন কেবল নামাযের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জীবনের সব কাজেই এর প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের সাথে মিলেমিশে জীবন যাপন করতে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন কাজকর্ম, লেনদেন, আচার-আচরণ ইত্যাদিতেও এই ধ্যান থাকা চাই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তো এর প্রয়োজন অনেক বেশি। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক হল সার্বক্ষণিকের। তারা একে অন্যের প্রতি পলের সাথী। তাদের সম্পর্ক নানা চড়াই-উতরাই বেয়ে এগিয়ে চলে। অপ্রীতিকর অনেক কিছুই ঘটে যায়। সেরকম পরিস্থিতিতে মানবমন অন্যায়-অবিচার করতে উসকানি দেয়। ঠিক তখনই এই ধ্যানের বড় প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্তরে এ রকম অনুভূতি জাগ্রত না হলে সে উসকানির সামনে মানুষ পরাভব স্বীকার করে ফেলে। ফলে তার দ্বারা অন্যায় আচরণ হয়ে যায় এবং সংগীর অধিকার হরণের অপরাধে সে অপরাধী হয়ে যায়।

তারপর হযরত 'আরেফী (রহ.) ইরশাদ করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবনে কখনও নিজ স্ত্রীদের প্রতি কুপিত আচরণ করেননি এবং তাদের সাথে দেমাগ-দাপটের ভাব দেখাননি। তাঁর এ সুন্নতের অনুসরণ করার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি। ঘরের লোকদের উপর যাতে গোস্বা না করে বসি, সেজন্য নিয়মিত সাধনা করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার শুকর, আমার দাম্পত্য জীবনের একান্ন বছর গত হয়েছে, কিন্তু আল হামদুলিল্লাহ এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর স্ত্রীর সাথে কখনও রাগত স্বরে কথা বলিনি।

পরবর্তীকালে হযরত 'আরেফী (রহ.) এর মুহতারামা স্ত্রী নিজেই একবার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, গোটা দাম্পত্য জীবনে আমার মনে পড়ে না, তিনি কখনও আমার সাথে অপ্রীতিকর আওয়াজে কথা বলেছেন। এমনও স্মরণ হয় না যে, তিনি সরাসরি নিজের কোন কাজের জন্য আমাকে হুকুম

করেছেন। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কাজ করে দেওয়ার চেষ্টা করতাম; কিন্তু তিনি নিজে কখনও আমাকে করতে বলতেন না।

হযরত 'আরেফী (রহ.)-এর এসব কথা আজ আমার বিশেষভাবে স্মরণ হওয়ার কারণ, গেল সপ্তাহে বিবাহের খুতবা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম, আনন্দময় ও সুখের দাম্পত্যজীবন গড়তে হলে তাক্ওয়া অবলম্বন করা চাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অন্তরে তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতি না থাকলে যত চেষ্টাই করা হোক তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কোনও দিনই মাধুর্যপূর্ণ হবে না। হযরত 'আরেফী (রহ.)-এর উপরিউক্ত আমল ও চরিত্র ছিল মূলত তাঁর অন্তরস্থ তাক্ওয়ারই বহিঃপ্রকাশ এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীর বাস্তব নমুনা যে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক সে, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।

(তিরমিযী, হাদীছ ৩৮৩; ইবনে মাজাঃ হাদীছ ১৯৬৭ : দারিমী, হাদীছ ২১৬০ .)

লোকে বুযুর্গানে দ্বীনের কারামত খোঁজে। আমি তো বলব হযরত 'আরেফী (রহ.) এর উপরিউক্ত কর্মপন্থা বাতাসে উড়ে যাওয়া ও পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলা অপেক্ষা হাজারও গুণ শ্রেষ্ঠ কারামত।

সন্দেহ নেই, কুরআন মাজীদ পুরুষদেরকে নারীদের তত্ত্বাবধায়ক সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু তার অর্থ কী, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ আচরণ দ্বারা তা পরিস্কার করে দিয়েছেন। আমরা তা দ্বারা জানতে পারি যে, তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার অর্থ এ নয় যে, পুরুষ সর্বদা নারীর উপর কর্তৃত্বপরায়ণতা দেখাবে, স্ত্রীর সাথে দাসীসুলভ ব্যবহার করবে বা তাকে নিজ আধিপত্যের যাঁতাকলে পিষ্ট করে রাখবে। কুরআন মাজীদেরই এক আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ককে সখ্য ও রহমত হিসেবে ব্যক্ত করেছে।

ইরশাদ হয়েছে,

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও দয়া সঞ্চার করেছেন। (রূমঃ ২১)

উল্লিখিত আয়াতেরই শুরুর দিকে জানানো হয়েছে, স্ত্রী হল স্বামীর প্রশান্তি লাভের উপায়। সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত সম্পর্ক হল সখ্য ও প্রীতির সম্পর্ক এবং তারা উভয়ে একে অন্যের স্বস্তি ও প্রশান্তির মাধ্যম। তবে এটাও ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যে, সমষ্টিগত কাজে যেন একজনকে নেতা বানিয়ে নেওয়া হয়, যাতে সে কাজ শৃঙ্খলার সাথে অনজাম দেওয়া যায়। এমনকি দু'জন লোক যদি কোন সফরে যায়, তখনও তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নিতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাতে তারা দু'জন পরস্পর

বন্ধুই হোক না কেন। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, যাকে আমীর ও নেতা বানানো হবে, সে সর্বক্ষণ অন্যদের উপর হুকুম চালাবে। বরং তাকে আমীর বানানো হয়েছে সফরের প্রয়োজনাদি আনজাম দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। তার কাজ সফরসংগীদের খোঁজখবর রাখা এবং এমন ব্যবস্থাপনা করা, যাতে সকলের আরাম হয় এবং তারা স্বস্তিতে থাকতে পারে। সে যখন এ দায়িত্ব পালন করবে তখন অন্যদের কর্তব্য এসব ব্যাপারে তার আনুগত্য ও সহযোগিতা করা ।

ইসলাম যখন মামুলি এক সফরের জন্যও আমীর নিয়োগের শিক্ষা দিয়েছে ও সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যদেরকে তার আনুগত্য ও সহযোগিতার হুকুম দিয়েছে, তখন জীবনের সুদীর্ঘ সফরে তার এরূপ শিক্ষা থাকবে না কেন? সুতরাং স্বামী-স্ত্রী যখন তাদের সম্মিলিত জীবনের সফর শুরু করতে যাচ্ছে, তখন স্বামীকে তার আমীর ও তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা, এ সফরের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য যে শারীরিক শক্তি ও অন্যান্য গুণাবলীর দরকার তা সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের মধ্যে বেশি পরিমাণে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। বস্তুত এটা একটা ব্যবস্থাপনা, যা দাম্পত্য জীবনের শৃঙ্খলাবিধানের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই বলে এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর যে মূল সখ্য ও প্রীতির সম্পর্ক তা ম্লান হয়ে যায়নি। কাজেই তাদের কারও এ অধিকার নেই যে, অন্যের সাথে চাকর বা চাকরানীসুলভ আচরণ করবে বা স্বামী নিজ কর্তৃত্বের দাবিতে মনে করবে স্ত্রীকে তার হুকুম পালনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে আর সেই সুবাদে সে নিজের বৈধাবৈধ সব রকম ইচ্ছা তার উপর চাপিয়ে দেবে। বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে যে শক্তি ও অন্যান্য গুণাবলী দিয়েছেন, তার দাবি হল, নিজ পদমর্যাদার বৈধ সীমারেখার মধ্যে থেকে সে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে এবং তার বৈধ চাহিদাসমূহ যথাসাধ্য পূরণ করবে।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে যেসব অধিকার দিয়েছেন, তার দাবি হল, সে আল্লাহরপ্রদত্ত যোগ্যতাসমূহকে তার জীবনসঙ্গীকে খুশী রাখা ও তাকে সহযোগিতা দানের কাজে ব্যয় করবে। তারা উভয়ে এ নীতিতে চললে তাদের ঘরখানি তাদের পক্ষে দুনিয়ার জান্নাতে পরিণত হয়ে যাবে এবং সবচে' বড় কথা, তাদের এ কর্মপন্থা এক স্বতন্ত্র ইবাদতের মর্যাদা লাভ করবে। ফলে তা তাদের আখিরাতের আসল জান্নাত লাভের অছিলা হয়ে যাবে। এজন্যই বিবাহের খুতবায় উভয়কে তাকওয়া অবলম্বনের হুকুম দেওয়া হওয়ছে। আর এজন্যই হযরত 'আরেফী' (রহ.) বলেছেন ' ইহসান এর চর্চা কেবল নামাযের মধ্যেই নয়; বরং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচার-আচরণের মধ্যেও করা জরুরি ।

কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতের মধ্য হতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাকওয়ার সাথে সম্পৃক্ত তিনটি আয়াতকে বিবাহের খুত্বায় বেছে নিয়েছেন, সে তো এমনিই নয়। নিশ্চয়ই তার বড় কোন তাৎপর্য আছে। এ তিনও আয়াতের সাধারণ নির্দেশ হল, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অবলম্বন সম্পর্কে। এরই আদেশ দ্বারা তিনওটি আয়াত শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। কোনও অবচীন বলতে পারে, বিয়ের সাথে তাকওয়ার কী সম্পর্ক? কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবেশ-পরিস্থিতির চড়াই-উৎরাই এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের নাজুকতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, দাম্পত্য জীবনের গভীরতায় পৌঁছার অভিজ্ঞতা যার আছে, সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে মধুময় করার এবং তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তাকওয়ার কোন বিকল্প নেই।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খুবই নাজুক। তাদের প্রত্যেকের অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনা এবং প্রত্যেকের স্বভাব-প্রকৃতি অন্যের সামনে যেভাবে উন্মোচিত হয়, অতটা অন্য কারও সামনে হয় না। যে কেউ তার ভেতরের বদ খাসলত মুখের হাসি ও ভাব-ভংগীর বহিরাবরণ দ্বারা অন্যের থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে, সে তার ভেতরের মানুষটিকে চমৎকার ভাষা ও কৃত্রিম ভদ্রতার কারুকার্য দিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর কাছে সে কারুকার্য খুব টেকসই হয় না। নিত্যদিনের মেলামেশায় তা আস্তে আস্তে খসে পড়ে এবং এক পর্যায়ে বাইরের খোলশ থেকে আসল বস্তুটি বের হয়েই যায়। ভেতরের মানুষটি তাকওয়ার গুণে ভূষিত না থাকলে জীবনসংগীর বাঁচন দায় হয়ে যায়। স্বামীর পক্ষ হতে একজন স্ত্রীকে যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় আদালতের মাধ্যমে তার অবসান ঘটানো সর্বদা সম্ভব হয় না। এমন বহু যাতনা আছে, যা আদালত তো দূরের কথা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছেও তা প্রকাশ করা যায় না। এমনিভাবে স্ত্রী সম্পর্কে একজন স্বামীর যেসব অভিযোগ থাকে অনেক সময়ই তার নিজের কাছে তার কোন সমাধান থাকে না। আবার অন্য কারও মাধ্যমেও তার প্রতিকার করানোর সুযোগ থাকে না। এ জাতীয় কষ্ট ও অভিযোগের বাস্তবসম্মত দাওয়াই যোগানো দুনিয়ার কোন শক্তির পক্ষেই সম্ভব হয় না। তার দাওয়াই কেবল তাকওয়া। উভয়ের অন্তরে যদি তাকওয়া থাকে, প্রত্যেকের অন্তরে যদি এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে, তারা একে অন্যের জন্য আমানত, এ আমানতের জবাবদিহি তাদেরকে একদিন আল্লাহর আদালতে করতেই হবে, জীবনসংগীকে দুঃখ দিয়ে পার্থিব জবাবদিহিতা থেকে বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু একদিন তাকে আল্লাহর সামনে

দাঁড়াতেই হবে, সেদিন তাকে জবাব দিতেই হবে। সে দিন তাকে এই দুঃখদান ও অধিকার হরণের পরিণাম তাকে ভোগ করতে হবে। এই অনুভূতিরই নাম তাকওয়া। এটাই সে জিনিস, যা নিবিড় গোপনেও মানুষের অন্তরে পাহারাদারি করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাম্পত্যজীবনের সূচনাতেই মানুষ যাতে নিজেদের অন্তরে এই প্রহরীকে বসিয়ে নেয় সে উৎসাহই দান করেছেন, যাতে তাদের সখ্য-ভালোবাসা স্থায়ী হয়ে যায় এবং তা সাময়িক মোহ ও ক্ষণিকের ভাবাবেগে পর্যবসিত না হয়, যা নতুন জীবনের উন্মাদনা ঘুচতে না ঘুচতেই হাওয়ায় মিশে যায়; বরং তা তাকওয়ার ছায়ায় প্রতিপালিত হয়ে স্থায়ী মহব্বতরূপে পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে, যা স্বার্থপরতার কলুষ হতে মুক্ত থেকে পারস্পরিক হিতৈষণা, বিশ্বস্ততা ও ত্যাগের সুষমায় স্নাত হয়ে চির বসন্তের স্নিগ্ধতায় সজীব হয়ে থাকে এবং যা দৈহিক স্থূলতা ভেদ করে হৃদয়-মনের গভীরে গিয়ে ঠাঁই নেয়। এরই জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহের খুতবায় বিশেষভাবে এ তিনটি আয়াত বেছে নিয়েছেন, যার প্রত্যেকটির শুরুর কথা হল তাকওয়া এবং তাকওয়াই তার মূল বার্তা।

২৫ রজব ১৪১৬ হিঃ
১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫ খৃঃ

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ৩০২ পৃষ্ঠা

শরী'আতের আলোকে স্ত্রীর অধিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (سورة النساء : ١٩)

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (سورة النساء : ١٢٩)

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهٗ كَسَرْتَهٗ وَاِنْ تَرَكْتَهٗ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ

অর্থ : তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনে যাপন করবে। (সূরা নিসা : ১৯)

তোমার যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না। তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখ না; যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নিসা :১২৯)

হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নারীদের প্রতি ভালো আচরণের উপদেশ গ্রহণ কর। নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় দ্বারা। আর পাঁজরের উপরের হাড়ই সর্বাপেক্ষা বেশি বাঁকা। তুমি যদি সেটি

সোজা করতে চাও, তবে সেটি ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তবে সর্বদা বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের প্রতি ভালো ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর।

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৭৮৭; মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৭১; তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৮৩; ইবন মাজাহ্ হাদীছ নং ১৮৪১;)

হুকূকুল ইবাদের গুরুত্ব

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীছের উল্লেখপূর্বক ইমাম নববী রহ. রিয়াযুস সালিহীন গ্রন্থে (পরিচ্ছেদ নং ৩০) 'হুকূকুল 'ইবাদ' (বান্দার হক) সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বান্দাদের যে সব হক আবশ্যক করেছেন এবং যা আদায়ে যত্নবান থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, এখান থেকে তার আলোচনা শুরু হয়েছে। আগেও আমি বারবার বলেছি, 'হুকূকুল-'ইবাদ' দ্বীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, হুকূকুল্লাহর মত কেবল তাওবা-ইস্তিগফার দ্বারা তা মাফ হয়ে যায় না। অর্থাৎ বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার যে সকল হক আছে, তাতে কোনও রকম ত্রুটি হয়ে গেলে তার প্রতিকার সহজ। যে কোনও সময় সে কারণে অন্তরে যদি অনুতাপ দেখা দেয়, তবে আল্লাহ তা'আলার কাছে খাঁটিমনে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে। তিনি নিজ মেহেরবানীতে তা ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু হুকূকুল-ইবাদের ব্যাপারটা এত সহজ নয়। তাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে সেজন্য যতই অনুতপ্ত হোক এবং যতই তাওবা-ইসতিগফার করুক তা মাফ হবে না - গুনাহ থেকেই যাবে। সে গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য জরুরি হল বান্দার হক যথাযথভাবে আদায় করে দেওয়া বা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়া। সুতরাং হুকূকুল ইবাদের বিষয়টা খুবই কঠিন। কোনও অবস্থায়ই একে খাটো করে দেখা উচিত নয়।

আমরা গীবতকে গুনাহ মনে করি না

আফসোসের কথা, হুকূকুল-ইবাদের বিষয়টা এত কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সমাজে এ ব্যাপারে উদাসীনতা অতি ব্যাপক। আমরা নির্দিষ্ট কিছু ইবাদতের মধ্যেই দ্বীনকে সীমিত করে ফেলেছি। মনে করছি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকর, তিলাওয়াত, তাসবীহ ইত্যাদিকেই দ্বীন বলে। এগুলো করতে পারলেই দ্বীন পূর্ণ হয়ে গেল। আমরা হুকূকুল-ইবাদকে দ্বীন থেকে খারিজ করে দিয়েছি। সামাজিক দায়-দায়িত্বকেও দ্বীনের অংশ মনে করি না। এতে

কারও ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে সে জন্য তার কোন পেরেশানি হয় না এবং সে ত্রুটির অনুভূতি পর্যন্ত তার অন্তরে থাকে না।

গীবত হুকূকুল-ইবাদ নষ্ট করারই নামান্তর

এর একটা অতি সহজ উদাহরণ এই দেওয়া যেতে পারে যে, কোন মুসলিম (আল্লাহ না করুন) মদ পানের নেশায় আক্রান্ত হলে দ্বীনের সাথে যে মুসলিমের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক আছে, সেও তাকে খারাপ মনে করবে। সে নিজেও এ কাজের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং নিজেকে একজন গুনাহগার গণ্য করবে পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গীবত করে, সমাজচোখে সে কিন্তু মদ্যপায়ীর সমান গুনাহগার হিসেবে গণ্য হয় না এবং সে নিজেও নিজেকে একজন অপরাধী ও গুনাহগার হিসেবে ভাবে না। অথচ গোনাহ হিসেবে মদপান করাটা যে পর্যায়ের, গীবত করাটা তারচে' কম কিছু নয়ঃ বরং হুকূকুল-ইবাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে মদপান অপেক্ষা গীবত করাটা বেশি কঠিন। তা ছাড়া কুরআন মাজীদে গীবত করাকে এমন এক ন্যাক্কারজনক কাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার সাথে অন্য কোন গুনাহকে তুলনা করা হয়নি। সুতরাং আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

'তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তাকে ঘৃণ্যই মনে কর'। (সূরা হুজুরাত : ১২)

অর্থাৎ গীবতকারী ব্যক্তি যেন মরা ভাইয়ের গোশত খায়।

এতটা গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও এ গুনাহ সমাজের সর্বস্তরে ছেয়ে গেছে। এমন মজলিস কদাচ পাওয়া যাবে, যেখানে কারও কোনও গীবত করা হয় না। পরন্তু এটাকে গুনাহও মনে করা হয় না। যেন দ্বীনের সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

ইহসান সর্বাবস্থায় কাম্য

আমার শায়খ হযরত ডাক্তার মুহাম্মাদ আব্দুল হাই 'আরেফী (রহ.) একদিন বলছিলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বেশ গর্বভরে তার আনন্দ প্রকাশ করছিল। বলছিল, আল্লাহর শোকর যে, ইহসানের গুণ আমার অর্জিত হয়ে গেছে। বস্তুত ইহসান উচ্চস্তরের একটি গুণ ও অবস্থার নাম। এ সম্পর্কে পবিত্র হাদীছে ইরশাদ হয়েছে।

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখছ আর এটা সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে এই ভাবনার সাথে ইবাদত করবে যে, তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন'।

(বুখারী ঈমান অধ্যায়, হাদীছ নং ৪৮; মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, হাদীছ নং ৯)

হাদীছে বর্ণিত এ অবস্থাকেই 'ইহসান' এর অবস্থা বলে।

আগন্তুক বলেছিল, ইহসান এর স্তর আমার অর্জিত হয়ে গেছে। হযরত ডাক্তার ছাহেব (রহ.) বলেন, আমি তাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বললাম, এটা অনেক বড় নিয়ামত। তবে আপনাকে আমার জিজ্ঞাসা হল, আপনার এ অবস্থা কি কেবল নামাযেই হয়, না অন্যসব ক্ষেত্রেও, যেমন স্ত্রী সন্তানদের প্রতি আচার-আচরণেও কি আপনার অন্তরে এ অবস্থা জাগ্রত থাকে? না থাকে না? অর্থাৎ তাদের সাথে সম্পৃক্ত কার্যাবলীর সময় আপনার অন্তরে এই ধ্যান থাকে কি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন? না তখন এ চিন্তা জাগে না? লোকটি বলল, হাদীছে তো একথা বলা হয়েছে ইবাদতের ব্যাপারে অর্থাৎ ইবাদত এমনভাবে করা চাই, যেন আমি আল্লাহকে দেখছি কিংবা তিনি আমাকে দেখছেন। সুতরাং আমি মনে করছিলাম, 'ইহসানের সম্পর্ক কেবল ইবাদতের সাথে' নামাযের সাথে। অন্যান্য কাজ কর্মের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

হযরত ডাক্তার ছাহেব (রহ.) বললেন, আমি এজন্যই আপনাকে ওকথা জিজ্ঞেস করেছি। আজকাল মানুষ সাধারণভাবে এই ভুল ধারণার শিকার যে, তারা মনে করে, ইহসান কেবল নামাযেই কাম্য। যিকর, তিলাওয়াত ইত্যাদিতেই এ অবস্থা থাকা উচিত। অথচ এটা কাম্য সর্বাবস্থায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি শাখায় এটা বাঞ্ছনীয়। দোকানে বসে বেচাকেনা করছ, তো সেখানেও মনে এ ভাব বজায় রাখতে হবে। চিন্তা করতে হবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। অধীনস্তদের সাথে আচার-ব্যবহারের সময়ও চিন্তা করতে হবে, আমি আল্লাহ তা'আলার নজরের সামনে রয়েছি। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারে মাথায় রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন।

মোটকথা, জীবনের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি আচরণে, ইহসান-এর অবস্থা রাখতে হবে। কেবল নামাযের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ নয়।

এক জাহান্নামী নারীর উল্লেখ

ভালোভাবে বুঝে রাখুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণেই এক বর্ণনায় আছে, জনৈকা নারী সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হল, সে দিনরাত ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে। খুব নফল নামায পড়ে এবং যিকর ও তিলাওয়াতের ভেতর দিয়েই সময় কাটায়। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ? তার ঠিকানা কোথায় হবে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রতিবেশীদের সাথে তার ব্যবহার কেমন? বলা হল, তাদের সাথে তার ব্যবহার ভালো নয়। তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। তিনি বললেন, তা হলে সে জাহান্নামে যাবে।

জনৈকা জান্নাতী নারীর উল্লেখ

অতঃপর তাঁকে আরেক নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যে নফল ইবাদত তো খুব বেশি করত না, শুধু ফরয ও ওয়াজিব কাজসমূহ করেই ক্ষান্ত থাকত আর বড়জোর সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় করত। নফল 'ইবাদত, যিকর, তিলাওয়াত ইত্যাদি খুব বেশি করত না। তবে প্রতিবেশীদের কষ্ট দিত না এবং অন্যান্য লোকের সাথেও তার আচার-ব্যবহার ভালো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জান্নাতবাসী হবে।

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৯২৯৮ ;
আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ৪৮, হাদীছ নং ৯১১)

প্রকৃত নিঃস্ব কে?

এসব হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেউ যদি নফল ইবাদত করে, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু না করলে আখিরাতে সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে না। জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তুমি নফল ইবাদত কেন করলে না? নফল ইবাদতের অর্থই হল যে, তা করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু না করলে কোন গুনাহ নেই। অপরপক্ষে হুকূকুল-ইবাদ এমন জিনিস যে, কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা এর উপর নির্ভরশীল। এক হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুফলিস সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন বিপুল পরিমাণ নামায রোযা নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়ায় সে কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও মনে কষ্ট দিয়েছিল, কাউকে মারধর করেছিল। এর

ফলে সে যত নেক কাজ করেছিল, তার সমস্ত ছওয়াব তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের গুনাহগুলো তার উপর চাপানো হবে আর এভাবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, হাদীছ নং ৬৫৭৯)

চিন্তা করে দেখুন, হুকূকুল-ইবাদ কত কঠিন জিনিস। একারণেই শরী'আতে এর অনেক গুরুত্ব।

হুকূকুল 'ইবাদ দ্বীনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ

আমি পূর্বেও আরয করেছি, 'ইসলামী ফিক্‌হ' অর্থাৎ শরী'আতের বিধানাবলী যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাকে সমান চারভাগে ভাগ করা হলে ইবাদত-বন্দেগীর অংশ হবে তার এক ভাগ আর আর বাকি তিন ভাগই হুকূকুল-'ইবাদ সম্পর্কে। যাতে লেনদেন, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আপনারা 'হিদায়া' গ্রন্থের নাম শুনে থাকবেন। এটি ইসলামী ফিকহের প্রসিদ্ধ রচনা । চার খণ্ডের এক বিশাল গ্রন্থ। এর প্রথম খণ্ডের আলোচনা ইবাদত সম্পর্কে । তাতে নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। অবশিষ্ট তিনও খণ্ড, হুকূকুল-ইবাদ সম্পর্কে। তাতে লেনদেন ও সমাজ সংক্রান্ত বিধানাবলী বিবৃত হয়েছে। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, হুকূকুল-'ইবাদ হল দ্বীনের তিন-চর্তুথাংশ। সুতরাং এটা দ্বীনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইমাম নববী (রহ) রিয়াযুস-সালেহীনের এই স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদেরকে আমলের জযবায় এটা পড়া ও শোনার তাওফীক দান করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও মরজি মোতাবেক আমাদেরকে হুকূকুল-'ইবাদের যত দিক আছে, তার সবগুলো যথাযথভাবে আদায়ে সাহায্য করুন।

প্রাক-ইসলামী যুগে নারীর অবস্থা

ইমাম নববী (রহ) প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের হক সম্পর্কে যে সব উপদেশ দিয়েছেন, তার বর্ণনা। বান্দার হকসমূহের মধ্যে যেহেতু নারীর হক আদায়ের ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা বেশি ত্রুটি ও অবহেলা করা হয়ে থাকে, তাই ইমাম নববী (রহ) প্রথম পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। ইসলাম প্রচার ও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা বিস্তারের

আগে নারীকে ঠিক মানুষের মর্যাদা দেওয়া হত না । তার প্রতি এমন আচরণ করা হত, যেন সে মনুষ্যজাতির অন্তরর্ভুক্তই নয়। গরু-ছাগল ইত্যাদি মানবেতর প্রাণীর মত ব্যবহার তার সাথে করা হত, মানবিক অধিকারসমূহ লাভের উপযুক্তই তাকে মনে করা হত না। তাই তাকে সেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হত। কোনও ক্ষেত্রেই তার অধিকার স্বীকার করা হত না। মনে করা হত গৃহে যেমন ছাগল-ভেড়া পালন করা হয়। তারাও সেইরকম গৃহপালিত কোন জীব। গৃহপালিত জীবের মতই যেন নারীকে পুরুষ-গৃহে ঠাঁই দেওয়া হয়। উভয়ের প্রতি তাদের আচরণে কোন পার্থক্য ছিল না।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

জগতে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। আসমানী নির্দেশনা থেকে বেখবর বিশ্বকে তিনি নারীর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে চেতনা দান করেন এবং ঘোষণা করেন, তোমরা নারীর প্রতি সদাচরণ কর।

ইমাম নববী (রহ.) সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদের একটা আয়াত উদ্ধৃত করেছেন, যা এ বিষয় সম্পর্কে এমন এক মূলনীতির মর্যাদা রাখে, যার ভেতর সংক্ষেপে নারী অধিকার সম্পর্কিত সবকিছুই এসে গেছে।

ইরশাদ হয়েছে।

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'তোমরা তাদের প্রতি সদাচরণ কর'। (নিসা : ১৯)

এতে সমস্ত মুসলিমকে সম্বোধন করে আদেশ করা হয়েছে, তোমরা নারীদের প্রতি ভালো ব্যবহারের সাথে জীবন যাপন কর। তাদেরকে কষ্ট দিও না। এটা একটা সাধারণ নির্দেশনা, যেন একটা মূলপাঠ, যার ব্যাখ্যা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কথা ও কাজ দ্বারা করে দিয়েছেন। নারীদের প্রতি তার আচরণ এতটাই সুন্দর ছিল যে, তিনি ইরশাদ করেন–

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ وَاَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِيْ

তোমাদের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ যারা তাদের নারীদের প্রতি আচরণে শ্রেষ্ঠ। আমি আমার নারীদের প্রতি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণকারী।[১]

---

[১] এ হাদীছটির ভাষা আরও যাচাই-বাচাইয়ের দরকার আছে। কেননা, হাদীছ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে দু'রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা এরকম।

নারীর অধিকার রক্ষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সচেতনতা ছিল অসাধারণ। তাদের প্রতি সদাচরণে তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুরুত্ব দিতেন। বহু হাদীছে তিনি এ গুরুত্বের ব্যাখ্যাদান করেছেন। এ অধ্যায়ের সর্বপ্রথম হাদীছটি হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

[আমি নারীদের ব্যাপারে তোমাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ কর।]

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৭৮৭; মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৭১; তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৮৩; ইবন মাজাহ্ হাদীছ নং ১৮৪১)

কুরআন মাজীদ কেবল মূলনীতি বর্ণনা করে থাকে

সামনে চলার আগে এ স্থলে একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করছি। কুরআন মাজীদের প্রতি লক্ষ করলে দেখবেন, তাতে সাধারণত মোটা-মোটা মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে। খুঁটি-নাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। এমনকি নামাযের মত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা কিনা দ্বীনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং কুরআন মাজীদে তিয়াত্তর স্থানে তা কায়েমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই নামায কিভাবে পড়তে হবে, তার পদ্ধতি কী? কোন ওয়াকতে কত রাকাআত? কি কি কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায় এবং কি কি কারণে নষ্ট হয় না এ সব ব্যাখ্যা কুরআন মাজীদে দেওয়া হয়নি। এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি এসব শিক্ষা দিয়েছেন। যাকাতের বিষয়টাও এ রকমই। কুরআন মাজীদে এর নির্দেশও প্রায় নামাযেরই সমসংখ্যক স্থানে

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

তোমাদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ যে তার পরিবারবর্গের প্রতি আচরণে শ্রেষ্ঠ আর আমি আমার পরিবারবর্গের প্রতি আচরণে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্য বর্ণনার ভাষা হচ্ছে

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

তোমাদের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ যারা তাদের নারীদের প্রতি আচরণে শ্রেষ্ঠ।

এ বর্ণনায় وَأَنَا خَيْرُكُمْ আমি আমার নারীদের প্রতি আচরণে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথাটি অনুসন্ধান সত্ত্বেও পাওয়া যায়নি। (প্রকাশ থাকে যে, এ বাক্যটি বর্ণনায় না থাকলেও বক্তব্য প্রমাণে কোন সমস্যা নেই, যেহেতু প্রথমোক্ত বর্ণনার দ্বারাই তা প্রমাণ হয়ে যায়)

এবং নামাযেরই পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাকাতের নেসাব কী? কী পরিমাণ সম্পদে যাকাত ফরয হয়? কার উপর ফরয হয়? কী পরিমাণ ফরয হয় এবং কোন কোন জাতীয় সম্পদে ফরয হয়? এসব ব্যাখ্যা কুরআন মাজীদে পাবেন না। এটাও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি হাদীছের মাধ্যমে এসব বিষয় মানুষকে শিক্ষা দান করেছেন। বোঝা গেল, কুরআন মাজীদ সাধারণত মূল বিধান জানিয়ে দেয়, বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে যায় না।

পারিবারিক জীবনই সমাজ-সভ্যতার ভিত্তি

কিন্তু নর-নারীর সম্পর্ক ও পারিবারিক জীবনের ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। কুরআন মাজীদ এ সম্পর্কে কেবল মূলনীতি বলেই ক্ষান্ত হয়নি ; বরং সূক্ষ্ম ও নাজুক খুঁটিনাটি বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। প্রতিটি বিষয় একদম খুলে-খুলে বর্ণনা করেছে। তার উপর আবার মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা তো রয়েছেই। তা ব্যাপার কি? এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হল কেন? ব্যাপার এই যে, নর-নারীর সম্বন্ধ ও মানুষের পারিবারিক জীবন হল গোটা সমাজ ও সভ্যতার বুনিয়াদ। সমাজ-সভ্যতার বৃহত্তর ইমারত এরই উপর স্থাপিত হয়।

নর-নারীর সম্পর্ক যদি সুষ্ঠু থাকে, দাম্পত্য আবহ যদি মধুর থাকে এবং তাদের প্রত্যেকে অন্যের অধিকার আদায়ে যত্নবান থাকে, তবে ঘরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। ঘরে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকলে সন্তান-সন্ততি সুচারুরূপে বেড়ে ওঠে, তাদের দৈহিক ও মানসিক নির্মাণ যথোপযুক্ত হয়ে ওঠে। সন্তান-সন্ততির জীবন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠলে সমাজ-সভ্যতা আপনা-আপনিই সুন্দর হয়ে যায়। তাই বলি, সুষ্ঠু পরিবারের উপরই সুষ্ঠু সমাজের ভিত রচিত হয়। পক্ষান্তরে পরিবার যদি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল না হয়, স্বামী-স্ত্রীতে দিন-রাত কলহ বিবাদ লেগে থাকে, তবে সন্তান-সন্ততির মধ্যে তার কুফল দেখা দেবেই। পরিণামে যে জাতি গড়ে উঠবে, আপনি নিজেই ফয়সালা দিতে পারেন, তারা সে জাতির কতটা শিষ্ট ও মার্জিত সদস্য হবে। এই গুরুত্বের কারণেই কুরআন মাজীদ পারিবারিক বিধানাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করেছে।

পুরুষের বাঁকা হাড় দ্বারা নারীকে সৃষ্টি করার অর্থ

হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের এক চমৎকার উপমা দিয়েছেন। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ উপমা। এমনটা অন্য কোথাও খুঁজে

পাওয়া কঠিন। ইরশাদ করেন, নারীকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেন। তারপর হযরত হাওয়া আলায়হাস সালামকে তাঁরই পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়।

কেউ কেউ এর অন্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, তারা বলেন, এর দ্বারা মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর একটা উপমা পেশ করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, নারী পাঁজরের হাড় সদৃশ। এ হাড় দেখতে বাঁকা, কিন্তু সেই বক্রতাতেই পাঁজরের সৌন্দর্য ও সুস্থতা। কারও চোখে যদি তা বিসদৃশ ঠেকে এবং সে তার বক্রতা দূর করে তাকে সোজা করতে চায়, তবে সোজা তো কিছু হবে না, উল্টো তা ভেঙে যাবে এবং তখন পাঁজর বলতে কিছু থাকবে না। তখন বাঁচতে চাইলে সেটিকে পুনরায় প্লাষ্টার করে আগের মত বাঁকা বানাতে হবে। তো হাদীছে মূলত এই তাৎপর্যের দিকেই ইশারা করে বলা হয়েছে,

إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَفِيْهَا عِوَجٌ

তুমি সে হাড়কে সোজা করতে চাইলে ভেঙে ফেলবে। আর যদি তা দ্বারা উপকার পেতে চাও, তবে তাকে বাঁকা রেখেই উপকার লাভ করতে পারবে।

(বুখারী, হাদীছ ৪৭৮৭: মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৭১: তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৮৫, ইবন মাজাঃ হাদীছ নং ১৮৪১)

অতি তাৎপর্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক উপমা। বোঝানো হচ্ছে যে, বক্রতার মধ্যেই নারীর সৌন্দর্য ও সুস্থতা। সোজা হয়ে গেলে সে আর সুস্থ থাকবে না। সোজা হওয়াটা তার অসুস্থতা।

কিছু লোক এ উপমাকে নিন্দার্থে গ্রহণ করে থাকে। তারা মনে করে, এর দ্বারা নারীর নিন্দা করা হয়েছে। অর্থাৎ বোঝানো হয়েছে যে, নারীকে পুরুষের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই স্বাভাবগত ভাবেই সে বাঁকা। এ কারণেই বহুলোক এ বিষয়ে আমার কাছে চিঠি লিখেছে। কেউ কেউ লিখেছে, নারীকে যেহেতু বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই স্বভাবগত তারা বাঁকা। এভাবে তারা এটাকে নিন্দার্থে গ্রহণ করে। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য সে কথা বোঝানো নয়।

নারীর বক্রতা একটা স্বভাগত চাহিদা ও এটা তার মাধুর্য

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে পৃথক কিছু গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং নারীকেও স্বতন্ত্র কিছু গুণের অধিকারী করেছেন। উভয়ের স্বভাব-

প্রকৃতির মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। স্বভাবগত সেই প্রভেদের কারণে পুরুষ নারী সম্পর্কে মনে করে, সে তার স্বভাববিরোধী। বস্তুত তার স্বভাববিরোধী হওয়াটা নারীর জন্য কোন দোষ নয়। কেননা, তার স্বভাববিরোধী হলেও নারীর স্বভাবের বিরোধী তো নয়। বক্রতা তার স্বভাবগত। কাজেই পুরুষ সেটাকে যতই তার স্বভাবের পরিপন্থী মনে করুক তা নারী-স্বভাবের পরিপন্থী নয় আদৌ। সুতরাং সেটা তার দোষ নয়। যেমন– পাঁজর সম্পর্কে যদি কেউ বলে, বক্রতা তার দোষ, তা সোজা হওয়া উচিত ছিল, তবে সে কথাটাই ভুল হবে কেননা, বক্রতা তার দোষ নয়, বরং তা তার সৃষ্টিগত অবস্থা এবং তার পক্ষে সেটাই সঙ্গত।

বস্তুত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটি নিন্দার্থে বলেননি, বরং তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, নারীর কোন বিষয় যদি তোমাদের স্বভাববিরোধী মনে হয় এবং সে কারণে তাকে তোমরা বাঁকা গণ্য কর, তবে মনে রাখবে সেটা তাদের দোষ নয়। কাজেই সেজন্য তোমরা তাদের নিন্দা করো না; বরং চিন্তা করবে তাই তাদের প্রকৃতির দাবি। তোমরা যদি তাকে সোজা করতে চাও ভেঙে যাবে। বরং বাঁকাই থাকতে দাও এবং তোমরা তাকে দিয়ে উপকৃত হতে চাইলে বাঁকা রেখেই উপকৃত হতে পারবে।

ঔদাসীন্য নারীর শোভা

আজকাল অবস্থা উল্টে গেছে। মূল্যায়নে বদল দেখা দিয়েছে। চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন হয়ে গেছে। মানুষ সবকিছু উল্টাভাবে দেখছে। নয়ত বাস্তব কথা হল, পুরুষের জন্য যা দোষ, নারীর জন্য সব ক্ষেত্রে তা দোষ নয়। বরং অনেক সময় পুরুষের দোষটাই নারীর সৌন্দর্য ও তার শোভা হয়ে থাকে। আমরা কুরআন মাজীদ গভীর দৃষ্টির সাথে পড়লে দেখতে পাব, পুরুষের জন্য দূষণীয় কোন কোন বিষয়কে নারীর গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে নারীর প্রশংসা করা হয়েছে। উদাহরণত দুনিয়ার ব্যাপারে উদাসীন ও বেখবর হওয়াটা পুরুষের জন্য দোষ। কেননা, পুরুষকে দুনিয়াবী কাজের যিম্মাদার বানানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে তার জ্ঞান থাকা জরুরি। তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যদি তার জ্ঞান না থাকে, সে যদি বেখবর ও উদাসীন হয় তবে নিজ দায়িত্ব ও যিম্মাদারি সে কিভাবে পালন করবে? কাজেই এটাকেই নারীর গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছে। সুতরাং সূরা নূরে ইরশাদ।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

যে সকল লোক চরিত্রবতী, গাফিল (অর্থাৎ দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর) ও মু'মিন নারীদেরকে অপবাদ দেয়।' (সূরা নূর : ২৪)

এ আয়াতে দুনিয়া সম্পর্কে অনবহিত থাকাকে নারীর একটি সদ্গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বোঝা গেল, নারী যদি নিজ দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার পর দুনিয়ার অন্যসব বিষয়ে অসচেতন থাকে তবে তা তার পক্ষে তা কোন দোষের বিষয় নয়; বরং তা একটি ভালো গুণ। কুরআন মাজীদ এ স্থলে প্রশংসার্থেই তার উল্লেখ করেছে।

গায়ের জোরে সোজা করার চেষ্টা পরিত্যাজ্য

সুতরাং যা-কিছু পুরুষের জন্য দোষের তার সবই নারীর জন্য দূষণীয় নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে নারীর জন্য তা প্রশংসনীয় হয়ে থাকে। আবার কোন কোন বিষয় পুরুষের জন্য দোষের হয় না, কিন্তু নারীর পক্ষে তা অবশ্যই দূষণীয়। সুতরাং নারীর মধ্যে সে রকম কোন জিনিস যদি চোখে পড়ে এবং তার সংশোধন অপরিহার্য মনে হয় তবে সংশোধনের চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু তা গায়ের জোরে নয়। এ লক্ষে তার প্রতি কিছুতেই দুর্ব্যবহার করা যাবে না। কেননা, পাঁজরের হাড়ের সাথে তুলনা করার দাবি হচ্ছে স্বভাবগতভাবে পুরুষের সাথে তার প্রভেদ রয়েছে, তাই তার উপর চাপ দেওয়া যাবে না।

সমস্ত কলহের মূল

এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ। নারী-পুরুষের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁরচে' ভালো অবগত আর কে হতে পারে? তিনি সমস্ত কলহের শেকড় ধরে টান দিয়েছেন। দাম্পত্য কলহের ভিত্তি হল স্বামীর এই মানসিকতার উপর যে, সে চায় স্ত্রী পুরোপুরি আমার মত হয়ে যাক, কিন্তু তাকে বানানোই তো হয়েছে তার নিজের মত করে। সে তোমার মত হবে কি করে? যদি তোমার মত বানাতে চাও ভেঙে যাবে। তাই এ চিন্তাটাই বাদ দিয়ে দাও। হ্যাঁ যে বিষয়টা তার হিসেবে দোষ, তার স্বভাব-প্রকৃতির বিচারে মন্দ, তা সংশোধন করা চাই। তা সংশোধনের চিন্তা করাও স্বামীর দায়িত্ব। কিন্তু তুমি যদি চাও সে তোমার মেযাজ-মরজি অনুযায়ী হয়ে যাবে, তা কখনও সম্ভব নয়।

তার মধ্যে পসন্দের কিছুও তো থাকতে পারে

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় হাদীছও হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

কোন মুমিন পুরুষ যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার একটা স্বভাব খারাপ লাগলে আরেকটা ঠিকই পসন্দ হবে'।

(মুসলিম, হাদীছ ২৬৭২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ৮০১৩)

এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চমৎকার মূলনীতি বাতলে দিয়েছেন। বলছেন যে, স্ত্রীর কোন একটি দোষের দিকে নজর পড়লে তাকে যেন বিলকুল বাতিল সাব্যস্ত না কর। এক দোষের কারণে যেন না বল, তুমি তো একদম বাজে, সম্পূর্ণ নির্বোধ ও আহাম্মক। তুমি কোন কাজেরই নও। বরং তার মধ্যে একটা দোষ থাকলে অন্য কোন গুণও অবশ্যই থাকবে।

বস্তুত দু'জন লোক একত্রে থাকলে একজনের দৃষ্টিতে অন্যের কোনও একটা ব্যাপার ভালো লাগে এবং অন্যটা খারাপ লাগে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই কোন একটা জিনিস খারাপ মনে হলে সে কারণে তাকে একেবারেই খারাপ মনে করো না। বরং তখন তার ভালো গুণগুলোও লক্ষ কর। তার কোন ভালো গুণও তো অবশ্যই থাকবে। সেই ভালো দিকটি লক্ষ করে আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায় করো যে, এই ভালো দিকটি তো তার মধ্যে আছে। এ নীতি অবলম্বন করলে আশা করা যায় তোমার অন্তরে তার মন্দ বিষয়গুলোর বিশেষ গুরুত্ব থাকবে না।

আসলে মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। যদি দু-তিনটি বিষয় অপসন্দ হয় ও খারাপ লাগে, তখন তাই ধরে বসে পড়ে আর যপতে থাকে তার মধ্যে এই দোষ আছে, ওই দোষ আছে। ভালো কিছুও যে আছে সে দিকে আর দৃষ্টি থাকে না। সারাক্ষণ তাই নিয়ে কাঁদে এবং তার বদনাম করে বেড়ায় এর পরিণামে তার প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করে দেয়।

প্রতিটি জিনিসই ভালো-মন্দে মিশ্রিত

জগতে এমন কোন জিনিস নেই, যার মধ্যে ভালো ও মন্দ দুই-ই না আছে। আল্লাহ এ জগতকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভালো ও মন্দের মিশ্রণেই সব কিছু বানিয়েছেন। দুনিয়ায় সবটুকু ভালো বা সবটুকু মন্দ বলতে কিছু নেই। ভালো মন্দ মিলিয়েই সব হয়। কাফের, মুশরিক বা কোন মন্দ লোকের মধ্যেও খুঁজলে কোনও না কোনও ভালো গুণ অবশ্যই পাবেন।

একটি ইংরেজি প্রবচন

ইংরেজির একটি প্রবচন আছে, আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো ধন, সে যেখানেই তা পাবে নিয়ে নেবে।

(তিরমিযী, হাদীছ নং ২৬১১ ইবন মাজাঃ হাদীছ নং ৪১৫৯)

সুতরাং ইংরেজি প্রবচন হওয়ায় তা যে ভুলই হবে এমন কোন কথা নেই। কথাটি খুবই জ্ঞানগর্ভ। বলা হয়েছে, বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়িও রোজ দু'বার সত্য বলে। মনে করুন, কোন ঘড়ি বারটা পাঁচ বেজে বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে ঘড়িটি আর সঠিক সময় দেবে না এটাই স্বাভাবিক। সেটি দেখলে ভুল সময়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু রোজ দুবার তার সময় সঠিকই হবে। দিনের বারটা পাঁচে দেখবেন তো সময় সঠিকই পাবেন আবার রাত বারটা পাঁচে দেখলেও সঠিক সময় পাবেন। এই দু'বার সে ঘড়ি অবশ্যই সত্য বলবে।

যে ব্যক্তি কথাটি তৈরি করেছে তার বোঝানো উদ্দেশ্য, কোন জিনিস যত অকেজো ও মন্দই হোক, তারপরও খুঁজলে তার মধ্যে কোনও না কোনও ভালো দিক পাওয়া যাবে। দুনিয়ায় এমন কোন মন্দ জিনিস নেই যার ভেতর ভালো বলতে কিছু বিলকুল নেই। আমার পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মরহুম কবি ইকবালের একটা শের পড়তেন–

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

দুনিয়ার কোনও জিনিসই একদম অকেজো নয়।
প্রকৃতির ভাণ্ডারে কোন কিছুই সম্পূর্ণ মন্দ নয়।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি বস্তুই নিজ হিকমত ও ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। গভীরভাবে লক্ষ করলে প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই কোনও না কোনও হিকমত ও কল্যাণ চোখে পড়বে। কিন্তু মানুষ সাধারণত মন্দটাই দেখে। ভালোর দিকে তার দৃষ্টি যায় না। তাই সে বিতৃষ্ণ হয়ে অন্যায় অবিচারে লিপ্ত হয়।

স্ত্রীর ভালো গুণের দিকে লক্ষ কর

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

তোমরা যদি তাদের অপসন্দ কর তবে এমন তো হতেই পারে যে, তোমরা কোন জিনিস অপসন্দ করছ অথচ আল্লাহ তা'আলা তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (নিসা : ১৯)

অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে কোন দোষ দেখে তাকে তোমার অপসন্দ হলেও বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে বহু কল্যাণ নিহিত রাখতে পারেন। কাজেই কেবল দোষের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই ক্ষান্ত হয়ো না। তার গুণও সন্ধান কর। তা করতে পারলে তোমরা একদিকে মনে সান্ত্বনা পাবে, অন্যদিকে বিতৃষ্ণ হওয়ার কারণে তার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করছ তাও বন্ধ হবে।

এক বুযুর্গের শিক্ষণীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি জনৈক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন যে, তার স্ত্রী খুব ঝগড়াটে স্বভাবের ছিল। সর্বক্ষণ কলহ-বিবাদে লেগে থাকত। বুযুর্গ ঘরে ঢুকলে সে তার সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করত। মুখে যা আসত তাই বলত। কেউ একজন তাকে বলল, হযরত ঘরের মধ্যে এরকম ঝগড়া-বিবাদ পুষছেন কেন। তালাক দিয়ে এ পাট চুকিয়ে ফেলুন। বুযুর্গ বললেন ভাই তালাক দেওয়া তো সহজ। যখনই ইচ্ছা হয় দিতে পারব। কিন্তু এর মধ্যে যে, আরও বহু গুণ দেখতে পাই ! তার মধ্যে তো এমন একটা গুণ আছে। যে, কারণে আমি তাকে কখনও ছাড়তে পারব না। সে কারণেই আমি তাকে তালাক দিচ্ছি না। গুণটি হল বিশ্বস্ততা। এ গুণটি তার মধ্যে এমনই অসাধারণ যে, ধরে নাও আমি যদি গ্রেপ্তার হই এবং পঞ্চাশ বছরও জেলে পড়ে থাকি। তবুও আমার বিশ্বাস আমি তাকে ঘরের যে কোণে বসিয়ে যাব সেখানেই বসে থাকবে এবং কারও দিকে চোখ তুলে তাকাবে না। এটা এমনই এক গুণ যার কোন মূল্য দেওয়া সম্ভব নয়।

হযরত মির্যা জানে জানাঁ (রহ)-এর ঘটনা

আপনারা হযরত মির্যা মাজহার জানে জানাঁ রহমাতুল্লাহি 'আলাইহির নাম শুনে থাকবেন। অনেক বড় বুযুর্গ ও উচ্চস্তরের ওলী ছিলেন। তার স্বভাব ছিল বড় সূক্ষ্ম, খুবই নাজুক মেজাযের অধিকারী ছিলেন। কেউ কলসের উপর যদি মগ বাঁকা করে রাখত তার মাথা ধরে যেত। বিছানায় একটু ভাজ পড়লেও মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যেত। তো একদিকে তো ছিল মেজাযের এই নাজুকতা। অন্যদিকে স্ত্রী ছিল বড় কুঁদুলে। প্রায়ই তার সাথে দুর্ব্যবহার

করত। মুখ দিয়ে কিছু না কিছু বের হতেই থাকতো। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে আজব-আজব পন্থায় পরীক্ষা করে থাকেন। এর মাধ্যমে তাদের মর্যাদা উঁচু হতে থাকে। হযরত মির্যা জানে জানাঁ (রহ.)-এর জন্যও এটা এক পরীক্ষা ছিল। তিনি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জীবনভর তিনি সেই স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করেন। তিনি বলতেন, আশা করি, এর অছিলায় আল্লাহ তা'আলা আমার পাপরাশি ক্ষমা করবেন।

আমাদের সমাজের নারীরা দুনিয়ার হুর স্বরূপ

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) বলতেন, আমাদের ভারতবর্ষী নারীরা দুনিয়ার হুরস্বরূপ। তিনি এর ব্যাখ্যা দিতেন যে, তারা খুব বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। তারা স্বামী অন্তপ্রাণ। পশ্চিমা সংস্কৃতির মুসিবত যখন এ দেশে আসল, তখন থেকে তাদের এ গুণ খতম হতে শুরু করেছে। না হয় আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে এত বেশী পতিপরায়ণতা রেখেছেন যে, যে কোনও অবস্থায় তারা স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। স্বামী ছাড়া অন্য কারও দিকে তাদের দৃষ্টি সহজে যায় না ।

যা হোক বুযুর্গগণ মূলত মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীছের উপর আমল করে দেখিয়েছেন যে,

إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

তাদের মধ্যে অপসন্দের এক স্বভাব থাকলে পসন্দের কোনও গুণও অবশ্যই থাকবে। (মুসলিম হাদীছ নং ২৬৭২: আহমাদ, হাদীছ ৮০১৩)

কাজেই সেই একটি দোষকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং গুণের প্রতি লক্ষ কর এবং তার মূল্য দিয়ে তাদের প্রতি সদাচরণ কর। সব অনিষ্টের মূল এটাই যে, তাদের গুণের মূল্যায়ন না করে কেবল দোষের প্রতিই নজর দেওয়া হয়।

স্ত্রীকে মারধর করা একটা চরিত্রহীনতা

অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীছ হল-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ

হযরত আব্দু'ল্লাহ ইবন যাম'আ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাতে তিনি

বিভিন্ন বিষয় ব্যক্ত করেন। তারপর নারীদের বিষয়ে নসীহত করেন এবং তাতে ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ কেউ তার স্ত্রীকে দাসের মত পেটায় অথচ চিন্তা করে না, হয়ত দিন শেষে তার সাথে সহবাস করবে। (বুখারী, হাদীছ নং ৪৫৬১; মুসলিম, হাদীছ নং ৫০৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৫৬৩১;) অর্থাৎ যে স্ত্রীর সাথে একটু পরেই সে তার দৈহিক চাহিদা পূরণে রত হবে, এখন সে তার প্রতি এরূপ নির্মম কিভাবে হতে পারে যে, নিজ গোলামকে যেভাবে পেটায়, তাকেও সেভাবে পেটাচ্ছে? এটা কতই না নির্লজ্জতা এবং কত বড়ই না চরিত্রহীনতা।

স্ত্রীকে সংশোধনের তিনটি পর্যায়

আমি পূর্বেই আরয করেছি যে, কুরআন মাজীদ দাম্পত্যবিষয়ক খুঁটিনাটি বিষয়ও আলোচনায় এনেছে এবং শাখাগত সব বিষয়ের বিধানাবলী বিশেষ গুরুত্বের সাথে পেশ করেছে। স্বামী-স্ত্রীর কলহ নিরসন ও তাদের মধ্যে বনিবনা সৃষ্টির কী ব্যবস্থা হতে পারে তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। স্ত্রীর কোনও বিষয় অপসন্দ হয়ে গেলে কুরআন মাজীদ তার সমাধান পেশ করেছে এই যে, তার কোনও একটা বিষয় অপসন্দ হয়ে গেলে তোমরা তার গুণসমূহের প্রতি লক্ষ কর। তারপরও যদি স্বামী মনে করে তার মধ্যে এমন কিছু দোষও আছে, যা সহ্য করে নেওয়া সম্ভব নয় এবং তার সংশোধন জরুরি, তবে অবশ্যই তার সংশোধনের চেষ্টা করবে। কেননা, স্ত্রীকে সংশোধন করার দায়িত্ব শরীআতের পক্ষ হতে স্বামীর উপর ন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং সে দায়িত্বও তাকে আদায় করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তার পদ্ধতি কী? স্ত্রীকে সংশোধন করার জন্য স্বামী কী পন্থা অবলম্বন করবে? কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিচ্ছে।

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

তোমরা যে স্ত্রীদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে উপদেশ দাও, তাদেরকে বিছানায় ত্যাগ কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। (সূরা নিসা : ৩৪)

অর্থাৎ সর্বপ্রথম তাদেরকে নম্রতার সাথে বোঝাও, প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে উপদেশ দাও। এটাই সংশোধনের প্রথম ধাপ। উপদেশ দ্বারা যদি সংশোধন হয়ে যায় এবং অনুচিত কাজটি ছেড়ে দেয়, তবে তোমরাও ক্ষান্ত হও। আর সামনে অগ্রসর হয়ো না। কিন্তু যদি উপদেশ ও নসীহতের কোন তাছীর না পাওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় ধাপ অবলম্বন কর। তাদের সাথে এক বিছানায় শোওয়া ছেড়ে দাও। নিজ বিছানা আলাদা করে ফেল। যদি বুঝ-

সমঝ থাকে ও আকল-বুদ্ধি কাজ করে থাকে, তবে এর মাধ্যমেই তারা শুধরে যাবে। (বিছানা পৃথক করা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী হাদীছে আসবে)

স্ত্রীকে মারার সীমারেখা

সংশোধনের দ্বিতীয় পর্যায়ও যদি ফলপ্রসূ না হয়, তখন তৃতীয় পর্যায়ে তাকে মারতে পারবে। কিন্তু সে মার কী রকম হবে? কী পরিমাণে হবে? এ সম্পর্কে বিদায় হজ্জে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে যে সর্বশেষ নসীহত করেন, তাতে আছে—

وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

তাদেরকে এমন লঘু মার মারবে, যাতে শরীরে কোন দাগ না পড়ে।

(তিরমিযী হাদীছ ১০৮৩, ৩০১২)

অর্থাৎ চেষ্টা তো থাকবে যাতে মারের পর্যায়ে পৌঁছতেই না হয়। এটা সর্বশেষ ব্যবস্থা। যখন প্রথমে দুই ব্যবস্থা ব্যর্থ হবে, তখন নিরুপায় হয়ে সবশেষে এদিকে এগোবে। তাতেও আবার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, মারাটা যেন বেদনাদায়ক না হয়। কেননা, মারার উদ্দেশ্য কষ্ট দেওয়া না বরং কেবল সংশোধন করা। কাজেই যে মারে কষ্ট পাবে তা জায়েযই নয়। কাজেই তাকে মারতে হবে সর্তকতার সাথে যাতে শরীরে কোন দাগ না পড়ে। (এ ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ পরের হাদীছে আসবে)

স্ত্রীদের প্রতি নবীজির আচরণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইহলোক থেকে বিদায় নেন, তখন তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীদের সংখ্যা ছিল নয়জন। তারা তো আসমান থেকে নেমে আসা ফিরিশতা ছিলেন না। মানবসমাজেরই সদস্য ছিলেন। তাদের মধ্যেও সতীনদের মঝে সাধারণত যা ঘটে, সে রকম ঘটনাবলী ঘটত। অনেক সময় এমন সমস্যাও দাঁড়িয়ে যেত, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপন্থা কেমন ছিল? আম্মাজান হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, সারাটা জীবনেও কখনও কোন স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেননি। বরং যখনই তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন, মুখে হাসি লেগে থাকত।

(সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ, ১২১;
কানযুল-উম্মাল, হাদীছ নং ১৮৭১৯, ৭খ, ২২২পৃঃ)

হযরত আরেফী (রহ)-এর কারামত

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি – আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন – আমাদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কখনও কখনও বলতেন, বিবাহ করেছি পঞ্চান্ন বছর হয়েছে, কিন্তু আল হামদুলিল্লাহ, এই পঞ্চান্ন বছরে কখনও কণ্ঠস্বর বদলে কথা বলিনি।

আমি বলে থাকি, হাওয়ায় উড়ে চলা বা পানিতে হেঁটে যাওয়াকে মানুষ কারামত মনে করে, কিন্তু আসল কারামত তো এটাই। পঞ্চান্ন বছর যাবৎ দাম্পত্য জীবন যাপন করছেন, আর এটা তো এমনই সম্পর্ক, যাতে অপসন্দের কিছু না কিছু না ঘটে পারে না, এবং তাতে কখনও না কখনও মনে খারাপ লেগেই থাকবে, অথচ বলছেন, আমি কখনও আওয়াজ বদলে কথা বলিনি। এখানেই শেষ নয়, হযরতের মুহতারামা স্ত্রী আমাদেরকে জানাচ্ছেন, সারা জীবনে কখনও আমাকে পানি দাও এতটুকু আদেশ পর্যন্ত তিনি করেননি। কোনও কাজেরই হুকুম তিনি আমাকে কখনও করেননি। আমি নিজ আগ্রহে তার প্রতি লক্ষ রাখতাম, তার কাজ করে দিতাম এবং এটাকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় গণ্য করতাম। কিন্তু তিনি নিজে থেকে আমাকে কোনও দিন তার কোন কাজ করে দেওয়ার জন্য আদেশ করেননি।

তরীকত তো মানবসেবারই নামান্তর

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী (রহ) বলতেন, আমি নিজেকে একজন খাদেমই মনে করি। আমার বিশ্বাস, আমাকে দুনিয়ায় খেদমতের জন্যই পাঠানো হয়েছে। আমার সংগে যারা সম্পৃক্ত, তাদের খেদমত করাকে আমি নিজ দায়িত্ব মনে করি। নিজেকে আমি সেবা লাভের উপযুক্ত গণ্য করি না যে, অন্যরা আমার সেবা করবে আর আমি তাদের মাখদূম হয়ে থাকব। বরং আমিই সেবক। আমি আমার স্ত্রীরও খাদেম, সন্তানদেরও খাদেম। আমার মুরীদদেরও খাদেম হয়ে থাকতে চাই এবং আরও যত লোকের সাথে আমার সম্পর্ক আছে, তাদের খাদেম হয়েই বাঁচতে চাই এবং এ বিশ্বাসের সাথেই আমি মৃত্যু চাই। আমি মনে করি, বান্দার জন্য সেবক হওয়ার মধ্যেই মর্যাদা। তাই আমি খাদেমই থাকতে চাই। তিনি বলেন,

زتسبیح و سجادہ و دلق نیست   طریقت بجز خدمت خلق نیست

তাসবীহ, জায়নামায ও চটের পোশাক দিয়ে তরীকত (আধ্যাত্মিকতা) হয় না। তরীকত তো হয় সৃষ্টির সেবা দ্বারা।

তরীকত মূলত মানবসেবারই নাম। হযরত বলতেন, যখন বুঝে ফেলেছি যে, আমি একজন খাদেম, মাখদুম নই, তখন অন্যের উপর হুকুম চালাই কিভাবে? খাদেম কি কাউকে আদেশ করতে পারে যে, এই কাজ করে দাও? সারা জীবন এভাবেই চলেছি যে, যখন কোন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা নিজেই করেছি। কাউকে করে দিতে বলিনি। এটাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ। আমরা বাহ্যিক কাজসমূহে তো সুন্নতের অনুসরণ করি, কিন্তু আখলাক-চরিত্র, মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুন্নতের প্রতি গুরুত্ব দেই না অথচ এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেবল দাবি যথেষ্ট নয়

সুন্নতের অনুসরণ এক আশ্চর্য জিনিস। এটা মানুষের দুনিয়াও শুধরে দেয়, আখিরাতও গড়ে দেয়। সুন্নতের অনুসরণ মানুষের গোটা জীবনকেই সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তোলে। কিন্তু এটা কোন দাবি দ্বারা হয় না।

وَكُلٌّ يَدَّعِيْ حُبًّا لِلَيْلٰى وَلَيْلٰى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَالِكَ

প্রত্যেকেই দাবি করে, সে লায়লাকে ভালোবাসে, কিন্তু লায়লা কারও পক্ষেই সে কথা স্বীকার করে না।

মূলত বিষয়টা আমল ও অনুসরণের। মানুষ নিজ কাজকর্ম ও আখলাক-চরিত্রকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যে, কাউকে কোনভাবে কষ্ট দেবে না। যার সাথে সামান্য একটু সম্পর্কও আছে, সে যাতে কোনও রকম কষ্ট না পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। সুন্নতের প্রকৃত অনুসরণ এটাই।

সারকথা, কুরআন মাজীদ স্ত্রীকে শোধরানোর তৃতীয় যে পর্যায় বর্ণনা করেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ জীবনাচার দ্বারা তার ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি সারা জীবনে একবারও কোন স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেননি। তাতে তাদের দ্বারা যত অপসন্দের কাজই হয়ে থাক। বরং যারা স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, তিনি তাদেরকে নিকৃষ্ট মানুষ সাব্যস্ত করেছেন।

বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণের একটি অংশ

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ اَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلَّا اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

এ হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণের একটি অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভাষণে তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন, সম্ভবত এবছরের পর এখানে তোমাদের সাথে আমার আর সাক্ষাত হবে না। তিনি যে সব বিষয়ে উম্মতের পদস্খলন ঘটার আশংকা করেছিলেন, সে সব ক্ষেত্রে উম্মত বিপথগামী হতে পারে বলে তিনি ভয় করেছিলেন, সেগুলো বেছে বেছে তিনি এ ভাষণে ব্যক্ত করেন এবং সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করেন, যাতে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য উম্মত তাদের হাতে এক আলোকিত কর্মপন্থা পেয়ে যায় এবং বিভ্রান্তির সকল পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ভাষণটি অনেক লম্বা। হাদীছ গ্রন্থসমূহে তার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে পৃথকভাবেও বর্ণিত হয়েছে। উদ্ধৃত অংশটুকুও সে ভাষণ থেকেই নেওয়া। এতে নর-নারীর পারস্পরিক অধিকারসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বিশেষভাবে পুরুষদেরকে লক্ষ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন নারীর অধিকারসমূহ রক্ষায় যত্নবান থাকে। আপনারা এতটুকু কথা চিন্তা করলেই এসব অধিকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জেও এমন এক সময়ে এসব অধিকারের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যখন তার মাথায় এই চিন্তা কাজ করছিল যে, আগামীতে হয়ত আর এরূপ সমাবেশে কথা বলার কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না। সুতরাং বিদায়ী ভাষণে বলার জন্য যেসব বিষয় তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব যে কত বেশি তা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। কাজেই তিনি যেসব বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন সেসব বিষয়ের প্রতি উম্মতের সর্বাবস্থায় খেয়াল রাখা উচিত। নর-নারীর পারস্পরিক হকসমূহও তার অন্তর্ভুক্ত।

দাম্পত্য সম্পর্কের গুরুত্ব

মানবজীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা এর দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। সেই সংগে এটাও বোঝা যায় যে, খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতটা গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। ব্যাপার এই যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে একে অন্যের হক যদি যথাযথভাবে আদায় না করে এবং এভাবে তারা দাম্পত্য সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলে, তবে এর দ্বারা যে কেবল তাদের দু'জনের হক নষ্ট হয় তাই নয় ; বরং তাদেরকে অতিক্রম করে তার কুফল তাদের সন্তানদের মধ্যেও গিয়ে পড়ে এবং উভয়ের খান্দানের মধ্যেও তার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে। আর সমাজ-সভ্যতার ভিত্তিই যেহেতু পরিবারের উপর, তাই পরিণামে গোটা সমাজ-

সভ্যতাকেও এর কুফল ভোগ করতে হয়। সমাজ বিগড়ে যায়। সভ্যতা যায় নড়বড় হয়ে। এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক আদায়ের প্রতি এতটা গুরুত্ব দান করেছেন।

নারীগণ তোমদের কাছে বন্দী

হযরত আমর ইবনুল আহওয়াস জুশামী রাযিয়াল্লাহ তাআলা আনহু বলেন, এ ভাষণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। তারপর বিভিন্ন বিষয়ে নসীহত করেন। তারপর ইরশাদ করেন, তোমরা মন দিয়ে শোন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণের উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ কর। এ বাক্যটি আগের হাদীছেও বর্ণিত হয়েছিল। এখানে পরবর্তী বাক্য হল,

فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ

কেননা, তারা তোমাদের কাছে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের এমন একটা অবস্থা এ বাক্যে উল্লেখ করেছেন যে, পুরুষ তা চিন্তা করলে কখনও তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার কথা চিন্তাই করতে পারবে না।

এক অজ্ঞ মেয়ের কাছে শিক্ষা নাও

আমাদের হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) বলতেন, দেখ দুটি কথা দ্বারা দুই নর-নারীর মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একজন বলে, আমি বিবাহ করলাম, অন্যজন বলে কবুল করলাম। ব্যস বিবাহ হয়ে গেল। এক অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মেয়েও এ কথা দুটি বলে। আর দেখ, সে এ দুটি কথার কি মর্যাদা রক্ষা করে। সে এর মর্যাদা রক্ষায় নিজ বাবা মাকে ছেড়ে দেয়, ভাইবোন ছেড়ে দেয়, নিজ পরিবার ও খান্দানকে ছেড়ে দেয় এবং সমস্ত জ্ঞাতী-গোষ্ঠীকে ছেড়ে দিয়ে একা স্বামীর হয়ে যায়। তার ঘরে আবদ্ধ হয়ে যায়। এর থেকে শিক্ষা নাও। অনেক বড় শিক্ষা এর মধ্যে আছে। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এক অজ্ঞ মেয়ে দুটি কথার এমন মর্যাদা দেয় যে, সব কিছু ছেড়ে সে একমাত্র স্বামীর হয়ে গেল, কিন্তু তোমরা তো পারলে না। তোমরা দুটি কথার মর্যাদা রক্ষা করলে না। তোমরা বলেছ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। দরকার তো ছিল, যার জন্য এ দু'টি কথা বললে

একান্তভাবে তারই হয়ে যাবে। তা কই হলে। তোমাদের চেয়ে তো ওই অজ্ঞা মেয়েটিই ভালো, যে দুকথার ইজ্জত রাখল, কিন্তু সে ইজ্জত তোমরা রাখতে পারলে না। যার জন্য বললে তাঁর হয়ে গেলে না।

নারীগণ তোমাদের জন্য কত বড় ত্যাগ স্বীকার করে

এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, দেখ, সে তোমার জন্য কত বড় ত্যাগ স্বীকার করল। ভাবো তো দেখি, যদি বিষয়টা এর বিপরীত হত, যদি তোমাকে বলা হত, তোমার বিবাহ হবে। নিজ বাবা মা, পরিবার খান্দান ছেড়ে যেতে হবে, তবে তোমার জন্য ব্যাপারটা কত কঠিন হত? অথচ তোমার স্ত্রী অজানা পরিবেশ অজানা পরিবার এবং এক অপরিচিত ও নতুন লোকের সাথে জীবন যাপনের জন্য বন্দী হয়ে গেল! তোমার কি কর্তব্য নয় তার এত বড় ত্যাগের যথাযথ মূল্য দেওয়া এবং সে দিকে লক্ষ করে তার প্রতি সর্বদা হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করে যাওয়া?

এর পর স্ত্রীর উপর মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত কঠিন কথা উচ্চারণ করেছেন। যখনই এর ব্যাখ্যা করার অবকাশ আসে পুরুষেরা নাখোশ হয়ে যায়। তিনি ইরশাদ করেন-

لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ

তোমরা তাদের কাছে এ ছাড়া অন্য কিছুর অধিকার রাখ না। অর্থাৎ স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার কেবল এতটুকুই যে, তারা তোমাদের ঘরে থাকবে। শরীআতের বিধানে তাদের উপর এর বেশি কোন দাবি তোমাদের চলবে না।

রান্নাবান্না স্ত্রীর শর'ঈ দায়িত্ব নয়

এরই ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কিরাম রান্নাবান্না সম্পর্কে যে মাসআলা লিখেছেন, তা বললে পুরুষেরা খুব নারাজ হয়ে যায়। তারা লিখেছেন, ঘরের রান্নাবান্না করা স্ত্রীর শরঈ দায়িত্ব নয়। অর্থাৎ স্ত্রীকে ঘরের খাবার পাকাতে হবে এরকম কোন দায়িত্ব শরীআতের পক্ষ হতে তার উপর অর্পিত হয়নি। ফুকাহায়ে কিরাম বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা বলেন, স্ত্রীগণ দু'ধরনের হয়ে থাকে। কোন কোন স্ত্রী তার মাতৃগৃহে কাজ করত, রান্নাবান্না করত আর কোন কোন স্ত্রী এমন, যারা মায়ের ঘরে রান্নাবান্নার কাজ করত না। বরং সেখানে চাকর-বাকর থাকত এবং তারাই এ

কাজ করত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের বিবাহ হলে স্বামীগৃহে রান্নাবান্না করা কোনওভাবেই তাদের কর্তব্য হয় না। অর্থাৎ আইনগতভাবেও এ দায়িত্ব তার উপর বর্তায় না এবং নৈতিকভাবেও নয়। শরঈভাবেও নয় এবং দিয়ানাত হিসেবেও নয়। বরং এরূপ স্ত্রী চাইলে তার স্বামীকে বলতে পারে, আমার খোরপোশ দেওয়া তোমার দায়িত্ব। কাজেই রান্নাবান্না আমি করতে পারব না; বরং তুমি যেভাবে পার রান্নার ব্যবস্থা কর এবং রান্না করা খাবার আমাকে খেতে দাও।

ফকীহগণ বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর কর্তব্য যেভাবেই হোক রান্নার ব্যবস্থা করা এবং রান্নাকরা খাবার স্ত্রীকে খাওয়ানো। স্ত্রীকে সে কিছুতেই রান্না করার জন্য চাপ দিতে পারবে না। আইনগতভাবেও নয় এবং নৈতিকতার দোহাই দিয়েও নয়। আর্থাৎ শরীআত ও দিয়ানত কোনওভাবেই স্ত্রীর কাছে সে রান্নার দাবি করতে পারবে না। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন

لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ

তোমরা তাদের কাছে এ ছাড়া অন্যকিছুর অধিকার রাখ না। অর্থাৎ তোমাদের অধিকার এতটুকুই যে, তোমরা স্ত্রীদেরকে ঘরের ভেতর রাখবে এবং তারা তা থাকতে বাধ্য থাকবে। তোমাদের অনুমতি ছাড়া তারা বাইরে যেতে পারবে না। তা যাওয়া তাদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু এর বেশি কোন দায়িত্ব তাদের উপর নেই এবং শরীআত তাদের উপর তোমাদেরকে তার বেশি কোন অধিকার দেয়নি।

আর যেসব নারী মায়ের ঘরে রান্নাবান্নার কাজ করে থাকে, বিবাহের পর স্বামীগৃহে আইনগতভাবে যদিও এটা তাদের দায়িত্ব থাকে না, কিন্তু দিয়ানত হিসেবে তা করা তাদের কর্তব্য। অর্থাৎ আদালতের আইনে তো সে রান্না করতে বাধ্য নয়, কিন্তু নৈতিকতার দাবি হল সে নিজের খাবার নিজেই রান্না করে নেবে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর কর্তব্য রান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও উপকরণাদি সরবরাহ করা। এ তো গেল স্ত্রীর নিজের খাদ্যের ব্যাপার। বাকি স্বামী ও সন্তানদের খাদ্য প্রস্তুতের দায়িত্ব কোনও দৃষ্টিকোণ থেকেই স্ত্রীর উপর নয়। আইনত তো নয়ই, নৈতিকভাবেও নয়। কাজেই স্বামী তার কাছে কোনওভাবেই এ দাবি করতে পারে না যে, আমার জন্যও খাবার রান্না করে দাও। হ্যাঁ স্ত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বামী ও সন্তানদের জন্য রান্না করলে সেটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু সে যদি তা করতে অস্বীকার করে তবে আদালতের মাধ্যমে তাকে তা করতে বাধ্য করার কোন সুযোগ নেই। আমাদের ফকীহগণ এসব মাসআলা এরূপ বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।

শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা স্ত্রীর দায়িত্বে নয়

এক্ষেত্রে আরও একটা বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকে. বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। উপরের আলোচনা দ্বারা যখন জানা গেল, স্বামী ও সন্তানদের খাবার-দাবার রান্না করে দেওয়া স্ত্রীর দায়িত্ব নয়, তখন স্বামীর পিতামাতা ও ভাইবোনদের জন্য রান্নাবান্না করার দায়িত্ব তার উপর কিভাবে থাকে? থাকতে যে পারে না তা তো উপরের আলোচনা দ্বারা এমনিতেই বুঝে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে রেওয়াজ হল, ছেলের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার পিতামাতা মনে করে, বউয়ের উপর ছেলে অপেক্ষা তাদেরই অধিকার বেশি। কাজেই বউয়ের প্রথম কর্তব্য আমাদের সেবাযত্ন করা। তাতে সে তাদের ছেলের সেবা করুক বা না করুক। এরই পরিণামে বউ-শাশুড়ি ও ননদ-ভাবীর মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ লেগে থাকে। আর এতে যে কত রকম অশান্তি হয় তা আপনাদের চোখের সামনেই আছে। বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করা স্ত্রীর নয়, বরং তাদের সন্তানের দায়িত্ব। পুত্র নিজেই তার পিতামাতার খেদমত করবে। বউকে তা করতে বাধ্য করবে না।

শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করতে পারা একটা সৌভাগ্য

তবে হ্যাঁ, একজন আদর্শ স্ত্রী তার স্বামীর পিতামাতার সেবাযত্ন করতে পারাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করবে। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে তা করতে সচেষ্ট থাকবে। আর তা করলে সে নিঃসন্দেহে ছওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু খুশিমনে তা করতে না চাইলে স্বামীর এ অধিকার নেই যে, স্ত্রীকে তা করতে বাধ্য করবে এবং নিজ পিতামাতার সেবাকে জবরদস্তি তার উপর ন্যস্ত করবে। পিতামাতার জন্যও এরূপ করা জায়েয় নয়। অর্থাৎ তারাও পুত্রবধূকে তাদের নিজেদের সেবাযত্নের জন্য বাধ্য করতে পারে না। বিষয়টাকে সম্পূর্ণ বউয়ের নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে হবে। সে খুশিমনে তা করলে ভালো কথা। সেটা তার একটা সৌভাগ্য বলে গণ্য হবে এবং এজন্য সে ইনশাআল্লাহু তা'আলা ছওয়াব ও পুরস্কারও লাভ করবে। সে দিকে লক্ষ করে পুত্রবধূর তা করাই উচিত। যাতে ঘরের পরিবেশ সম্প্রীতিপূর্ণ ও আনন্দময় থাকে।

পুত্রবধূর সেবাকে মূল্যায়ন করা চাই

অপরদিকে শ্বশুর-শাশুড়িরও কর্তব্য পুত্রবধূ তাদের যে খেদমত করে তার মূল্যায়ন করা। তাদের বুঝতে হবে, সে যে খেদমত করছে সেটা তার

সৌজন্যমূলক আচরণ। তার পক্ষে তা ফরয-ওয়াজিব নয়। সুতরাং তাদের উচিত সে খেদমতকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা এবং তার কোন বিনিময় দেওয়ার চেষ্টা করা। এসব হক ও মাসায়েল না বোঝার কারণেই ঘরে ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলছে। বউ-শাশুড়ি ও ননদ-ভাবীর ঝগড়ায় পরিবারসমূহ বরবাদ হচ্ছে। তা হচ্ছে এজন্য যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহের যে, সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ রাখা হচ্ছে না। মানুষের মন থেকে তা বলতে গেলে মুছেই গেছে।

হযরত আরেফী (রহ) একদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার সাথে এক ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনই আমার মজলিসে যাতায়াত করত। কিছুটা ইসলাহী (সংশোধনমূলক) সম্পর্কও তারা গড়ে তুলেছিল। তারা একবার তাদের ঘরে আমাকে দাওয়াত করল। আমি গেলাম। তারা বেশ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল। খাবার খুবই সুস্বাদু হয়েছিল। আমাদের হযরতের হাজারও গুণের মধ্যে এই গুণও ছিল যে, তিনি কোথাও খানা খেলে খাওয়ার পর যে মহিলা তা তৈরি করেছে তার উৎসাহ বর্ধনের জন্য রান্নার প্রশংসা করতেন এবং বলতেন খাবার খুব সুস্বাদু হয়েছে। এভাবে তিনি তার মনোরঞ্জনের প্রতি লক্ষ রাখতেন। এদিনও যখন খানা খাওয়া শেষ হল এবং সেই মহিলা পর্দার আড়ালে এসে সালাম দিল, হযরত বললেন, খানা খুব সুস্বাদু হয়েছে, খুব তৃপ্তির সাথে খেয়েছি। হযরত বলেন, একথা বলতেই পর্দার ওপাশ থেকে মৃদু কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি হতভম্ব। বুঝতে পারলাম না, আমার কোন কথায় সে মনে আঘাত পেয়েছে। এমন কী বলেছি, যদ্দরুন মনোকষ্টে সে কেঁদে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী? আপনি কাঁদছেন কেন ? মহিলা খুব কষ্টে কান্না সংযত করল। তারপর বলল, হযরত চল্লিশ বছর যাবৎ আমি স্বামীর ঘর করছি। এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে কখনও স্বামীর মুখে শুনিনি ভালো রান্না করেছ। এতদিনে আপনার মুখেই এ বাক্যটি শুনতে পেলাম। তাই আবেগে কান্না এসে গেছে।

হযরত প্রায়ই বলতেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীর রান্নাবান্নাকে শর'ঈ দৃষ্টিতে দেখতে জানে, ফলে অনুভব করে রান্নাবান্না তার দায়িত্ব নয়; বরং কেবলই সৌজন্যমূলক আচরণ এবং নিজ উন্নত আখলাকের প্রেরণায় সে এটা করছে, এরকম ব্যক্তি কখনও স্ত্রীর কাজকে ওভাবে অবমূল্যায়ন করতে পারে না। সে অবশ্যই তার কাজকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্ত্রীকে খাদেম ও সেবাদাসী মনে করে এবং ভাবে, এটা তো তার দায়িত্ব, যা স্ত্রী হিসেবে তাকে করতেই হবে। আর সে হিসেবেই এটা সে করছে, এটা করা

তার জন্য ফরয, সে ব্যক্তি কখনও স্ত্রীর প্রশংসা করবে না। সে ভাববে, স্ত্রী তো নিজ দায়িত্বই পালন করছে, এজন্য তার প্রশংসা করতে হবে কেন?

স্বামীর নিজেকেই তার পিতামাতার খেদমত করতে হবে

প্রশ্ন ওঠে, পিতামাতা দুর্বল বা অসুস্থ, তাদের সেবা না করলে চলে না, এদিকে ঘরে কেবল পুত্র ও পুত্রবধূই আছে, এ অবস্থায় কী করা যাবে? কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ অবস্থায় শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করা পুত্রবধূর দায়িত্ব নয়; বরং সে দায়িত্ব পুত্রের নিজেরই। কাজেই বউয়ের উপর এটা চাপানো যাবে না। হ্যাঁ; স্ত্রী খুশিমনে করলে সেটা তার সৌভাগ্য এবং এজন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ছওয়াব ও পুরস্কারযোগ্য হবে আর সে তা করবে বৈকি! কিন্তু পুত্রকে মনে করতে হবে যে, এটা আমারই কাজ। তাই আমার নিজেকেই পিতামাতার খেদমত করতে হবে। এখন সে নিজ হাতে তা করুক বা চাকর-বাকর রেখে তাদের দ্বারা করাক, সেটা তার এখতিয়ার। কিন্তু ব্যবস্থা তাকে একটা করতেই হবে। স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সে নিজ খুশিতে করলে সেটা হবে তার ইহসান ও উদারতা। এটাকে তার বাড়তি সেবা হিসেবেই দেখতে হবে এবং সেজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

বিনা অনুমতিতে বাইরে যাওয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয নয়

কিন্তু সেই সাথে আরও একটা বিধান শুনে নিন। নয়ত ব্যাপার উল্টে যাবে। কেননা, লোকে যখন এক দিকের কথা শুনে তা দ্বারা অন্যায় সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে। এতক্ষণ আমি রান্নার দায়িত্ব নারীর উপর না থাকা বিষয়ে তো বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কিন্তু সেই সংগে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী 'তারা তোমাদের ঘরে আবদ্ধ থাকে' এর মর্মও ভালোভাবে বুঝতে হবে। এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, স্ত্রীকে স্বামীগৃহেই অবস্থান করতে হবে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে যাওয়া তার জন্য জায়েয নয়। সুতরাং ফুকাহায়ে কিরাম রান্নার দায়িত্ব সম্পর্কে যেমন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তেমনি তারা এ বিধানটিও স্পষ্ট করেছেন যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে দেয় আমার অনুমতি ছাড়া তুমি কোথাও যেতে পারবে না। তবে বিনা অনুমতিতে কোথাও যাওয়া তার জন্য একদম জায়েয নয়। এমনকি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাত, বরং পিতামাতাকে দেখতে যাওয়ার জন্যও যদি যেতে নিষেধ করে দেয়, তবুও তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করার জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া তার জন্য জায়েয হবে না। হ্যাঁ; পিতামাতা যদি মেয়েকে দেখতে আসে, তবে সে অনুমতি তাদের থাকবে। এতে বাধা দেওয়া

স্বামীর জন্য জায়েয নয়। এক্ষেত্রেও ফকীহগণ একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারা বলেন, পিতামাতা সপ্তাহে একবার আসবে এবং মেয়েকে দেখে চলে যাবে। এটা স্ত্রীর হক। স্বামী এতে বাধা দিতে পারবে না।

হ্যাঁ; স্ত্রী নিজে যদি যেতে চায় সেক্ষেত্রে স্বামী বাধা দিতে পারবে। তার অনুমতি ছাড়া যাওয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয নয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। একদিকে আইনত রান্নাবান্না করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। অন্যদিকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে যাওয়াও তার জন্য জায়েয নয়।

জীবনতরী তারা উভয়ে মিলেই চালাবে

এসব ছিল আইনের কথা। কিন্তু সৌজন্য শারাফাতের দাবি হল, তারা প্রত্যেকে অন্যের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে। অন্যে কিসে খুশি হয় সে দিকে লক্ষ রাখবে। এর জন্য উত্তম পন্থা হল কাজ ভাগ করে নেওয়া। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাযি.) বাইরের সব কাজ করতেন আর হযরত ফাতেমা (রাযি.) ভেতরের কাজসমূহ আনজাম দিতেন।

এটাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং এরই অনুসরণ করা উচিত। স্বামী-স্ত্রীর কারওই আইনের ঘোরপ্যাচে পড়া উচিত নয়। বরং স্ত্রীর প্রতি স্বামী এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রী সম্প্রীতিমূলক আচরণই করবে। সেই সম্প্রীতির প্রেরণায়ই স্বামী বাইরের কাজ করবে আর স্ত্রী ভেতরে সামলাবে। এ বন্টন স্বভাবেরই অনুকূল। এভাবেই তারা মিলে মিশে দাম্পত্যতরী চালিয়ে নেবে।

স্ত্রী অনুচিত কাজ করলে

অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا

অবশ্য তারা যদি সুস্পষ্ট কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে বিছানায় পরিত্যাগ কর এবং তাদেরকে লঘু প্রহার কর। অতঃপর তারা যদি আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ সন্ধান করো না।

অর্থাৎ তারা খোলামেলা গর্হিত কোন কাজ করলে তা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। এ ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদে প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথমে তাদেরকে উপদেশ দেবে। তাতে তারা নিবৃত্ত না হলে তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে। তাতেও কাজ না হলে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে তাদেরকে মারারও অনুমতি আছে, শর্ত হল, সে মার হতে হবে লঘু, যাতে ব্যথা না পায়। এতে যদি সংশোধন হয়ে যায় এবং তোমাদের কথা মেনে নেয়, তবে তোমরাও ক্ষান্ত হয়ে যাবে। অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে যাবে না। অর্থাৎ তাদেরকে বাড়তি কষ্ট দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

শোন, তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের হক হল তোমরা পোশাক ও খাদ্যের ব্যাপারে তাদের প্রতি সদাচরণ করবে। এছাড়া তাদের অন্যান্য যেসব প্রয়োজন পূরণ করা তোমাদের দায়িত্ব তাতেও উদার আচরণ করবে। যতটুকু না করলেই নয় অর্থাৎ যা করলে কোনও রকমে দায়িত্ব আদায় হয়ে যায় এরকম ন্যূনতম মাত্রার প্রতি লক্ষ করবে না; এবং ইহসান ও উদারতার পরিচয় দেবে এবং খাওয়া-পরা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রতি অকুণ্ঠভাবে খরচ করবে।

স্ত্রীদের হাতখরচা আলাদাভাবে দেবে

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার বিভিন্ন ওয়াজে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এস্থলে সেরকম দু'য়েকটি কথা আরয করতে চাই। এসব বিষয়ে সাধারণত অবহেলা করা হয়ে থাকে।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, স্ত্রীর খরচা দেওয়ার অর্থ কেবল এ নয় যে, তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়ে যাবে। বরং খোরপোশের বাইরে হাতখরচা হিসেবেও কিছু দেওয়া চাই, যা সে স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছামত খরচ করতে পারবে। অনেকেই এদিকে লক্ষ করে না। তারা খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে। পকেটখরচা দেওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, পকেটখরচা দেওয়াও জরুরি। কেননা, মানুষের এমন কিছু প্রয়োজন থাকে, যা প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ হয়। কিংবা প্রকাশ করতে অস্বস্তি লাগে। কাজেই এজাতীয় প্রয়োজন সমাধার জন্য স্ত্রীর হাতে আলাদা কিছু টাকা-পয়সাও থাকা দরকার, যাতে সে অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়। এটাও খরচারই একটা অংশ। যারা এটা দেয় না তারা ভালো করে না।

খরচা দানে উদার হওয়া উচিত

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, খাওয়া-পরার ক্ষেত্রেও উদারতার পরিচয় দেওয়া চাই। কেবল 'প্রাণরক্ষা' পরিমাণ দেওয়ার চেষ্টা করবে না। অর্থাৎ যে পরিমাণ খেলে বেঁচে যাবে, মরবে না, অতটুকু দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। বরং ইহসান ও ঔদার্যের সাথে কাজ করবে। অর্থাৎ নিজ আয়-রোজগারের দিকে তাকিয়ে খোলামনে ব্যয় করবে। কোন কোন লোকের মনে এই খটকা জাগে যে, শরীআত এক দিকে অপব্যয় করতে নিষেধ করেছে অন্যদিকে ঘরের খরচায় উদার হতে বলেছে। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় কি? উভয়ের মধ্যে ভেদরেখা কি? কি পরিমাণ খরচ করলে তা অপব্যয় হয়ে যাবে আর কি পরিমাণ ব্যয় অপব্যয়ের মধ্যে পড়বে না?

কোন ব্যয় অপব্যয় নয়

হযরত থানভী (রহ.) ঘরের ক্ষেত্রে এ খটকার সমাধানে বলেন, এক ঘর তো এমন যা বাসযোগ্য; কিন্তু আরামদায়ক নয়, যেমন ঝুপড়ি ঘর বা ছাপড়া ঘর। এতেও মানুষ বাস করতে পারে, কিন্তু আরাম হয় না। এটা গৃহের সর্বনিম্ন স্তর এবং এটা নিঃসন্দেহে জায়েয। এর পরবর্তী স্তর হল এমন ঘর, যাতে কেবল থাকা নয়; বরং আরামে থাকা যায় যেমন পাকা ঘর। তাতে মানুষ আরামে বসবাস করতে পারে। ঘরে আরামের জন্য কোন বাড়তি খরচ করলে তাতে কোন দোষ নেই। এটা অপব্যয়ের মধ্যে পড়ে না। কেননা, সব মানুষ সমান নয়। কেউ তো ছাপড়া ঘরেই বেশ জীবন কাটিয়ে দিতে পারে কিন্তু কেউ কেউ তাতে থাকতে পারে না। তাদের পাকা দালানের দরকার পড়ে। তাতেও তার বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকা চাই। এরকম লোক যদি ঘর পাকা করে এবং তাতে বিজলী বাতি ও পাখা লাগিয়ে আরামের ব্যবস্থা করে, তবে তা অপব্যয় বলে গণ্য হবে না।

তৃতীয় স্তর হল আরামের সাথে সাজসজ্জাও থাকা, যেমন এক ব্যক্তির পাকা বাড়ি আছে তাতে প্লাস্টার করা আছে, বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখাও আছে, কিন্তু বাড়িটিতে রং করা হয়নি। বলা বাহুল্য রং না করলেও আরামে বাস করতে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু রং ছাড়া দেখতে ভালো লাগে না, সাজসজ্জা হয় না। সুতরাং সে ব্যক্তি যদি বাড়িটি সুদৃশ্য করার জন্য সেটিকে রং করে নেয়, তাতে শরীআতে কোন বাধা নেই। এটা জায়েয।

চতুর্থ স্তর হল প্রদর্শন। অর্থাৎ আরাম ও সাজসজ্জার অতিরিক্ত এমন ব্যবস্থা নেওয়া যাতে লোকে তাকে বিত্তবান মনে করে, চারদিকে তার নামডাক ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং বাড়ির

দিক দিয়ে সে সকলের উপরে থাকে। এটা হচ্ছে প্রদর্শন, মানুষকে দেখানোর চেষ্টা। এর ভেতর দিয়ে অহংকার প্রকাশ পায়। শরীআতে এটা জায়েয় নয়। স্পষ্টতই এটা অপব্যয় ও বাজে খরচ।

পোশাক ও খাদ্যের মধ্যেও এ রকম চার স্তরের খরচ হতে পারে, বরং সবকিছুতেই এটা প্রযোজ্য। এক ব্যক্তি দামি কাপড় কেবল এজন্য পড়ে যে, তাতে আরাম পাওয়া যাবে, দেখতে ভালো দেখা যাবে, ঘরের লোকজনের পসন্দ হবে এবং যাদের সাথে মেলামেশা হয় তারা খুশি হবে। তো এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু দামি পোশাকের উদ্দেশ্য যদি হয় অহমিকা প্রকাশ, যাতে লোকে তাকে টাকাওয়ালা মনে করে, সকলে সম্মান করে এবং সবার উপরে স্থান দেয়, তবে এটা প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। এটা জায়েয নয়। এভাবে হযরত থানভী (রহ.) অপব্যয় মিতব্যয়ের মধ্যে ভেদরেখা এঁকে দিয়েছেন। এর দ্বারা আমরা জানতে পারছি, নিজ প্রয়োজন সমাধা বা আরাম পাওয়া কিংবা মনোরঞ্জনের জন্য যে টাকা পয়সা খরচ করা হয় তা অপব্যয় নয়। এরূপ অর্থব্যয় শরীআতে অনুমোদিত।

একবার আমি অন্য এক শহরে ছিলাম। করাচিতে ফিরতে হবে। সময়টা ছিল গরমের। একজনকে এ. সি. কোচে টিকিট করে দিতে বললাম, তাকে টাকাও দিয়েছিলাম। পাশে এক ভাই বসা ছিল। তিনি বলে উঠলেন, সাহেব! আপনি টাকার অপচয় করছেন। এ. সি. কোচে ভ্রমণ অবশ্যই অর্থের অপচয়। বস্তুত এরূপ ধারণা তার একার নয়। অনেকেই মনে করে, প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ বিষয়ে ধারণা পরিস্কার থাকা দারকার। বিষয়টা বিচার করতে হবে সফরের উদ্দেশ্য দ্বারা । প্রথম শ্রেণীতে সফরের উদ্দেশ্য যদি হয় আরামে যাতায়াত করা, তবে তা কিছুতেই অপব্যয় নয়, যেমন গরমের দিনে এ. সি. কোচে চড়লে আরাম হয়। অনেকের পক্ষেই গরম সহ্য করা সম্ভব হয় না। তাদের যদি টাকা থাকে এবং কষ্ট লাঘবের জন্য তারা অতিরিক্ত টাকা খরচ করে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করে, তবে তা অপব্যয় বলে গণ্য হবে না। ফলে গুনাহও হবে না। পক্ষান্তরে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটার উদ্দেশ্যে যদি হয় বড়লোকি দেখানো, তবে তা অবশ্যই অপব্যয় ও অবৈধ। কারণ, তা প্রদর্শনেচ্ছা ও অহমিকা। পোশাক-পরিচ্ছদ ও পানাহারের ক্ষেত্রেও এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

প্রত্যেকের ঔদার্যের মাপকাঠি আলাদা

সুতরাং স্বামীর উচিত উপরিউক্ত স্তরসমূহের প্রতি লক্ষ রেখে স্ত্রীর খোরপোষে ঔদার্যের সাথে ব্যয় করা। উল্লেখ্য সকলের ঔদার্য এক মাপে

হতে পারে না। সামর্থ্যের প্রভেদ অনুযায়ী ব্যয়ের প্রশস্ততায়ও পার্থক্য হবে বৈকি! হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার তাঁর বয়ানে বলেন, ভাই, এক ব্যক্তি একদম একা মানুষ। তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কিছু নেই। সে ব্যক্তি তার ঘরে যদি মাত্র একটা বিছানা, একটা হাঁড়ি ও একটা থালা রাখে তাই তো যথেষ্ট। এর বেশি দিয়ে সে কী করবে। বেশি রাখলে তার পক্ষে তা প্রদর্শনই হবে এবং বাজে খরচা বলে গণ্য হবে। কিন্তু অপর যে ব্যক্তির ঘরে মেহমান আসে, যার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অনেক। তার প্রয়োজনও প্রচুর এবং সে হিসেবে তার প্রশস্ততা ও অকৃপণতার মাপকাঠি হবে স্বতন্ত্র। এরূপ ব্যক্তির ঘরে শত সেট বিছানা ও শত সেট তৈজসপত্র থাকলেও তাকে অতিরিক্ত ধরা হবে না এবং তা থেকে একটা বিছানা ও একটা প্লেটও বাজে খরচের মধ্যে পড়বে না। যেহেতু এর সবই তার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। বোঝা গেল, প্রত্যেকের ঔদার্যের মাপকাঠি আলাদা।

এই ঘরে আল্লাহকে খোঁজা আহাম্মকি!

অনেকে বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম ইবন আদহাম (রহ.) এর ঘটনা শুনে তা দ্বারা সব জায়গায় প্রমাণ পেশ করে। ঘটনা এই যে, তিনি ছিলেন বলখের বাদশা। একবার রাতের বেলা দেখলেন, প্রাসাদের ছাদে একটি লোক ঘুরছে। তাকে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, এই রাতে ছাদে উঠেছ কেন? এখানে কি করছ? সে বলল, আমার একটি উট হারিয়ে গেছে। সেটা খুঁজতে এসেছি। হযরত ইবরাহীম ইবন আদহাম (রহ.) বললেন, বেটা বেকুব! ছাদের উপর উট খুঁজছ? এখানে উট আসবে কোত্থেকে? লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন; এখানে উট থাকা সম্ভব নয়? তিনি বললেন কি করে সম্ভব? এখানে উট আসবে কি করে? তুমি একটা আস্ত বোকা! সে বলল, এই অট্টালিকায় যদি উট পাওয়া সম্ভব না হয় এবং এখানে উটের সন্ধান করলে সে যদি আহাম্মক হয়, তবে জেনে রেখ, এখানে বসে যে লোক আল্লাহকে খুঁজবে সেও একজন আহাম্মক। তুমি এখানে আল্লাহকে খুঁজছ। মনে রেখ, এখানে বসে আল্লাহকে পাওয়া কখনও সম্ভব নয়। আমি যদি আহাম্মক হয়ে থাকি তুমি আরও বড় আহাম্মক।

তার একথা হযরত ইবরাহীম ইবন আদহামের মনে লেগে গেল। তিনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। তখনই রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে বনের পথ ধরলেন। যাওয়ার সময় চিন্তা করলেন, এখন তো আল্লাহকে স্মরণ করেই জীবন কাটাব। আসবাব-পত্রের তেমন আর কি দরকার? কাজেই সঙ্গে নিলেন মাত্র

একটা বালিশ ও একটা পেয়ালা, যাতে পানাহারের দরকার হলে সেই পেয়ালায় তা করতে পারেন আর ঘুম ধরলে মাটিতে বালিশ রেখে ঘুমাতে পারেন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলেন, এক ব্যক্তি আঁজলা ভরে নদী থেকে পানি পান করছে। দেখে ভাবলেন, এই পেয়ালার তো কোন দরকার নেই। আমিও তো দু'হাতের আঁজলায় পানি পান করতে পারব। শুধু শুধু পেয়ালা কেন সঙ্গে নিচ্ছি। কাজেই তিনি সেটি ফেলে দিলেন এবং সামনে চলতে থাকলেন। আরও কিছুদূর চলার পর দেখলেন, একটি লোক মাথার নিচে হাত রেখে ঘুমাচ্ছে। তিনি ভাবলেন আমিও তো এরূপ করতে পারি। অহেতুক বালিশ টানা কেন? বালিশ তো আল্লাহ তা'আলা সঙ্গেই বানিয়ে দিয়েছেন; সেটিই ব্যবহার করব। সুতরাং তিনি বালিশটিও ফেলে দিলেন।

ভাবাচ্ছন্নতাজনিত কাজ অনুসরণযোগ্য নয়

এই ঘটনার কারণে কেউ কেউ মনে করে, পেয়ালার পেছনে টাকা খরচ করাও অপব্যয় এবং বালিশ কেনাও বাজে খরচ। এটা তাদের ভুল ধারণা। হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদের বড় ইহসান করেছেন। তিনি দুধ-পানি আলাদা করে আমাদের জন্য খাঁটি ভেজাল শনাক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, নিজেকে হযরত ইবরাহীম ইবন আদহাম (রহ.)-এর সাথে তুলনা করো না। নিজ অবস্থাকে তার অবস্থার সাথে মিলিয়ে ফেলো না। কেননা, একে তো তাঁর অবস্থাটা ছিল ভাবাচ্ছন্নতার অবস্থা। এরূপ অবস্থায় মানুষ যা করে তা অন্যের পক্ষে অনুসরণযোগ্য নয়। অনেক সময় মানবমনে বিশেষ কোন ভাব প্রবল হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়। তখন সে মাযুর হয়ে যায়। তাকে স্বাভাবিক মানুষরূপে গণ্য করা হয় না। তখন তার কাজকর্ম কথাবার্তা সব অস্বাভাবিক হয়ে যায় আর একারণেই এরূপ ব্যক্তির কাজ অন্যের জন্য অনুসরণযোগ্য থাকে না। হযরত ইবরাহীম ইবন আদহাম (রহ.) ও এ রকম অবস্থায় পৌছে গিয়েছিলেন। তাই তার এসব কাজ আমাদের ও আপনাদের জন্য অনুসরণযোগ্য নয়। এটা না বুঝলে মন-মস্তিষ্ক বেদিশা হয়ে যাবে। তখন মনে হবে, থালা-বাসন বিছানা-বালিশ সব ফেলে দাও, ঘর সংসার বিবি-বাচ্চা সব ছেড়ে দাও এবং বন-জংগলের দরবেশ হয়ে যাও। কেননা, তা না হলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। অথচ এটা দ্বীনে ইসলামের শিক্ষা নয়। মানুষের কাছে দ্বীনের দাবি এরকম নয়। বরং এটা হল ভাবাচ্ছন্নতা, যা হযরত ইবরাহীম ইবন আদহাম (রহ.)-এর মধ্যে দেখা দিয়েছিল।

ঔদার্য হতে হবে আয় অনুপাতে

দ্বিতীয়ত প্রত্যেকের প্রয়োজন তার অবস্থা অনুযায়ী অন্যের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই ঔদার্যের মাপকাঠিও প্রত্যেকের আলাদা হবে। যার আয়-রোযগার কম তার ঔদার্যের মাপকাঠি হবে একরকম, যার রোযগার মধ্যম, তার হবে অন্যরকম এবং যে বিত্তবান তারটা সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই ব্যয়ের প্রশস্ততা প্রত্যেকের আয়-রোযগার অনুপাতেই হতে হবে। এমন যেন না হয় যে, স্বামী বেচারার উপার্জন তো সামান্য ওদিকে স্ত্রী সর্বদা বিত্তবানদের অনুকরণ করতে চায়। তাদের ঘরে যে সব আসবাবপত্র দেখে নিজের ঘরেও তা আশা করে এবং একেকদিন স্বামীকে একেকটার ফরমায়েশ করে। এজাতীয় ফরমায়েশের কোন বৈধতা নেই। হ্যাঁ; স্বামীর কর্তব্য নিজ উপার্জন অনুযায়ী খরচে সংকীর্ণতা না করা; বরং স্ত্রীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যাপারে যথাসম্ভব মুক্তহস্ত থাকা।

আমাদের উপর স্ত্রীদের হক কী?

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

হযরত মু'আবিয়া ইবন হায়দা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একেকজনের উপর তার স্ত্রীর হক কী? তিনি বললেন, যখন তুমি খাবে তাকেও খাওয়াবে, যখন তুমি পরবে তাকেও পরাবে, তার চেহারায় মারবে না, তাকে মন্দ বলবে না এবং তাকে ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ত্যাগ করবে না। (আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১৮৩০; ইবন মাজাঃ হাদীছ নং ১৮৪০;)

বিছানা পৃথক করে দাও

পূর্বেও বলা হয়েছে, স্ত্রীকে কোন অন্যায়-অশ্লীল কাজ করতে দেখলে প্রথমে তাকে উপদেশ দেবে ও বোঝাবে। তাতে সে না ফিরলে তার বিছানা আলাদা করে দেবে এবং পৃথক বিছানায় শোওয়া শুরু করে দেবে। এ হাদীছে বিছানা পৃথক করার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, বিছানা আলাদা করার অর্থ এ নয় যে, তুমি ঘরের বাইরে চলে যাবে। বরং ঘরেই থাকবে এবং তাকে সতর্ক করার জন্য, এক ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্য কামরা বা বিছানা বদলে দাও আর এভাবে কিছু দিন তার থেকে আলাদা থাক।

উলামায়ে কিরাম এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে বিছানা আলাদা করা হলেও কথাবার্তা বিলকুল বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। উভয়ের মধ্যে এমন বিচ্ছিন্নতা জায়েয নয় যে, কেউ কাউকে সালাম পর্যন্ত দেবে না, সালামের জবাব দেবে না এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও বলবে না। শরীআতে এরূপ বিচ্ছিন্নতার কোন বৈধতা নেই।

চার মাসের বেশিকাল সফরে স্ত্রীর অনুমতি আবশ্যক

এ হাদীছের অধীনে ফুকাহায়ে কিরাম এ পর্যন্তও লিখেছেন যে, স্বামী চার মাসাধিক কালের জন্য সফরে যেতে চাইলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতি জরুরি, তার অনুমতি ছাড়া এরকম সফর জায়েয নয়। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম জাহানের সর্বত্র ফরমান জারি করে দিয়েছিলেন, যে সকল মুজাহিদ বাড়ির বাইরে থাকে, তারা যেন চার মাসের বেশি দিন বাইরে না থাকে। এ কারণেই ফকীহগণ লিখেছেন, কারও চারমাসের কম দিনের সফর প্রয়োজন হলে সেজন্য স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে না।

কিন্তু চার মাসের বেশি দিন বাইরে থাকতে হলে অবশ্যই স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে। তাতে সে সফর যত বড় নেক কাজেই হোক না কেন। এমনকি হজ্জের সফরও যদি হয়। যদি হজ্জের সফর থেকে চার মাসের মধ্যে ফিরে আসতে পারে, তবে তো স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে না, কিন্তু ইচ্ছাকৃত আরও বেশিদিন থাকতে চাইলে অনুমতি নেওয়া জরুরি। তাবলীগ, দাওয়াত ও জিহাদের সফরেও এই একই বিধান। এবার চিন্তা করুন, এসব বরকতপূর্ণ সফরেও যখন চার মাসের বেশি দিন বাইরে থাকতে হলে স্ত্রীর অনুমতি আবশ্যক হয়, তখন যারা চাকরি-বাকরি করতে, পয়সা কামাতে বাইরে যেতে চায়, তাদের জন্য কেন এ বিধান প্রয়োজন হবে না? তাদের তো আরও বেশি গুরুত্বের সাথে স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া গেলে তাতে তার অধিকার খর্ব করা হবে এবং শরীআত অনুযায়ী তা নাজায়েয হবে। ফলে এরূপ সফরে সে গুনাহগার হবে।

উৎকৃষ্ট লোক কারা

পরবর্তী হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ মুমিন সে যে চরিত্রে সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে শ্রেষ্ঠ।

(তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৮৩ : মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৭০৯৫)

এ হাদীছ দ্বারা বোঝা গেল, পূর্ণাঙ্গ ঈমানের দাবি হল, মানুষ অন্যের প্রতি মধুর আচরণ করবে এবং আচার-আচরণে উত্তম চরিত্রের পরিচয় দেবে এবং আরও জানা গেল মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট সে, যে নিজ স্ত্রী ও নারীদের পক্ষে ভালো এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে।

বর্তমান যুগে সচ্চরিত্র

বর্তমানে সব কিছুরই অর্থ বদলে গেছে, সব কিছুর মর্ম উল্টে গেছে। হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, পূর্ব যুগের বিপরীতে বর্তমান কালে প্রতিটি জিনিস উল্টে গেছে। এমনকি প্রদীপের ছায়াও। আগে তো বাতির নিচে অন্ধকার হত আর এখন বাল্বের উপরে অন্ধকার থাকে। আরও বলতেন, বর্তমানে সব কিছুর মূল্যায়নও বদলে গেছে এবং অর্থ ও মর্মও পাল্টে গেছে। এমনকি আখলাক চরিত্রের অর্থেও পরিবর্তন এসেছে। এখন বাহ্যিক কিছু আচরণকে চরিত্র নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন সাক্ষাতকালে মুখে হাসি ফোটাল, কিছু সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলে দিল, বলল আপনার সাথে সাক্ষাত হওয়ায় খুব আনন্দিত হয়েছি, আপনাকে বড় ভালো লেগেছে ইত্যাদি, ব্যস সে 'চরিত্রবান'-এর সনদ পেয়ে গেল। অথচ বাস্তবে এমনও হতে পারে যে, সে মুখে তো ভদ্র আচরণ করেছে, কিন্তু তার অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে, মনে ঘৃণার তুফান বইছে। তা সত্ত্বেও সে একজন চরিত্রবান। বর্তমানে তো এটা রীতিমত একটা পাড়াশোনার বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে যে, অন্যের সাথে এমন ব্যবহার কিভাবে করা যাবে, যাতে সে তাকে পসন্দ করে ফেলে, তার ভক্ত ও গুণমুগ্ধ হয়ে যায়। অন্যকে কিভাবে ভক্ত বানানো যাবে, কি পন্থা অবলম্বন করলে অন্যকে প্রভাবিত করা যাবে। এ সম্পর্কে বইপত্রও লেখা হয়েছে ও হচ্ছে। সুতরাং সবটা মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে অন্যকে ভক্ত বানানোর প্রতি। কিভাবে অন্যে আমাকে পসন্দ করবে, কি করলে অন্যে ভালো বলবে, ব্যস এটাই এখন একমাত্র আরাধ্য হয়ে গেছে এবং আধুনিককালে এরই নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে আখলাক-চরিত্র।

ভালোভাবে বুঝে রাখুন, আখলাকের সাথে এর কোন সম্বন্ধ নেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে আখলাক বলেছেন তা এটা

নয়। এসব লৌকিকতা, প্রদর্শনেচ্ছা এবং অন্যকে ভক্ত বানানোর ছলাকলা। এটা প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ, খ্যাতির আসক্তি, যা আখলাক নয় আদৌ, বরং আত্মিক ব্যাধিবিশেষ। এটা অর্জনের বিষয় নয়, বরং চিকিৎসার মাধ্যমে অপসারণের বিষয়। সচ্চরিত্রের সাথে এর বিন্দু-বিসর্গও সম্পর্ক নেই

সচ্চরিত্র হল অন্তরের একটা অবস্থা

প্রকৃতপক্ষে সচ্চরিত্র অন্তরের একটা অবস্থার নাম, যার প্রকাশ মানুষের অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা হয়। সে অবস্থা এই যে, অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দয়া ও ভালোবাসা থাকবে। এতে দোস্ত-দুশমন ও মুসলিম-অমুসলিমের কোন প্রভেদ থাকবে না। তার দৃষ্টি থাকবে কেবল এই দিকে যে, সকলে আমার মালিক ও মনিবের সৃষ্টি। তাই তাদেরকে ভালোবাসা আমার কর্তব্য এবং তাদের প্রতি সদয় আচরণ আমার দায়িত্ব। প্রথমে অন্তরে এ চেতনা সৃষ্টি হয় তারপর সে অনুযায়ী কাজ করা হয়। ফলে সৃষ্টির প্রতি কল্যাণকামিতাসুলভ আচরণ করা হয়। এর ফলে মুখে যে হাসি ফোটে তা নিখাদ সৃষ্টিপ্রেম থেকেই উৎসারিত হয়। সে হাসি কৃত্রিম হয় না এবং তার উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের ভক্ত-অনুরক্ত বানানো হয় না। বরং তা নিজ প্রাণের দাবি ও হৃদয়ের অদম্য প্রেরণাজাত এক অনিবার্য কর্মানুষ্ঠান হয়ে থাকে। সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো আখলাক ও বর্তমানে প্রচলিত ভদ্রতার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এ প্রভেদ অনুধাবন করা চাই।

আখলাক অর্জনের উপায়

সে আখলাক অর্জনের জন্য কেবল বই-কিতাব পড়া বা কেবল ওয়াজ-নসীহত শোনা যথেষ্ট নয়। এর জন্য দরকার কোন মুরুব্বীর সাহচর্য গ্রহণ, কোন মুসলিহ (সংশোধক–সংস্কারক) এর অনুসরণ। বুযুর্গানে দ্বীনের মাধ্যমে যে তাসাওউফ ও পীর-মুরীদীর ধারা চলে আসছে তার উদ্দেশ্য কেবল এটাই। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে যাতে মানুষের ভেতর থেকে মন্দ চরিত্রের অপসারন ঘটে ও সেখানে উত্তম চরিত্র জন্ম নেয়।

মোদ্দাকথা, ঈমানে কামেল ব্যক্তি কেবল সেই, যার আখলাক-চরিত্র ভালো, যার অন্তরে শুদ্ধ-সঠিক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং যথার্থ কথা ও কাজের মাধ্যমে তার প্রকশ ঘটে। আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে আমাদের সকলকে কামেল ও পূর্ণাঙ্গ মু'মিন বানিয়ে দিন। আমীন।

আল্লাহর দাসীদেরকে মের না

وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

ইয়াস ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবূ যুবাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে মের না। পরে উমর (রাযি.) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলারা তাদের স্বামীদের উপর উদ্ধত হয়ে উঠেছে, তখন তিনি মারার অনুমতি দিলেন। তারপর বহু নারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে পরিবারে এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে লাগল। এ অবস্থা দেখে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বহু নারী মুহাম্মাদের পরিবারে এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নালিশ করছে। বস্তুত ওই সকল পুরুষ তোমাদের মধ্যে ভালো লোক নয়।

(আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১৮৩৪; ইবন মাজাঃ হাদীছ নং ১৯৭৫)

বোঝা গেল, স্ত্রীকে মারা ভালো কাজ নয়। এ হাদীছে তাদেরকে মারতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নিষেধাজ্ঞা যারা সরাসরি শুনেছিলেন, তাদের জন্য এটা মানা ফরয ছিল। কাজেই স্ত্রীকে মারা তাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়। কোন অবস্থাতেই তাদের জন্য মারা জায়েয থাকেনি।

এস্থলে হাদীছ সম্পর্কে একটা বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। হাদীছের এক হল মূল বক্তব্য, যা সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছেন, আরেক হল তার দীর্ঘ সনদযুক্ত বর্ণনা যা কিতাবসমূহে আমরা পড়ে থাকি। তাতে প্রথমে সনদ বর্ণনা করা হয়, যেমন- حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا 'আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন অমুক'। এভাবে সনদ বা বর্ণনা পরম্পরা উল্লেখ করার পর হাদীছের মূল বাণী ব্যক্ত করা হয়। সনদযুক্ত এরূপ হাদীছকে "জান্নী" বলা হয়। অর্থাৎ বিশুদ্ধতার এমন প্রবল ধারণা সম্বলিত হাদীছ, যাতে কিছুটা সন্দেহেরও অবকাশ থাকে, যদিও তা দুর্বল মাত্রায় (সেই দুর্বল সন্দেহটুকু হয়

সনদের কারণে। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সমস্ত শর্ত পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধ্বে নয়, তাই অসম্ভব নয়, হয়ত কারও দ্বারা কোন ভুল ঘটে গেছে। কিন্তু শর্ত পূরণ হওয়ার কারণে ভুল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং সে কারণে এরূপ হাদীছকে বিশুদ্ধ ধরে নেওয়া হয়। দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্মেও বিশুদ্ধতার প্রবল ধারণাযুক্ত বিষয়কে প্রামাণিক মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তাতে ভুলের অবকাশকে উপেক্ষা করা হয়)। তাই এরূপ হাদীছের অনুসরণ করা ওয়াজিব। অনুসরণ না করলে গুনাহ হয়। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম যেহেতু সে বাণী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছিলেন, তাই তাদের ক্ষেত্রে তো ভুলের সেই দুর্বল সম্ভাবনাটুকুও নেই। তাদের পক্ষে তা সন্দেহাতীত সত্য। তাই তাদের জন্য তা মানা ওয়াজিব নয় বরং ফরয ছিল এবং অমান্য করলে কেবল গুনাহ নয়; বরং কুফর অনিবার্য হয়ে যেত।

আমরা যদি সেকালে জন্ম নিতাম এ আক্ষেপ যথার্থ কি?

অনেক সময় আমাদের অন্তরে এই আক্ষেপ জাগে যে আহা আমাদেরও জন্ম যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে হত! সে যামানার বরকত যদি আমরাও লাভ করতে পারতাম। এটা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতাসুলভ কথা। কেননা, বিষয়টা তো আল্লাহ তা'আলার হিকমতের সাথে সম্পৃক্ত। সব বিষয়ে তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী ফয়সালা নিয়ে থাকেন। আমাদের জন্ম এ যুগে হওয়ার মধ্যেও তাঁর হিকমত নিহিত আছে। আমাদের কল্যাণ এতেই। কেননা, সেকালে জন্ম হলে আল্লাহই জানেন, আমরা কোন কাতারে থাকতাম এবং ধ্বংসের কোন গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতাম। কেননা, তখন ছিল ঈমান আনা না আনা এবং ঈমান ধরে রাখতে পারা না পারার অগ্নি পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অত সহজ কথা নয়।

সাহাবায়ে কিরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে প্রাণোৎসর্গমূলক আচরণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন, তার কোন নজীর কেউ কোনওকালে দেখেছে কি ?

বস্তুত এটা ছিল তাদেরই কৃতিত্ব এবং তারই বদৌলতে মর্যাদার এতটা উচ্চসানে তাঁরা পৌঁছতে পেরেছিলেন। আমাদের মত যারা আরামপ্রিয় ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের প্রত্যাশী তারা সেকালে জন্ম নিলে আল্লাহ তা'আলাই জানেন তাদের পরিণাম কী হত! এটা তো আমাদের প্রতি তাঁর অনেক বড় মেহেরবানী যে, তিনি সে পরিণাম থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন এবং আমাদেরকে এমন এক যুগে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যে যুগে আমাদের জন্য

সব কিছুই সহজ হয়ে গেছে। আজ আমরা এক-একটা হাদীছ সম্পর্কে রায় দেই যে, এটি 'জান্নী' (অর্থাৎ, এর বিশুদ্ধতা প্রবল ধারণাভিত্তিক) আর জন্নী হওয়ার কারণে কেউ তা অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে না, কেবল গুনাহগারই হবে। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে ব্যাপারটা তো এরকম ছিল না। তখন কেউ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিঃসৃত কোন হুকুম যদি অস্বীকার করত আর বলত, আমি এটা করব না। তবে সে সে কাফের হয়ে যেত।

তারা বাঘিনী হয়ে গেছে

সুতরাং যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন স্ত্রীদেরকে মের না, তখন মারার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করে দেওয়ার পরও কোন সাহাবী তা অমান্য করবেন সে প্রশ্নই ছিল না। তাঁরা তো সে রকম ছিলেনই না। সুতরাং কেউ আর তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলল না। এভাবে যখন স্ত্রীকে মারা একদম বন্ধ হয়ে গেল, তার কিছুদিন পরই হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ

নারীরা তো তাদের স্বামীদের উপর বাঘিনী হয়ে গেছে। কেননা, তিনি যখন মারতে নিষেধ করে দিয়েছেন, তখন আর কেউ স্ত্রীকে মারে না। মারবে কি মারার কাছেও যায় না। আর এ না মারার পরিণামে তারা উদ্ধত হয়ে গেছে। বাঘিনী হয়ে গেছে। এখন তারা স্বামীর অধিকারের তোয়াক্কা করে না। তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। সুতরাং আপনি বলে দিন, এ অবস্থায় আমরা কী করব? বর্ণনাকারী বলেন–

فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ

'তিনি তাদেরকে মারার অনুমতি দিলেন অর্থাৎ স্ত্রী যখন স্বামীর অধিকার খর্ব করবে,আর সে অবস্থায় মারা ছাড়া কোন উপায় না থাকবে তখন মারারও অনুমতি আছে। এ অনুমতি দানের ফল দাঁড়ালো এই যে, কিছুদিন যেতে না যেতেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারে একের পর এক মহিলারা আসতে লাগল এবং তারা অভিযোগ জানাতে লাগল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারার অনুমতি দিয়েছেন, স্বামীরা তার অসদ্ব্যবহার করছে এবং তারা কথায় কথায় স্ত্রীদের মারধর করছে।

তারা ভালো মানুষ নয়

এ পরিস্থিতিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন

لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

তিনি নিজের নাম নিয়ে বললেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ঘরে একের পর এক মহিলারা আসছে আর নিজ-নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তারা স্ত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করছে এবং তাদেরকে ইচ্ছামত মারছে। সুতরাং তোমরা ভালোভাবে জেনে রেখ, যারা এভাবে মারধর করছে তোমাদের মধ্যে তারা ভালো মানুষ নয়।

অর্থাৎ, বউ পেটানো ভালো মানুষ ও ভালো মুসলিমের কাজ নয়। এর দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার করে দিলেন যে, নিরুপায় অবস্থায় যদিও স্ত্রীকে মারা জায়েয আছে এবং তাও যাতে বেশি ব্যথা না পায় এবং শরীরে দাগ না পড়ে, এই শর্তে, কিন্তু তথাপি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত হল স্ত্রীকে না মারা। তাঁর প্রাণের ইচ্ছা ছিল কোন স্বামী তার স্ত্রীদের গায়ে হাত তুলবে না। সুতরাং উম্মুল মু'মিনীন যারা ছিলেন, তারা আমাদের জানাচ্ছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবনেও তাদের কারও গায়ে কখনও হাত তোলেননি। সুতরাং সুন্নতের দাবি এটাই।

জগতের সর্বোত্তম জিনিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সমগ্র দুনিয়া উপভোগের জিনিস। আর তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উপভোগের জিনিস হল নেককার নারী।

(মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৬৮; নাসাঈ, হাদীছ নং ৩১৮০;
মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৬২৭৯)

مَتَاعٌ বলা হয় এমন জিনিসকে যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, লাভবান হয়, ও আনন্দ উপভোগ করে। দুনিয়াকে مَتَاعٌ বলা হয়েছে এ কারণে যে, দুনিয়া দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করে। দুনিয়াকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের উপকারের জন্য।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি দুনিয়ার সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (বাকারা : ২৯)

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রয়োজন সমাধার জন্য, তোমাদের উপকার লাভের জন্য ও তোমাদের উপভোগের জন্য সৃষ্টি করেছেন'। আর দুনিয়ায় যা দ্বারা উপকার লাভ হয়, নেক স্ত্রী তার মধ্যে সেরা। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে হতে আমার কাছে প্রিয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে নারী ও সুগন্ধীকে আর আমার নয়নপ্রীতি রাখা হয়েছে নামাযের ভেতর।

(বায়হাকী, হাদীছ নং ১৩২৩২, ৭খ, ৭৮ পৃ: যাদুল মা'আদ, ৪খ, ৩০৭: নায়লুল-আওতার ১খ, ৩৩০: কাশফুল খাফা, ১খ , ৩৪০: কানযুল উম্মাল, হাদীছ নং ১৮৯১৩, ৭ খ, ২৮৭)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কী সুন্দর বলেন, তোমাদের দুনিয়ার মধ্য হতে এরূপ বলেছেন এ কারণে যে, তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

দুনিয়ার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক! আমি তো এক আরোহীর মত যে কোন গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণের যাত্রা বিরতি দিয়েছে তারপর সে আবার যাত্রা শুরু করে দিল এবং গাছটি ছেড়ে গেল।

(তিরমিযী হাদীছ নং ২২৯৯; মুসনাদে আহমাদ হাদীছ নং ২৬০৮)

এ কারণেই তিনি এ হাদীছে বলেছেন তোমাদের দুনিয়া। তিনি বলেন, তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে তিনটি জিনিসকে আমার প্রিয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো আমি ভালোবাসি। তা হল ক. নারী খ. সুগন্ধী ও গ. ঠাণ্ডা পানি। বোঝা গেল, দুনিয়ার নি'আমতসমূহের মধ্যে এ তিনটি সেরা।

ঠাণ্ডা পানি অনেক বড় নিয়ামত

ঠাণ্ডা পানি যে কতবড় নি'আমত তা এর দ্বারাই বুঝে আসে। কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনও বিশেষ কোন খাদ্যকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন বা কাউকে

ফরমায়েশ করেছেন যে, আমার জন্য অমুক খাবার রান্না কর। বরং যখন যা তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছে তাই খেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ঠাণ্ডা পানির প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর জন্য মদীনা থেকে দুই-আড়াই মাইল দূর থেকে গারস কূয়ার পানি আনা হত। কেননা, সে কুয়ার পানি ঠাণ্ডা ও মিষ্টি ছিল। তিনি ওসিয়াত করেছিলেন, ওফাতের পর তাকে যেন সেই কুয়ার পানি দ্বারা গোসল দেওয়ানো হয়।

(সুবুলুল-হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭খ, ২২১; তাবাকাতে ইবন সাদ, ১খ, ১৮৫ পৃঃ)

ঠাণ্ডা পানি পান কর

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বড় চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি একবার হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলেন, মিয়াঁ আশরাফ আলী! যখনই পানির পিপাসা পাবে, খুব ঠাণ্ডা পানি পান করবে, যাতে প্রতিটি শিরা-উপশিরা থেকে আল্লাহর শুকর বের হয়ে আসে । কেননা, যখনই ঠাণ্ডা পানি পান করবে তাতে প্রতিটি শিরা-উপশিরা সিঞ্চিত ও শীতল হয়ে যাবে। ফলে আরামে শান্তিতে যবান থেকে আল-হামদুলিল্লাহ বের হয়ে আসবে এবং শিরায়-শিরায় কৃতজ্ঞতার স্পন্দন অনুভব করবে।

মন্দ নারী থেকে পানাহ চাও

যা হোক, হাদীছ দ্বারা জানা গেল, উৎকৃষ্ট তিনটি জিনিসের প্রথম হল নেক স্ত্রী স্ত্রী নেক না হলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে রকম স্ত্রী থেকে পানাহ চেয়েছেন। তাঁর দু'আয় আছে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ عَنْ اِمْرَاَةٍ تُشَيِّبُنِیْ قَبْلَ الْمَشِيْبِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُوْنُ عَلَیَّ وَبَالًا

হে আল্লাহ! আমি এমন স্ত্রী হতে পানাহ চাই, যে আমাকে বার্ধক্যের আগেই বুড়ো বানিয়ে দেবে এবং তোমার কাছে এমন সন্তান হতেও পানাহ চাই, যে আমার জন্য আপদ হয়ে দাঁড়াবে।

(আল-মুজামুল-আওসাত ১৩খ, ৪৩৬, হাদীছ নং ৬৩৫৭;
মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১১খ, ৫৮, হাদীছনং ১৭৪২৯;
হান্নাদ ইবনুস-সারী আয্ যুহদ, ৩খ, ১১৭, হাদীছ নং ১০৩৩)

সুতরাং নিজের বা নিজ সন্তানের জন্য নেক স্ত্রী সন্ধান করা চাই, যে দীন ও দুনিয়ার জন্য কল্যাণপ্রসূ হবে, বরকত ও সফলতার কারণ হবে। আল্লাহ না

করুন স্ত্রী যদি নেক না হয়, তবে সে সাক্ষাত আযাব হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই ভালো স্ত্রী যার নসীব হয়েছে, তার উচিত সে স্ত্রীর কদর করা, কোনও রকমে তার অমর্যাদা না করা। প্রকৃত কদর হল তার সমস্ত হক আদায়ে যত্নবান থাকা ও তার সাথে প্রীতিকর আচরণ করা। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে এসব নির্দেশনা অনুযায়ী চলার তাওফীক আমাদের সকলকে দান করুন আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত খণ্ড : পৃষ্ঠা : ৪-৭৫

শরী'আতের দৃষ্টিতে স্বামীর অধিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক, যেহেতু আল্লাহ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং নেককার নারীগণ হয় আনুগত্যকারিণী এবং (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে (নিজ সতিত্ব ও স্বামীগৃহের) হেফাজতকারিণী, যেহেতু আল্লাহ তাদের হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। (সূরা নিসা : ৩৪)

পূর্বের পরিচ্ছেদে স্ত্রীর হকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল এবং একজন স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রতি কি রকম আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শরীআত তো আল্লাহ প্রদত্ত বিধিব্যবস্থা। তা কখনও একদেশদর্শী রায় দেয় না, বরং তা উভয় পক্ষের প্রতি সমান দৃষ্টি দেয়। উভয়ের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করে। সুতরাং শরী'আত যেমন স্বামীর উপর স্ত্রীর বহু অধিকার আরোপ করেছে, তেমনি স্ত্রীর উপরও স্বামীর বিভিন্ন অধিকার সাব্যস্ত করে দিয়েছে। কুরআন ও হাদীছে উভয় প্রকার অধিকার আদায়ের প্রতি জোর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত এমনই ভারসাম্যমান!

আজ চারদিকে কেবল আপন অধিকারের দাবি

প্রত্যেকে যেন নিজ-নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকে, শরী'আতে মূলত এদিকেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, অধিকার আদায়ের দাবিতে সোচ্চার হতে বলা হয়নি। অথচ আজকের বিশ্ব হল অধিকারের দাবিসর্বস্ব বিশ্ব। প্রত্যেকের নজর নিজ-নিজ অধিকারের দিকে। তার দাবিতে মাঠে নামছে, আন্দোলন করছে, মিছিল-মিটিং করছে, হরতাল দিচ্ছে। এভাবে সারা বিশ্বে অধিকার আদায়ের দাবিতে নানামুখী সংগ্রাম চলছে। এর জন্য যথারীতি বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন গঠিত হচ্ছে। নাম দেওয়া হচ্ছে 'অমুক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি'। কিন্তু আসল যে কাজ দায়িত্ব আদায় তা নিয়ে কোন কমিটি নেই। আমার উপর যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তা ঠিক ঠিক আদায় করছি কিনা, তা নিয়ে কারও কোন চিন্তা নেই। শ্রমিক বলছে, আমাকে আমার অধিকার দাও, পুঁজিপতি বলছে, আমার অধিকারের নিশ্চয়তা দাও, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজনও চিন্তা করছে না আমি আমার দায়িত্ব কতটুকু আদায় করছি। পুরুষ বলছে, আমার অধিকার আমি বুঝে নিতে চাই, নারী বলছে, আমার অধিকার বুঝিয়ে দাও। উভয় পক্ষ হতেই চেষ্টা-তদবির চলছে, লড়াই-সংগ্রাম করা হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর কোন বান্দা চিন্তা করছে না যে, আমার উপর যে দায়িত্ব-কর্তব্য ন্যস্ত রয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে আদায় করছি তো?

প্রত্যেকে নিজ দায়িত্ব আদায় করুক

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার সারকথা হল, প্রত্যেকে নিজ-নিজ দায়িত্ব আদায়ে মনোযোগী হোক। প্রত্যেকে নিজ-নিজ দায়িত্ব আদায় শুরু করে দিলে আপনা-আপনিই সকলের অধিকার আদায় হয়ে যাবে। শ্রমিক নিজ দায়িত্ব পালন করলে পুঁজিপতি ও মালিকের অধিকার আদায় হয়ে যাবে, পুঁজিপতি নিজ দায়িত্ব পালন করলে শ্রমিকের অধিকার আদায় হয়ে যাবে। স্বামী নিজ দায়িত্ব পালন করলে স্ত্রীর অধিকার আদায় হয়ে যাবে এবং স্ত্রীও যদি নিজ দায়িত্ব পালন করে, তবে স্বামীর হক আদায় হয়ে যাবে। শরীআতের মূল দাবি এটাই যে, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্ব সচেতন হও, নিজ-নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করে ফেল।

প্রথমে নিজেকে সংশোধনের ফিকির কর

সমাজের আজব অবস্থা। সর্বত্র উল্টো স্রোত বইছে। কেউ যখন ইসলাহ ও সংশোধনের আওয়াজ তোলে তার দৃষ্টি থাকে অন্যের দিকে। অন্যে নিজেকে

সংশোধনের কাজ শুরু করে দিক। নিজের ব্যাপারে চিন্তা নেই। আমার মধ্যেও তো কত ত্রুটি আছে, আমিও কোনও না কোনও ভুলের মধ্যে আছি। কাজেই আমি কেন নিজেকে সংশোধনের কথা ভাবি না। অথচ কুরআন মাজীদের ইরশাদ,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা কর। তোমরা হিদায়াত পেয়ে গেলে যারা বিপথগামী হবে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' (মায়িদাঃ ১০৫)

অর্থাৎ চিন্তা করে দেখ তোমার উপর কি দায়িত্ব-কর্তব্য ন্যস্ত আছে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে তোমার প্রতি কি যিম্মাদারি অর্পিত হয়েছে এবং দ্বীন ও ঈমান, শরী'আত ও আখলাক তোমার কাছে কি কি দাবি জানায়? সেই দাবি, সেই যিম্মাদারি ও সেই দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাক। অন্য কেউ যদি বিপথগামিতার শিকার হয়, সে যদি নিজ দায়িত্ব পালনে রত না থাকে, তবে তার ক্ষতি তোমাকে ভোগ করতে হবে না, যদি তুমি নিজ দায়িত্ব যথারীতি আনজাম দিয়ে থাক।

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার ধরন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাদানের ধরন লক্ষ করুন। তাঁর আমলে মানুষের থেকে যাকাত উসূল করার জন্য 'আমেল বা দায়িত্বশীল লোক যেত এবং তারা গিয়ে যাকাত উসূল করে নিয়ে আসত। সেকালে মানুষের সম্পদ বলতে সাধারণত গবাদি পশুই হত, অর্থাৎ উট, ছাগল-গরু ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আমেল পাঠানোর সময় তাদেরকে যাকাত উসূলের জন্য যে নীতিমালা ও উপদেশ দান করতেন, তার মধ্যে একথাও থাকত যে,

لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي زَكَاةٍ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ

'অর্থাৎ তোমরা মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে যাকাত উসূল করবে, কোনও এক জায়গায় বসে তাদেরকে সেখানে যাকাতের মাল নিয়ে আসতে বাধ্য করবে না'। (আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৩৫৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৬৭২৮)

আরও বলতেন,

اَلْمُتَعَدِّيْ فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

'যে ব্যক্তি যাকাত উসূলে সীমালংঘন করে, অর্থাৎ প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা বেশি গ্রহণ করে কিংবা মানের দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট মাল দিতে বাধ্য করে, সে যাকাত অনাদায়ীর সমতুল্য, অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার সমান গুনাহগার সেও হবে।

(তিরমিযী, হাদীছ নং ৫৮৫; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১৩৫২; ইবন মাজা, হাদীছ নং ১৭৯৮)

এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে তো 'আমেলদেরকে সতর্ক করতেন তারা যেন মানুষকে অহেতুক কষ্ট না দেয় এবং যে পরিমাণ ও যে মানে যাকাত ওয়াজিব হয় তারচে' বেশি গ্রহণ না করে। সে রকম করলে কিয়ামতের দিন তাদেরকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। অন্যদিকে যাদের কাছে 'আমেলদেরকে পাঠানো হত তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল,

إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًى

'যাকাত উসূলকারীগণ তোমাদের কাছে পৌঁছার পর তারা যেন তোমাদের থেকে সন্তুষ্ট অবস্থায়ই ফিরে যেতে পারে।'

(তিরমিযী, হাদীছ নং ৫৮৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৮৪৩৪; সুনানে দারিমী, হাদীছ নং ১৬১০)

অর্থাৎ তোমাদের কর্তব্য তাদেরকে খুশি করে দেওয়া। এমন কোন আচরণ করবে না যাতে তারা নারাজ হতে পারে, কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা আমার প্রেরিত এবং আমার প্রতিনিধি। তাদেরকে নারাজ করা আমাকেই নারাজ করার নামান্তর।

চিন্তা করুন, 'আমেলদেরকে হুকুম করা হয়েছে তারা যেন বাড়াবাড়ি ও জোর-জুলুম না করে, অন্যদিকে যাকাতদাতাদের বলা হয়েছে, তারা যেন 'আমেলদেরকে খুশি করে দেয়। এভাবে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা হচ্ছে। তিনি যাকাতদাতাদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হওয়ার দাওয়াত দেননি। বলেননি যে, তোমারা যাকাত উসূলকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোল,যাতে তারা তোমাদের অধিকার পদদলিত করতে না পারে। এ লক্ষে কমিটি গঠন কর, সংস্থা দাঁড় করাও। কেননা, এটা প্রশংসনীয় নীতি নয়।এটা আত্মকলহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বরং শরী'আতে মানুষকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ে যত্নবান হওয়ার প্রতিই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা কর ও তা আদায়ে মনোযোগী হও। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। সেখানে যাতে ঠিক-ঠিক জবাব দেওয়া যায় সেই চিন্তা মাথায় রেখে কাজ কর। এটা সমগ্র দ্বীনের মূল দর্শন। এটা ইসলামী চেতনা নয় যে, প্রত্যেকে নিজ অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হবে অন্যদিকে দায়িত্ব কর্তব্য পালনে থাকবে উদাসীন।

দাম্পত্য জীবন যেভাবে সুষ্ঠু হতে পারে

দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নীতিই অবলম্বন করেছেন। উভয়কে তাদের আপন আপন দায়িত্ব কর্তব্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বামীকে বলা হয়েছে, তোমার দায়িত্ব এই এই এবং স্ত্রীকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমার দায়িত্ব এই এই। প্রত্যেকে নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে। প্রকৃতপক্ষে জীবনতরী এভাবেই সঠিক পথে চলতে পারে। প্রত্যেকে আপন দায়িত্ব পালনের ফিকিরে থাকলে এবং অন্যের অধিকারের মর্যাদা রক্ষা করলেই জীবন শান্তিময় হতে পারে। অন্যের অধিকার আদায়ে যতটা যত্নবান থাকবে সেই পরিমাণে নিজ অধিকার প্রাপ্তিতে নজর না দিলেই ফ্যাসাদের সম্ভাবনা কম। দাম্পত্য জীবন সুখী ও শান্তিপূর্ণ কেবল এ পন্থাতেই হতে পারে। আমাদের জীবন যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দর হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দিকে কতই না সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন! কুরআন ও হাদীছ এ সম্পর্কিত নির্দেশনায় ভরা। কার কী দায়িত্ব তা বিস্তারিতভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে যাতে সে সব দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে আদায় করা হয়, এবং কোনওরূপ অবহেলা প্রদর্শন করা না হয়। অবহেলা করা হলে দাম্পত্য সম্পর্ক শিথিল হয়ে যেতে পারে। দেখা দিতে পারে ভাঙন, আর তাই যদি হয় তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিবাহ বিচ্ছেদ নিতান্তই অপসন্দ। এতটা অপসন্দ দুনিয়ার আর কোন বিচ্ছেদ নয়; কোন কিছুই তাদের কাছে এত বেশি ঘৃণ্য নয়।

ইবলীসের দরবার

এক হাদীছে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইবলীস সাগরে তার সিংহাসন স্থাপিত করে এবং সেখানে তার দরবার

বসায়। দুনিয়ায় তার যত চেলা আছে, যারা তার বিভিন্ন টিম পরিচালনা করে ও তার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে, তারা সেই দরবারে উপস্থিত হয়। তাদেরকে তার সামনে নিজ নিজ দায়িত্বের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি কি দায়িত্ব পালন করেছ? প্রত্যেকে আপন-আপন কাজের বিবরণ পেশ করে। সিংহাসনে বসে ইবলীস সে সব শোনে। কেউ এসে শোনায়, আমি আজ এক ব্যক্তিকে দেখলাম, নামায আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছে। আমি তার পেছনে লাগলাম। তাকে এমন কাজে জড়িয়ে দিলাম, যদ্দরুন সে আর নামায পড়তে পারল না। ইবলীস শুনে খুশি হয়। তাকে বাহ্বা জানায়। বলে, তুমি বেশ কাজ করেছ। কিন্তু খুব যে বেশি খুশি হয় তা নয়। দ্বিতীয় অনুচর এসে বলে, আমি অমুককে দেখলাম, ইবাদতের নিয়তে ঘর থেকে বের হয়েছে। আমি তাকে আটকে দিলাম। ফলে ইবাদতে যেতে পারেনি। ইবলীস খুশি হয়। বলে তুমি বেশ কাজ করেছ। এভাবে প্রত্যেক অনুচর নিজ-নিজ কার্যবিবরণী পেশ করে এবং ইবলীস খুশি হয়ে বাহ্বা জানায়। পরিশেষে এক অনুচর জানায়, এক দম্পতি সুখ-শান্তিতে জীবন-যাপন করছিল। তাদের মধ্যে তেমন ঝগড়া-ফাসাদ ছিল না। আমি গিয়ে এমন একটা কাজ করলাম, যার ফলে তাদের মধ্যে কলহ দেখা দিল এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ইবলীস যখন শোনে সে তাদের স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছে, তখন খুশিতে নেচে ওঠে। সে নিজ সিংহাসনের উপর দাঁড়িয়ে যায় এবং সেই অনুচরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আর বলে, তুমিই আমার যথার্থ প্রতিনিধি। তুমি আজ যেই কৃতিত্ব দেখিয়েছ, এমনটা আর কেউ পারেনি। (মুসলিম, হাদীছ নং ৫০৩৩)

এর দ্বারা অনুমান করতে পারেন, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে স্বামী-স্ত্রীর কলহ কত অপসন্দনীয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ কতটা ঘৃণ্য। আর শয়তানের কাছে এটা কত প্রিয়। এ কারণেই কুরআন-হাদীছে স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য এতটা বিস্তারিতভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। মানুষ তা ঠিকভাবে মেনে চললে দাম্পত্য সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে। ফলে মানুষের আখিরাত তো বটেই পার্থিব জীবনও হয়ে উঠতে পারে কল্যাণময়।

পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক

পূর্বের পরিচ্ছেদ ছিল স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে আর এ পরিচ্ছেদে ইমাম নববী (রহ.) স্বামীর অধিকার তুলে ধরেছেন। নাম দিয়েছেন حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ 'স্ত্রীর উপর স্বামীর হক'।

এর অধীনে কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত ও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। প্রথমে কুরআন মাজীদের আয়াত,

'اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ'

'পুরুষগণ নারীদের তত্ত্বধায়ক, যেহেতু আল্লাহ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা তাদের অর্থ-সম্পদ খরচ করে'

(সূরা নিসা : ৩৪)

আয়াতে قَوّٰمُوْنَ -এর অর্থ 'কার্যনির্বাহকারী: তত্ত্বাবধানকারী, ব্যবস্থাপক ও পরিচালক। আয়াতে বলা হয়েছে, পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক, তার পরিচালক ও তার কর্তা। এটা একটা মূলনীতি বলে দেওয়া হল। মূলনীতি জানা না থাকলে অনেক সময় মানুষ ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা পোষণ করে বসে এবং তার ভিত্তিতে যে সব কাজ করে তাও ভ্রান্ত ও নীতিবিরুদ্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই স্বামীর অধিকার বর্ণনার আগে স্ত্রীকে এই মৌলিক বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, স্বামী তোমার জীবনের তত্ত্বাবধায়ক ও তোমার ব্যবস্থাপনাকারী।

বর্তমান বিশ্বের অপপ্রচার

আধুনিক বিশ্বে যেহেতু নর-নারীর সমানাধিকার ও নারী স্বাধীনতার তুমুল প্রচারণা চলছে, তাই মানুষ একথা বলতে সংকোচ বোধ করছে যে, শরী'আত পুরুষকে নেতা ও নারীকে তার অধীন বানিয়েছে। কেননা, নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নারীকে তার হাতে বন্দী করে দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষকে বড় ও নারীকে ছোট করে ফেলা হয়েছে। এই প্রোপাগান্ডার সামনে আমরা যেন কেমন দমে গিয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা এ রকম নয়। নর-নারীর জীবন দু' চাকার গাড়িতুল্য। জীবনের পরিভ্রমণে উভয় চাকা সমানভাবে চলতে হয়। দু' চাকা একসাথে না চললে কোন গাড়ি চলতে পারে না। কিন্তু সফরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য দু'জনের একজনকে দায়িত্বশীল বানানো জরুরি। হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ হল। দু'জন লোকও যদি একত্রে সফর করে তবে তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়, যাতে সফরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তার সিদ্ধান্তক্রমে নিষ্পন্ন হতে পারে। অন্যথায় তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

এবার ভাবুন, ছোট্ট একটা সফরেই যখন আমীর বানানোর ব্যাপারে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখন জীবনের এমন দীর্ঘ ও এমন গুরুত্বপূর্ণ সফর, যাতে স্বামী-স্ত্রীর জীবন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে, তাতে কেন আমীর নিয়োগের আদেশ থাকবে না? কেন এ ক্ষেত্রে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য তাদের একজনকে দায়িত্বশীল বানানো জরুরি হবে না? নিঃসন্দেহে তা জরুরি এবং সেজন্যই শরী'আত তাদের একজনের উপর সে দায়িত্বভার অর্পন করেছে।

কে হবে দাম্পত্য সফরের আমীর?

এর দু'টি উপায় হতে পারে। হয়ত স্বামীকে জীবনের এ সফরে আমীর বানানো হবে এবং স্ত্রীকে তার আনুগত্য করতে বলা হবে অথবা স্ত্রীকে আমীর বানিয়ে স্বামীকে তার অধীন করে দেওয়া হবে। তৃতীয় কোন পথ নেই। এবার লক্ষ করুন মানবীয় গঠন-প্রকৃতি ও শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করলে যে কেউ স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আল্লাহ তা'আলা নারী অপেক্ষা পুরুষকে বাড়তি যোগ্যতা দান করেছেন। বড়-বড় কাজ করার যে শক্তি-সামর্থ্য পুরুষের আছে সাধারণভাবে নারীর তা নেই। কাজেই যথার্থভাবে এ নেতৃত্বের কাজও পুরুষের পক্ষেই আনজাম দেওয়া সম্ভব। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ হল বিষয়টাকে নিজ বুদ্ধি-বিবেকের উপর ছেড়ে না দিয়ে যিনি নর-নারী উভয়কে সৃষ্টি করেছেন তাঁর হাতে ন্যস্ত করা। তিনিই যখন এ দু'জনকে দাম্পত্য সফরে নামিয়েছেন, তখন তিনিই ফয়সালা করে দিন, কে এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করবে আর কে আনুগত্যের দায়িত্বে থাকবে। তার ফয়সালার বিপরীতে অন্য কারও মতামত এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তাতে সে মত যত শ্রুতিমধুর যুক্তি-প্রমাণের সাথেই পেশ করা হোক না কেন। সুতরাং দৃষ্টিপাত করুন কুরআন মাজীদের দিকে। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি দাম্পত্য সফরের পথ-পরিক্রমার জন্য পুরুষকে قَوَّامٌ অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাপক ও আমীর বানিয়ে দিয়েছেন। আপনি যদি এ ফয়সালাকে যথার্থ বলে বিশ্বাস করেন ও মেনে নেন তাতে আপনারই কল্যাণ এবং এরই মধ্যে রয়েছে শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা। পক্ষান্তরে আপনি যদি তাঁর ফয়সালা মানতে রাজি না হন, নিজ বুদ্ধিকেই বড় মনে করেন, তবে তার খেসারতও আপনাকেই দিতে হবে। শান্তি নষ্ট হবে, জীবন বিপর্যস্ত হবে, দাম্পত্যে ভাঙন ধরবে। এ কেবল কল্পনা নয়। বাস্তবে এরকমই ঘটছে। যারা কুরআনী ফয়সালার বিরুদ্ধে পথ চলছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছে চারদিকে নজর বুলিয়ে তা দেখে নিতে পারেন।

ইসলামে আমীর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

অবশ্য এ স্থলে কুরআন মাজীদ যে শব্দ ব্যবহার করেছে তাও সঠিকভাবে বোঝার দরকার আছে। আল্লাহ তা'আলা কিন্তু 'আমীর', 'হাকিম' বা মালিক' (রাজা) শব্দ ব্যবহার করেননি। ববং শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে قَوَّام (দায়িত্বশীল)। 'কাউওয়াম' বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যার উপর কোন কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, যে সেই কাজের যিম্মাদার হয়। যিম্মাদার হওয়ার অর্থ তারা তাদের যৌথ জীবন কিভাবে যাপন করবে, সে তার নীতি নির্ধারণ করবে। অতঃপর সেই নীতি অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালিত হবে। 'কাউওয়াম' হওয়ার অর্থ এ নয় যে, স্বামী হবে মনিব আর স্ত্রী তার দাসী-বাঁদী। বরং তাদের সম্পর্ক হল আমীর ও মামূরের সম্পর্ক। একজন পরিচালনা করবে অন্যজন তা মেনে নেবে। আবার ইসলামে আমীর বলতে সিংহাসনে আসীন শাসককে বোঝায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় এ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হল–

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

'দলের নেতা তাদের সেবক হয়ে থাকে'।

(জামি'উল-আহাদীছ, ১খ, ৩২৪, হাদীছ নং ১৩২২২ : আল-জামি'উস-সগীর, ১খ, ৭০৮, হাদীছ নং ৭০৬৬ : কাশফুল-খাফা, ২খ, ৫০০, হাদীছ নং ১৫১৫)

একেই বলে আমীর

আমার মহান পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি ঘটনা শোনাতেন। খুবই শিক্ষণীয় ঘটনা। তিনি বলেন, একবার আমরা দেওবন্দ থেকে সফরে যাচ্ছিলাম। দারুল উলূম দেওবন্দের 'শায়খুল-আদব' (আরবী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক) খ্যাতনামা 'আলেম হযরত মাওলানা ই'যায 'আলী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহিও সফরে সঙ্গে ছিলেন। আমরা স্টেশনে পৌছলাম। গাড়ি আসতে দেরি হচ্ছিল। এ সময় হযরত শায়খুল আদব ছাহেব (রহ.) বললেন, 'হাদীছ শরীফে আছে, তোমরা যখন কোন সফরে যাবে কাউকে আমীর বানিয়ে নেবে'। সুতরাং আমাদেরও উচিত কাউকে আমীর বানিয়ে নেওয়া। আমার মহান পিতা (রহ.) বলেন, আমরা যেহেতু ছাত্র ছিলাম এবং তিনি উস্তায, তাই আরয করলাম, আমীর বানানোর কোন দরকার নেই। আমীর তো বানানোই আছে। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমরা আরয করলাম, আপনিই এ সফরের আমীর, যেহেতু আপনি আমাদের উস্তায, আমরা শাগরিদ। হযরত (রহ.) বললেন, আচ্ছা তোমরা আমাকেই

আমীর বানাতে চাচ্ছ? বললাম, জী হ্যাঁ। আপনি ছাড়া আর কে এখানে আমীর হতে পারে? হযরত (রহ.) বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু আমীরের হুকুম মানতে প্রস্তুত তো? তা না হলে তো আমীর বানানোর অর্থ নেই। আমীর বলাই হয় তাকে, যে কোন হুকুম করলে তা মেনে নেওয়া হবে। আমরা বললাম, জী হযরত, আপনি যখন আমাদের আমীর, ইনশাআল্লাহ আমরা আপনার প্রত্যেকটি আদেশ অবশ্যই পালন করব। হযরত (রহ.) বললেন, ঠিক আছে আমি আমীর হলাম। তারপর গাড়ি এসে গেল। হযরত (রহ.) সংগীদের কারও মালপত্র নিজ মাথায় এবং কারও মালপত্র হাতে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। আমরা পেরেশান হয়ে বলতে লাগলাম, হযরত, আপনি এটা কী করছেন ? আমাদেরকে বইতে দিন। মাওলানা (রহ.) বললেন, না, আমাকে যখন আমীর বানিয়েছ, এখন হুকুমও মানতে হবে। এসব মাল আমাকেই বইতে দাও।

সুতরাং সকলের মালামাল তিনি একা গাড়িতে তুললেন। তারপর সফরের পুরোটা সময়ে তাঁর আচরণ ছিল এ রকমই। যখন কোন কঠিন কাজ সামনে আসত তিনি নিজেই তা করতেন। আমরা কিছু বলতে গেলে স্মরণ করিয়ে দিতেন, দেখ তোমরাই আমাকে আমীর বানিয়েছ। আমীরের হুকুম মানা জরুরি। কাজেই আমি যে হুকুম দেই মানতে হবে। ফলে আমাদের আর কিছু করার থাকল না। তাঁকে আমীর বানানোটাই আমাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুত ইসলামে আমীর একেই বলে। নেতৃত্ব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এ রকমই।

বর্তমানকালে আমীর বা নেতাকে কল্পনা করলে কোন রাজা-বাদশা বা কর্তৃত্ববাদী কোন ব্যক্তির ছবিই ভেসে ওঠে। আমীর যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরের এমন কোন মহারাজ, যার সাথে কারও কথা বলা সম্ভব নয় এবং তিনিও তার কোন প্রজার সাথে কথা বলা পসন্দ করেন না। কিন্তু কুরআন-হাদীছ যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে, তাতে আমীর হবে একজন গণসেবক। তার কাজ হল মানুষের সেবা করা। ইসলামে আমীর বানিয়ে কাউকে রাজা-বাদশাহতে পরিণত করা হয় না যে, সে কেবল অন্যের উপর ছড়ি ঘোরাবে, অন্যকে নিজ আদেশের গোলাম বানিয়ে রাখবে এবং সকলকে নিজ চাকর-নকর মনে করবে। বরং আমীর বানিয়ে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তার সিদ্ধান্তকে সকলের জন্য অবশ্যমান্য করে দেওয়া হয় বটে; কিন্তু তা দেওয়া হয় তার কর্তৃত্বপরায়ণতা চালানোর জন্য নয়, বরং অন্যের খেদমত ও সেবার জন্য এবং অন্যকে শান্তিদান ও অন্যের কল্যাণকামিতার জন্য।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আল্লাহ যে ইরশাদ করেছেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

'পুরুষগণ নারীদের তত্ত্বাবধায়ক'। (সূরা নিসা : ৩৪)

স্বামীদের এটা তো খুব মনে থাকে এবং একে ভিত্তি করে তারা স্ত্রীদের উপর হুকুম চালাতে বসে যায় আর ভাবে স্ত্রীদের কাজ হল সর্বাবস্থায় আমাদের অধীন ও আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকা এবং তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হল প্রভু-ভৃত্যের মত (নাঊযুবিল্লাহ)। তারা চিন্তা করে না কুরআন মাজীদে আরও আয়াত আছে। সে আয়াত তাদের মনেই থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

'তার এক নিদর্শন হল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে স্ত্রী বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা রূম : ২১)

হযরত থানভী (রহ) বলেন, নিশ্চয় পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু সেই সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কও তো আছে। ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলাবিধানের দিক থেকে সে তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ক হল বন্ধুত্ব ও সখ্যের সম্পর্ক। মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক কিছুতেই নয়। এর দৃষ্টান্ত হল সেই দুই বন্ধু, যারা কোথাও সফরে যাচ্ছে। তখন এক বন্ধু অপর বন্ধুকে আমীর বানিয়ে নিল। সুতরাং স্বামী দাম্পত্য জীবনে সবকিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এ হিসেবে তো সে আমীর, কিন্তু যেহেতু বন্ধুও বটে, তাই তার সাথে চাকর-বাকরের মত আচরণ কিছুতেই করবে না। বরং সর্বদা সখ্যের চেতনাকে মাথায় রাখবে। সে সম্পর্কের কিছু আদব-কায়দা ও কিছু দাবি আছে। সে দাবির কারণে মান-অভিমানের ব্যাপারটাও দেখা দেয়। তাকে কিছুতেই আমীরত্ব ও নেতৃত্বের পরিপন্থী ভাবা যায় না।

এতটা তেজ-দাপট বাঞ্ছনীয় নয়

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আমাদের সমাজে কোন কোন স্বামী মনে করে, আমি যখন কর্তা তখন আমার এমন প্রতাপ থাকা উচিত যাতে আমার আওয়াজ পাওয়ামাত্র স্ত্রী কাঁপতে থাকে এবং সহজভাবে কথা বলার ক্ষমতা না রাখে।

আমার এক সহপাঠী বন্ধু ছিল। তিনি একদিন খুব গর্বের সাথে আমাকে বলছেন, আমি কয়েক মাস পর যখন বাড়ি যাই আমার সাথে বিবি-বাচ্চাদের কথা বলার হিম্মত হয় না। আমার কাছে আসতেই সাহস করে না। খুবই তৃপ্তির সাথে তিনি এ কথা বলছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা আপনি যখন বাড়িতে যান তখন কি বাঘ-ভাল্লুক বনে যান? না হয় তারা আপনার কাছে আসতে ভয় পাবে কেন? তিনি বললেন, না, ব্যাপার তা নয়। আসলে আমরা তো তাদের قَوَّامٌ (কর্তা)। তাই আমাদের দাপট থাকা চাই।

ভালোভাবে বুঝে রাখুন 'কাউওয়াম' হওয়ার অর্থ মোটেই এরকম নয় যে, বিবি-বাচ্চারা কাছে আসার সাহস করবে না। তাদের সাথে তো সখ্যের সম্পর্কও আছে। সে সম্পর্ক কেমন হবে তা শুনুন।

নবীজীর সুন্নত দেখুন

একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বললেন, তুমি কখন আমার উপর খুশি থাক আর কখন নারাজ তা আমি বেশ বুঝতে পারি। হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা জিজ্ঞেস করলেন, তা কিভাবে? তিনি বললেন, যখন তুমি আমার প্রতি খুশি থাক তখন কসম কর وَرَبِّ مُحَمَّدٍ '(মুহাম্মাদের রবের কসম) বলে। আর নারাজ থাকলে কসম কর' ইবরাহীমের রবের কসম' বলে। তখন তুমি আমার নাম উচ্চারণ কর না। বরং হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস-সালামের নাম নাও। হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা বললেন, إِنِّي لَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ক্ষেত্রে আমি কেবল আপনার নামটাই ছাড়িমাত্র, না হয় আমার অন্তরে আপনার ভালোবাসায় ছেদ পড়ে না ক্ষণকালের জন্যও।

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৮২৭; মুসলিম, হাদীছ নং ৪৪৬৯;
মুসনাদে আহ্‌মাদ, হাদীছ নং ২৩১৮২)

এবার চিন্তা করুন, নারাজ কে হচ্ছেন এবং কার প্রতি হচ্ছেন? নারাজ হচ্ছেন উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আর হচ্ছেন মহান স্বামী মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। তার মানে, আমাদের আম্মাজান কখনও কখনও অভিমানবশত এমন কোন কথা বলে ফেলতেন, যদ্দরুন মনে হত তাঁর অন্তরে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাঁকে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বের পরিপন্থী মনে করেননি, বরং তিনি স্নিগ্ধ-মধুর ভাষায় তার উল্লেখ করে বলছেন, তোমার অসন্তোষ আমি বেশ বুঝতে পারি।

স্ত্রীর মান-অভিমান সহ্য করতে হবে

আমাদের আম্মাজান হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার উপর যখন জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হল এবং সেজন্য তার উপর দিয়ে কিয়ামত বয়ে যাচ্ছিল এবং বলার অপেক্ষা রাখে না সে কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরেও বেদনার অন্ত ছিল না, লোক সমাজে তার প্রচারণায় নিশ্চয়ই তাঁর বুকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, কিন্তু ধৈর্যের পাহাড় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পরিস্থিতিতেও এক চুলও নীতি থেকে সরে দাঁড়াননি। এ সময় তিনি একবার আম্মাজানকে বললেন-

'হে আয়েশা ! এ নিয়ে তোমার এতটা ভেঙে পড়ার কারণ নেই। তুমি নির্দোষ ও নিরপরাধ হয়ে থাকলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দেবেন। আর আল্লাহ না করুন তোমার দ্বারা যদি কোন স্খলন ঘটে গিয়ে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা কর, তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। তিনি অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

তাঁর এ কথায় হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা যারপরনাই দুঃখিত হলেন। তিনি দুই সম্ভাবনার উল্লেখ কেন করলেন? কেন বললেন, তুমি নির্দোষ হলে আল্লাহ তা'আলাই তোমার সাফাই দান করবেন। আর যদি কোন দোষ হয়ে গিয়ে থাকে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাওবা কর, তিনি ক্ষমা করে দেবেন? এর দ্বারা তো বোঝা যায়, আমার দ্বারা কোন অপরাধ হয়ে থাকতে পারে এ ধরনের একটা লঘু সম্ভাবনার ধারণা তাঁর অন্তরেও আছে। সুতরাং এ কথায় তিনি ভীষণ আঘাত পেলেন। এ আঘাত সইতে না পেরে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। এ অবস্থাতেই তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন। তখন ঘরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও উপস্থিত ছিলেন। আয়াত নাযিল হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তিনিও বড় খুশি হলেন। তিনি বললেন, এবার সব অপবাদ খতম হয়ে যাবে। তিনি প্রিয় কন্যাকে বললেন, 'আয়েশা! সুসংবাদ শোন, আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন। তাতে তুমি নির্দোষ বলে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। ওঠ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দাও। আম্মাজান বিছানায় শায়িতা ছিলেন। শুয়ে শুয়েই তিনি আয়াতগুলি শোনেন। তারপর বলে ওঠেন, এটা তো আমার প্রতি মহান আল্লাহর করুণা। তিনি আমার নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি তাঁর শুকর আদায় করছি। কিন্তু আমি তাঁকে ছাড়া আর

কাউকে কৃতজ্ঞতা জানাব না। কেননা, আপনারা তো মনে মনে ধারণা করে বসেছিলেন, আমার দ্বারা কোন দোষ হয়েও থাকতে পারে।

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৩৮১; মুসলিম, হাদীছ নং ৪৪৭৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৩৬৯০)

বাহ্যত আম্মাজান হযরত সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মন্দার্থে নেননি। বরং তিনি এর মূল্য বুঝেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এটা আম্মাজানের অভিমানের কথা। অন্তরে তীব্র ভালোবাসা থাকলেই এমন হয়।

বস্তুত মান-অভিমান ভালোবাসারই দাবি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালোবাসা ও সখ্যের সম্পর্ক, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নয়। হ্যাঁ একজন নেতা ও অন্যজন সেদিক থেকে তার অধীন বটে, কিন্তু সেজন্য সখ্য বাদ হয়ে যায়নি; বরং প্রাণের সম্পর্ক সেটাই। নেতৃত্বের ব্যাপারটা গৌণ। তা কেবলই শৃঙ্খলা বিধানের জন্য। তো সে সখ্যের দাবি হল স্বামীকে স্ত্রীর মান-অভিমান বরদাশত করতে হবে। হ্যাঁ সুস্পষ্ট কোন দোষ-ত্রুটি হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। সেরূপ ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগ করেছেন বলেও প্রমাণ আছে। কিন্তু মান-অভিমানের ব্যাপারটা আলাদা। তিনি তা হাসিমুখে বরদাশত করেছেন।

স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা সুন্নত

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা কত উঁচু ছিল! সর্বদা আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর যোগাযোগ। তাঁর সাথে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক, ওহী আসছে, তিনি গ্রহণ করছেন, চলছে পারস্পারিক কথোপকথন, কিন্তু সেই সাথে স্ত্রীদের সাথে সখ্যের হকও আদায় করছেন। তাদের মনোরঞ্জন করছেন, তাদেরকে আনন্দ দানের চেষ্টা করছেন। আনন্দদানের জন্য আম্মাজান সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে রাতের বেলা এগার নারীর ঘটনা শোনাচ্ছেন। ইয়ামানের এগার নারী, যারা স্থির করেছিল প্রত্যেকে আপন-আপন স্বামীর প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরবে। কোন কিছু গোপন করবে না। কার স্বামী কেমন তার কি দোষ-গুণ সবই বলবে। সেই এগার নারী কেমন বাগ্মিতা ও কেমন ভাষালংকারের সাথে তাদের স্বামীদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছিল, তিনি তার সবিস্তার বিবরণ দিয়ে আম্মাজানকে সে ঘটনা শোনাচ্ছেন। (বুখারী, হাদীছ নং ৪৭৯০; মুসলিম, হাদীছ নং ৪৪৮১)

স্ত্রীর সাথে হাস্য-পরিহাস সুন্নত

একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন সাওদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনাহার ঘরে অবস্থান করছিলেন। সেটা তাঁরই পালার দিন। এ অবস্থায় হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হালুয়া তৈরি করলেন এবং তা হযরত সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে নিয়ে আসলেন। তিনি সে হালুয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রাখলেন। সেখানে হযরত সাওদা (রাযি.) বসা ছিলেন। তাকে বললেন, আপনিও খান। কিন্তু তাঁর ঘরে তাঁরই পালার দিন আরেক ঘর থেকে খাবার আসা তাঁর পসন্দ হল না। তিনি বিরক্তি বোধ করলেন। তাই খেতে অস্বীকার করলেন। হযরত 'আয়েশা (রাযি.) বললেন, খেতেই হবে। না খেলে এ হালুয়া তোমার সারা মুখে মাখিয়ে দেব। হযরত সাওদা (রাযি.) বললেন, না, আমি খাব না। হযরত 'আয়েশা (রাযি.)-ও ছাড়বার নন। তিনি পাত্র থেকে কিছু হালুয়া নিয়ে তা হযরত সাওদা (রাযি.)-এর চেহারায় মাখিয়ে দিলেন। হযরত সাওদা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ করলেন, দেখলেন তো কি করেছে? আমার সারাটা মুখ লেপ্টে দিয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর বিচার কুরআন মাজীদেই আছে।

বলা হয়েছে-

وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

অর্থাৎ, 'অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ হল তার সমান অনুরূপ আচরণ।'

(সূরা নিসা : ১৪৯)

কাজেই সে যেমন তোমার মুখে হালুয়া মাখিয়ে দিয়েছে, তেমনি তুমিও তার মুখে তা মাখিয়ে দাও! সুতরাং হযরত সাওদা (রাযি.)-ও একটু হালুয়া নিয়ে হযরত 'আয়েশা (রাযি.)-এর মুখে লেপ্টে দিলেন। এখন দু'জনেরই চেহারা হালুয়ায় মাখামাখি। এসবই ঘটেছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে।

এ সময় হঠাৎ দরজায় করাঘাত হল। জিজ্ঞেস করা হল, কে? জানা গেল হযরত 'উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাশরীফ এনেছেন (সম্ভবত তখনও পর্যন্ত পর্দার বিধান নাযিল হয়নি)। হযরত 'উমর (রাযি.) এসেছেন শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, শীঘ্র গিয়ে চেহারা ধুয়ে ফেল। সুতরাং তারা গিয়ে চেহারা ধুয়ে ফেললেন।

(মাজমা'উয-যাওয়াইদ, ৪খ,৩১৬)

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সায়্যিদুল-আম্বিয়া ওয়াল-মুরসালীন, আল্লাহ রাব্বুল-'আলামীনের সাথে তাঁর সম্পর্ক প্রতিটি ক্ষণের, সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তার কথোপকথন। ওহী আসে মুহুর্মুহু আল্লাহ তা'আলার সাথে সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতার এমনই উচ্চমানে তাঁর অবস্থান, যেখানে না কেউ পৌঁছাতে পেরেছে, না কারও পৌঁছানো সম্ভব। তা সত্ত্বেও আমাদের সম্মানিতা মায়েদের মনোরঞ্জন ও তাদেরকে আনন্দদানের প্রতি তিনি এতটা লক্ষ রাখতেন!

'মাকামে হুযূরী '– এর হাকীকত

'মাকামে হুযূরী' কথাটি আমরা খুব উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু এর হাকীকত আমরা কতটুকু জানি ? বস্তুত এটা ঠিক বোঝানোর জিনিস নয়। কেউ একবার এর স্বাদ চাখতে পারলে তবেই বুঝতে পারবে এটা কি জিনিস। আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই 'আরেফী (রহ) বলতেন, অনেক সময় আল্লাহ তা'আলার 'হুযূরী' (সান্নিধ্য ও উপস্থিতি)-এর ভাবনা এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্র কোন কোন বান্দা তখন পা ছড়িয়ে শুইতে বা বসতে পর্যন্ত পারে না। কেননা, এ অবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত থাকার চেতনা অত্যন্ত বলবত্ত থাকে। নিজের মুরব্বী স্থানীয় কেউ, সামনে উপস্থিত থাকার ধ্যান যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন কি করে পা ছড়িয়ে দেওয়া যায়? এই যে 'হুযূরী'-এর সর্বোচ্চ 'মাকাম' (স্থান) অর্জিত ছিল মহানবী আল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের। এতটা উচ্চ 'মাকাম' কারও কখনও অর্জিত হয়নি এবং হওয়া সম্ভবও নয়। অথচ তা সত্ত্বেও তিনি পবিত্র স্ত্রীদের সাথে কী আবেগঘন ও আনন্দপূর্ণ ব্যবহার করতেন! এটা কেবল একজন নবীর পক্ষেই সম্ভব, অন্য কারও পক্ষে কখনও সম্ভব নয়।

ফয়সালাদানের এখতিয়ার কেবল স্বামীরই

যাহোক, আল্লাহ যেহেতু স্বামীকে কাউওয়াম ও তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন তখন ফয়সালাদানের এখতিয়ারও কেবল তারই। স্ত্রীর কর্তব্য তা মেনে চলা। হ্যাঁ স্ত্রী মত প্রকাশ করতে পারে, পরামর্শ দিতে পারে এবং সখ্যের দাবিতে স্বামীরও উচিত তার মূল্যায়ন করা এবং তাকে সে উৎসাহও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্বামী তা গ্রহণ করুক বা নাই করুক স্ত্রীর কর্তব্য তার ফয়সালা মেনে নেওয়া। এ দৃষ্টিভঙ্গি যদি স্ত্রীর মাথায় না থাকে এবং সে চায় কর্তৃত্ব চলবে তারই, স্বামীর নয়, স্বামীকেই তার সব কথা মানতে হবে, তবে এটা সম্পূর্ণ স্বভাববিরোধী ভাবনা। এটা যেমন শরী'আতসম্মত নয়, তেমনি যুক্তি, বুদ্ধি, ন্যায়নিষ্ঠতারও পরিপন্থী। এর পরিণাম গৃহদাহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য

আয়াতটির দ্বিতীয় অংশ হল–

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

'নেককার নারীগণ হয় অনুগত এবং (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে (সতিত্ব ও মালপত্রের) সংরক্ষণকারিনী, যেহেতু আল্লাহ তার হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। (নিসা ঃ ৩৪)

এতে পুণ্যবতী নারীদের স্বভাব-চরিত্র উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে قٰنِتٰتٌ (আনুগত্যকারিণী), অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে। আল্লাহ তা'আলা তার উপর স্বামীর যে সব হক আরোপ করেছেন, সে তা যথাযথভাবে আদায় করে। আর দ্বিতীয় গুণ বলা হয়েছে, তারা স্বামীর অনুপস্থিতির সময় তার ঘর হেফাজত করে। ঘর হেফাজতের অর্থ, প্রথমত সে নিজের হেফাজত করে। নিজ সতিত্ব রক্ষা করে। কোনও রকম গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় না। দ্বিতীয়ত স্বামীর অর্থ-সম্পদ হেফাজত করে। এটাও স্ত্রীর দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা তার উপর অর্পণ করেছেন। হাদীছ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে–

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

'স্ত্রী তার স্বামীগৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী।'

(বুখারী, হাদীছ নং ৮৪৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৫৭৫৩)

আইনের শুষ্ক সম্পর্ক দ্বারা জীবন চলতে পারে না

এই যে আমি বললাম, রান্নাবান্না করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। এটা হল আইনের কথা। কিন্তু জীবন তো আইনের শুষ্ক সম্পর্কের উপর চলে না, চলতে পারে না। কেননা, আইন তো দু'দিকেই আছে। এক দিকে আইনত রান্না করা যেমন স্ত্রীর দায়িত্ব নয়, তেমনি স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়, তার চিকিৎসা করাও স্বামীর দায়িত্ব নয়, সে চিকিৎসার খরচ দিতে বাধ্য নয়। এমনিভাবে স্ত্রীকে তার মা-বাবার কাছে বেড়াতে নিয়ে যাওয়াও তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। এমনকি স্ত্রীর বাবা-মা বেড়াতে আসলে তাদেরকে ঘরে থাকতে দেওয়াও তার আইনগত কর্তব্য নয়। ফুকাহায়ে কিরাম তো এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, স্ত্রীর বাবা-মা মেয়েকে দেখতে আসলে তারা সপ্তাহে কেবল একবারই আসতে পারবে এবং আসার পরও ঘরের বাইরে দেখা-সাক্ষাত করে চলে যাবে। ঘরের মধ্যে বসিয়ে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ দিতে স্বামী আইনত বাধ্য নয়।

এবার চিন্তা করুন, এসব আইনের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে জীবন যাপন হয় কতটুকু সম্ভব। এরূপ ধরাবাঁধা নিয়মের উপর চলা শুরু করলে দাম্পত্য জীবন আর মধুময় থাকবে না, মরুময় হয়ে যাবে। সুখের সংসার যাবে বরবাদ হয়ে। দাম্পত্য সম্পর্ক মধুর কেবল তখনই হতে পারে, যখন স্বামী আইনের গণ্ডি অতিক্রম করে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করবে আর স্ত্রীও তাঁর মহীয়সী পত্নীদের তথা আমাদের সম্মানিত মায়েদের আদর্শ অবলম্বন করবে।

স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর টাকা-পয়সার মমতা থাকা চাই

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর টাকা-পয়সার প্রতি মমতা থাকা চাই। তাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে স্বামীর টাকা অহেতুক নষ্ট না হয়, ভুল জায়গায় খরচ না হয় এবং অপচয় ও অপব্যয় না হয়। এটা স্ত্রীর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। স্ত্রী যদি বেহিসাব খরচ করতে শুরু করে দেয় বা খরচের দায়িত্ব চাকর-চাকরানীর উপর ছেড়ে দেয় আর তারা তা ইচ্ছামত খরচ করতে থাকে, তবে স্বামীর ফতুর হতে সময় লাগবে না। নিঃসন্দেহে এটা স্ত্রীর আইনগত দায়িত্বের পরিপন্থী।

যে স্ত্রীর উপর ফিরিশতাদের লা'নত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

'হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পুরুষ যখন স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, কিন্তু স্ত্রী তাতে সাড়া না দেয়, ফলে স্বামী রাত কাটায় তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে, ফিরিশতাগণ সেই স্ত্রীর প্রতি লা'নত করে ভোর পর্যন্ত।'

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৭৯৪; মুসলিম, হাদীছ নং ২৫৯৪; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১৮২৯; আহমাদ, হাদীছ নং ৮২২৪)

অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীকে তার বিছানায় বিশেষ দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতার উদ্দেশ্যে ডাকে; কিন্তু সে না আসে বা এমন কোন পন্থা অবলম্বন করে যদ্দরুন স্বামী তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে না পারে, ফলে স্বামী তার উপর নারাজ হয়ে যায়, তবে ফিরিশতাগণ সারা রাত তার প্রতি এভাবে লা'নত বর্ষণ করে যে, এই মহিলার প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক অর্থাৎ সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকুক। কেননা, তার এতগুলো হক সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেসব হক আদায়ের

ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আদায় করাও হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল দাম্পত্য সম্পর্ককে সুসংহত করা আর সে সম্পর্ককে সংহত করার একটা অপরিহার্য অংশ হল স্ত্রীর মাধ্যমে স্বামীর চারিত্রিক সুরক্ষা, বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যও সেটাই, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী যাতে চারিত্রিক দিক থেকে পবিত্র থাকতে পারে এবং বিবাহের পর অবৈধ কোন পন্থার দিকে ফিরে তাকানোরও প্রয়োজন না পড়ে, সে হিসেবে তোমার দায়িত্ব ছিল স্বামীকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করা এবং তোমার দিক থেকে তার প্রয়োজন সমাধায় কোন ত্রুটি না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। যদি সতর্ক না থাক ও অবহেলা প্রদর্শন কর তবে ফিরিশতাদের পক্ষ হতে তোমার প্রতি লা'নত বর্ষিত হতে থাকবে। অপর এক বর্ণনায় আছে,

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

'স্ত্রী যদি স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে রাত কাটায়, তবে ফিরিশতাগণ ভোর পর্যন্ত তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করে।' এবার চিন্তা করুন, হাদীছ শরীফে একটি সংক্ষিপ্ত কথা বলা হয়েছে। কেবল এতটুকু যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তাতে সাড়া না দেয় বা এমন কোন পন্থা অবলম্বন করে, যদ্দরুন স্বামী উদ্দেশ্য পূরণ করতে না পারে, তবে সারারাত ফিরিশতাগণ সেই স্ত্রীর উপর লা'নত বর্ষণ করে। তা হলে স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া বা তার অপসন্দ সত্ত্বেও ঘরের বাইরে চলে যায় তখন কী হবে? তখনও তো ফিরিশতাগণ তার ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার প্রতি লা'নত করবে। ওই ছোট কথার মধ্যে এটাও এসে যায় বৈ কি। এসব যেহেতু স্বামী-স্ত্রীতে কলহের কারণ হয়ে যায়, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত গুরুত্বের সাথে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

'হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য (নফল) রোযা রাখা জায়েয নয়। এবং তার অনুমতি ছাড়া তার গৃহে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া জায়েয নয়।'

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৭৯৬; মুসলিম, হাদীছ নং ১৭০৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৭৮৪১)

হাদীছে নফল রোযার বিপুল ছওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, দিনের বেলাও স্বামীর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে আর স্ত্রী রোযা রাখার কারণে সে তা পূরণ করতে সক্ষম হবে না। ফলে তার কষ্ট হবে। এজন্যই নফল রোযা রাখতে হলে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। হ্যাঁ স্বামীরও উচিত, অহেতুক নিষেধ না করা; বরং স্ত্রী নফল রোযা রাখতে চাইলে অনুমতি দিয়ে দেওয়া। কখনও কখনও এ নিয়েও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায়। স্ত্রী বলে, আমি রোযা রাখতে চাই, কিন্তু স্বামী তাকে অনুমতি দেয় না। বিশেষ সমস্যা না থাকলে অনুমতি না দেওয়া উচিত নয়; বরং অনুমতি দিয়ে রোযার ফযীলত অর্জনের সুযোগ স্ত্রীকে দেওয়া উচিত। কিন্তু তার অনুমতি ছাড়া সে কিছুতেই রোযা রাখতে পারবে না। স্বামী অনুমতি না দিলে রোযা রাখার ইচ্ছা পরিত্যাগ করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে।

এর দ্বারা বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীর আনুগত্যকে নফল ইবাদতের উপরে স্থান দিয়েছেন। কাজেই নফল রোযা রেখে যে ছওয়াব স্ত্রী লাভ করতে পারত, স্বামীর অনুগত্য করে তারচে' আরও বেশি ছওয়াব তার অর্জিত হয়ে যাবে। কাজেই রোযা রাখতে না পারার কারণে তার এই আক্ষেপ করার কোন কারণ নেই যে, আহা, আমি কত বড় ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। বরং সে চিন্তা করবে, আমি রোযা রাখতে চাচ্ছিলাম কী জন্য? ছওয়াব অর্জনের লক্ষেই তো? ছওয়াব তো অর্জন হতে পারে কেবল দ্বীনের অনুসরণ করার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলাকে রাজি-খুশি করার মাধ্যমে। তো দ্বীন যখন নফল রোযা অপেক্ষা স্বামীর আনুগত্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, তখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি তো স্বামীর সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত থাকবে। স্বামী খুশী না থাকলে তো আল্লাহ তা'য়ালাও খুশি হবেন না। সুতরাং স্বামীকে খুশি রাখাও আমার কর্তব্য। সুতরাং নফল রোযা না রেখে যদি আমি স্বামীর আনুগত্য করি, তাতে যেমন স্বামী খুশি হবেন তেমনি আল্লাহ তা'আলাও খুশি হবেন। এভাবে রোযা রেখে আমি যে ছওয়াব পেতে পারতাম, তারচে' আরও বেশি ছওয়াব রোযা না রেখে এবং পানাহার করা সত্ত্বেও আমি পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

ঘরকন্নার কাজেও ছওয়াব রয়েছে

অনেক সময় আমাদের চিন্তা-ভাবনা এরকম হয়ে থাকে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটা পার্থিব বিষয়মাত্র। এটা কেবল এক প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা। বিষয়টা কিন্তু মোটেই সে রকম নয়। বরং এটা এক দ্বীনী কাজও।

কেননা, স্ত্রী যদি নিয়ত করে, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এই-এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, স্বামীকে খুশি রাখাও আমার দায়িত্বের একটা অংশ এবং তাকে খুশি রাখার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকেও রাজি-খুশি করা যাবে, তবে তার কাজকর্ম কেবল পার্থিব ব্যাপার থাকে না; বরং আখিরাতের কাজে পরিণত হয়ে যায় ও ছওয়াবের কাজ হয়ে যায়। মহিলারা গৃহস্থালির যে সব কাজ করে তা দ্বারা স্বামীকে খুশি রাখার নিয়ত থাকলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সবগুলো কাজকে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের মর্যাদা দিয়ে দেন এবং তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে ছওয়াব লিখে দেওয়া হয়। তা রান্না-বান্নার কাজ হোক, ঘর-সংসার গোছানোর কাজ হোক, বাচ্চাদের পরিচর্যার কাজ হোক, স্বামীর সেবা ও খেদমতের কাজ হোক কিংবা স্বামীর সাথে আনন্দ-ফূর্তি ও হাস্য-পরিহাসের কথাবার্তা হোক। এসব কিছুরই বিনিময়ে সে ছওয়াবের অধিকারী হয়ে যায় যদি তার নিয়ত শুদ্ধ থাকে।

শারীরিক চাহিদা পূরণেও ছওয়াব

এ বিষয়ে সুস্পষ্ট হাদীছও আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠাচরণেও আল্লাহ তা'আলা নেকী দিয়ে থাকেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! এর দ্বারা তো মানুষ তার শারীরিক চাহিদাই পূরণ করে থাকে, এতেও ছওয়াব হবে? মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে চাহিদা যদি অন্যায় পথে পূরণ করত, তবে গুনাহ হত কি না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই গুনাহ হত। তিনি বললেন, তা হলে বৈধ পথে করলে কেন ছওয়াব হবে না ? অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী যেহেতু অবৈধ উপায় পরিহার করে আল্লাহ প্রদত্ত বৈধ উপায়ে সে চাহিদা পূরণ করছে এবং এভাবে আল্লাহ তা'আলার বিধান মান্য করছে, তাই তারা এজন্য ছওয়াবেরও অধিকারী হবে।

(মুসনাদে আহমাদ, ৫খ, ৬৭ পৃষ্ঠা)

হযরত থানভী (রহ)-এর মাওয়ায়েযে আমি একটি হাদীছ পড়েছি। হাদীছটি তিনি একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে, স্বামী যখন বাইরে থেকে ঘরে আসে এবং মহব্বতের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকায় আর স্ত্রীও মহব্বতের দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের প্রতি নিজ রহমতের দৃষ্টি দান করেন। সুতরাং দাম্পত্য সম্পর্ক কেবলই পার্থিব বিষয় নয়, এটা আখিরাতেরও ব্যাপার। এর দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালাও করা যায়।

কাযা রোযায় স্বামীর দিকে লক্ষ রাখা

তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে আছে, হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, রমযান মাসে প্রাকৃতিক কারণে আমার যে সব রোযা ছুটে যেত সাধারণত তার কাযা পূরণে আমার শা'বান মাস পর্যন্ত দেরি হয়ে যেত। অর্থাৎ এগার মাস পর তা রাখা হত। শা'বান পর্যন্ত দেরি করতাম এ কারণে যে, এ মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশি রোযা রাখতেন। কাজেই এ সময় রোযা রাখলে আমার কাযা রোযাগুলি তাঁর রোযা অবস্থায় পূর্ণ হয়ে যেত, আর এটাই ওই অবস্থা অপেক্ষা শ্রেয় যে, আমি রোযা রাখলাম, অথচ তিনি রোযাদার নন। চিন্তা করুন, তাঁর এ রোযা নফল রোযা ছিল না; বরং রমযানের কাযা রোযা। কাযা রোযার ব্যাপারে নিয়ম হল, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব তা রেখে ফেলা চাই। অথচ হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা কেবল এই ভেবে শা'বান পর্যন্ত দেরি করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কষ্ট হতে পারে।

(বুখারী, হাদীছ নং ১৮১৪: মুসলিম, হাদীছ নং ১৯৩৩)

স্বামীর অপসন্দনীয় ব্যক্তিকে ঘরে আসার অনুমতি না দেওয়া

হাদীছটির পরবর্তী বাক্যে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

'এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না'। অর্থাৎ স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া কিংবা স্বামী যাকে পসন্দ করে না, তাকে ঘরে আসতে না দেওয়াও স্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এর অন্যথা করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। অন্য এক হাদীছে এ বিষয়টা আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে–

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ

মনে রেখ, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক রয়েছে এবং তোমাদের উপরও তোমাদের স্ত্রীদের হক রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, তোমাদের অপসন্দনীয় লোককে তোমাদের বিছানা ব্যবহার করতে দেবে না এবং তোমাদের অপসন্দনীয় লোককে তোমাদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না'। (তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৮৩; ইবন মাজা, হাদীছ নং ১৮৪১)

অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই একের উপর অন্যের কিছু হক আছে। তোমাদের কর্তব্য সে হক আদায়ে যত্নবান থাকা। তা কী সে হক? স্বামীদের হক এই যে, স্ত্রীগণ তাদের বিছানা এমন কাউকে ব্যবহার করতে দেবে না, যাকে স্বামী পসন্দ করে না এবং স্বামীর ঘরে এমন কাউকে ঢোকার অনুমতি দেবে না, যাকে স্বামীর পসন্দ নয়। এস্থলে স্ত্রীর উপর স্বামীর দু'টি হক উল্লেখ করা হয়েছে। এ হক রক্ষা করা স্ত্রীর দায়িত্ব। কাজেই কেউ তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে দেখতে হবে সে স্বামীর পসন্দের লোক কি না। পসন্দের না হলে তাকে কিছুতেই প্রবেশের অনুমতি দেবে না, তাতে সে স্ত্রীর যত আপনজন এবং তার যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। এমন কি পিতামাতাও যদি হয়, তবে তাদের জন্য কেবল এতটুকু অনুমতি আছে যে, সপ্তাহে একবার এসে মেয়েকে দেখে যাবে। এ দেখা-সাক্ষাতে স্বামী বাধা দিতে পারবে না, কিন্তু তাদের জন্যও জামাতার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে থাকা জায়েয নয়। কেননা, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, তোমরা যাকে পসন্দ কর না তাকে আসার অনুমতি স্ত্রী দিতে পারবে না, তাতে সে যে-ই হোক না কেন।

দ্বিতীয় হক বলা হয়েছে, তোমরা পসন্দ কর না এমন কাউকে তোমাদের বিছানা ব্যবহার করতে না দেওয়া। বিছানা ব্যবহার বলতে বিছানায় বসা, শোওয়া ও ঘুমানো সবই বোঝায়। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কাউকে তার বিছানায় এর কোনওটিই করতে দিতে পারে না।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রাযি.)-এর ঘটনা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন। বস্তুত সাহাবায়ে কিরামের ঘটনাবলী নূরে পূর্ণ। তা শুনলে অন্তরে নূর জন্মায়। মন ও মনন আলোকিত হয়। তো হযরত উম্মু হাবীবা (রাযি.) ছিলেন হযরত আবূ সূফ্য়ান (রাযি.)-এর কন্যা। হযরত আবূ সূফ্য়ান (রাযি.) ছিলেন মক্কা মুকাররামার নেতৃবর্গের একজন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন। প্রায় একুশ বছর একটানা বিরোধিতা করে গেছেন। পরিশেষে মক্কা বিজয় কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে তিনি সাহাবী। আল্লাহ তা'আলার কুদরতের লীলা যে, কাফেরদের এত বড় নেতার কন্যা ইসলামের প্রথম দিকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। ইনি হযরত উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা। সংগে তাঁর স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পিতা ইসলামের ঘোর

শত্রু আর কন্যা ও জামাতা ইসলামের জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ। তাঁদের ইসলাম গ্রহণ পিতার বুকে ছুরি চালাচ্ছিল। তিনি কিছুতেই তা বরদাশত করতে পারছিলেন না। তার নেতৃত্বে মুসলিমদের উপর অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে বহু মুসলিম হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সেই হিজরতকারীদের মধ্যে তার কন্যা উম্মু হাবীবা (রাযি.) ও জামাতাও ছিলেন। তারা হাবশায় মুহাজিররূপে বসবাস করতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় বোঝে সাধ্য কার? হাবশায় অবস্থানের কিছুদিন না যেতেই উম্মু হাবীবা (রাযি.) স্বপ্নে দেখেন, তাঁর স্বামীর আকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পুরো গঠন বিকৃত। ঘুম থেকে জাগার পর তাঁর আশংকা বোধ হল, স্বামীর দ্বীন ও ঈমানে কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি তো! অল্পদিনের মধ্যেই স্বপ্ন বাস্তব হয়ে দেখা দিল। তার স্বামী হাবশায় এক খৃষ্টানের কাছে আসা যাওয়া করত। সেই আসা-যাওয়ার পরিণাম হল বড় ভয়ংকর। তার অন্তর থেকে ঈমান বিদায় নিয়ে গেল এবং সে খৃষ্টান হয়ে গেল।

হযরত উম্মু হাবীবা (রাযি.)-এর উপর যেন বজ্রপাত হল। দ্বীন ও ঈমানের খাতিরে তিনি পিতামাতা ছেড়েছেন, দেশত্যাগ করেছেন। আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে পাড়ি জমিয়েছেন। সর্বসাফল্যে ছিল কেবল স্বামী, তার সুখ-দুঃখের ভাগীদার সেই একজনই হতে পারত। অথচ আজ সেও কাফের হয়ে গেল। অনুমান করা যায় কি কিয়ামত তাঁর উপর দিয়ে যাচ্ছিল? কিছুদিন পর সেই ধর্মান্তরিত স্বামীর সেখানেই মৃত্যু হয়ে যায়। হাবশায় এখন তিনি সম্পূর্ণ একা, নিঃসংগ এক নারী। খোঁজ নেবে এমন কেউ নেই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ

মক্কা মুকাররামায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর পৌঁছে গেল যে, হযরত উম্মু হাবীবা (রাযি.)-এর স্বামী খৃষ্টান হয়ে গেছে এবং সে অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। এখন হাবশায় তিনি সম্পূর্ণ একা, সংগীহীনা। পত্রপাঠ তিনি হাবশারাজ নাজাশীর কাছে পয়গাম পাঠালেন, তিনি যেন উম্মু হাবীবা (রাযি.)-এর কাছে তাঁর পক্ষ হতে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। সুতরাং বাদশাহ নাজাশী তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পৌঁছে দিলেন। হযরত উম্মু হাবীবা (রাযি.) নিজেই ঘটনা বর্ণনা করেন যে,

একদা সেই অসহায় অবস্থায় আমি নিজ ঘরে বসে আছি। হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনলাম। দরজা খুলে দেখি বাইরে এক তরুণী দাঁড়ানো। জিজ্ঞেস করলাম, কে? কোথা হতে আসা হয়েছে? সে বলল, বাদশাহ নাজাশী আমাকে পাঠিয়েছেন (প্রকাশ থাকে যে, হাবশার এই বাদশাহ মহানবী

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন)। জিজ্ঞেস করলাম, কেন পাঠিয়েছেন? বলল, আমাকে পাঠিয়েছেন এই বার্তা দিয়ে যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তিনি বাদশাহ নাজাশীর মাধ্যমে পয়গাম পাঠিয়েছেন। হযরত উম্মু হাবীবা (রাযি.) বলেন, এ শব্দগুলো কানে পড়লে আমি যে কী খুশি হয়েছিলাম এবং কতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আমি উঠে উপস্থিত আমার কাছে যা ছিল সেই তরুণীকে দিয়ে দিলাম। বললাম, এত বড় সুসংবাদ তুমি আমার জন্য নিয়ে এসেছ। নাও, এসব তোমার পুরস্কার। তারপর সেই হাবশাতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর বিবাহ হয়ে গেল। ইত্যবসরে মদীনায় হিজরতের ঘটনাও ঘটে গেছে। কিছুদিন পর মহানবী সাল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। (ইসাবাঃ,৪খ, ২৯৮)

বহুবিবাহের কারণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে একাধিক বিবাহ করেছিলেন, অজ্ঞ-মূঢ় শ্রেণীর লোক সে সম্পর্কে নানা রকম কথা বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিটি বিবাহের পেছনে অনেক বড়-বড় হিকমাত ও কারণ বিদ্যমান ছিল। এই বিবাহকেই দেখুন না! হযরত উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হাবশায় কেমন অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন! খোঁজ নেওয়ার মত কোন লোক ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থায় তাঁকে বিবাহ না করলে তাঁর পোড়া মনে সান্ত্বনা জোগানোর কী ব্যবস্থা হত? ঈমানের জন্য পিতামাতা, দেশ ও সর্বস্বত্যাগী সে নারীকে বিদেশ বিভূঁইয়ে বৈধব্যের অসহায়ত্বে হারিয়ে যেতে না দিয়ে বরং তিনি তাঁকে নিজ স্ত্রীর মর্যাদায় অভিসিক্ত করে নেন এবং সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে এসে তাঁর দুঃখ-বেদনার চির অবসান ঘটান। এমনই ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতী মহত্ব।

অমুসলিমের মুখে প্রশংসা

এ বিবাহের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক মু'জিযারও প্রকাশ ঘটে। মক্কা মুকার্‌রমায় যখন হযরত আবূ সুফয়ান (রাযি.) এর কাছে এ বিবাহের সংবাদ পৌছে। তখনও পর্যন্ত তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানী দুশমন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর কন্যার

বিবাহ হয়েছে এ খবর শুনে তাঁর মুখে স্বতঃস্ফূর্ত যে কথা এসেছিল তা এ রকম, 'এটা তো বড় সুসংবাদ! মুহাম্মাদ এমন নন, যাঁর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করা যায়। কাজেই বড় সৌভাগ্যের কথা যে, উম্মু হাবীবা তাঁর কাছে চলে গেছে।'

হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল ঘোষণা

হুদায়বিয়ায় মাহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবূ সুফ্য়ানের মধ্যে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। সীরাত গ্রন্থসমূহে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এক বছর পর্যন্ত হযরত আবূ সুফ্য়ান ও অন্যান্য কাফেরগণ চুক্তির শর্তসমূহ রক্ষা করেছিল, কিন্তু তারপরই তারা বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে দেয়। সেই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামে মহানবী সাল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তি বাতিল ঘোষণা করেন। তিনি জানিয়ে দেন, এখন আর আমরা সে চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য নই। কাজেই এখন থেকে আমাদের যখনই ইচ্ছা হবে মক্কা মুকার্‌রামায় হামলা চালাব। কেননা, শত্রুপক্ষ যখন চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করল না, তখন তা রক্ষার কোন বাধ্যবাধকতা আমাদের উপরও থাকল না। এ ঘোষণার পর হযরত আবূ সুফ্য়ান ভীষণ ভড়কে গেলেন। তার আশংকা হল মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কোনও সময় মক্কা মুকার্‌রামায় চড়াও হতে পারেন।

আপনি এ বিছানার যোগ্য নন

একবার হযরত আবূ সুফ্য়ান শাম থেকে ফিরছিলেন। মুসলিম বাহিনী গোটা কাফেলাসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফেলল। তিনি চিন্তা করলেন, আমার কন্যা তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে আছে। তার সাথে কথা বললে আশা করি নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। কাজেই তিনি রাতের বেলা লুকিয়ে হযরত উম্মু হাবীবা (রাযি.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। কন্যা তাঁকে স্বাগত জানালেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাম 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ঘরে ছিলেন না। তাঁর বিছানা পাতা ছিল। হযরত আবূ সুফ্য়ান সেই বিছানায় বসতে গেলে উম্মু হাবীবা (রাযি.) দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং বিছানাটি এক পাশে সরিয়ে গুটিয়ে রাখলেন। তাঁর এ কীর্তি দেখে হযরত আবূ সুফ্য়ান অবাক হয়ে গেলেন। পরক্ষণে বলে উঠলেন, রমলা! (এটি হযরত উম্মু হাবীবা রাযি.-এর মূল নাম) এ বিছানা কি আমার উপযুক্ত নয়, না কি আমিই এর উপযুক্ত নই?

হযরত উম্মু হাবীবা (রাযি.) উত্তর দিলেন, আব্বাজী ! প্রকৃতপক্ষে আপনি এ বিছানার উপযুক্ত নন । এটি তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা . কোন মুশরিককে তো আমি তার বিছানায় বসতে দিতে পারি না ।

আবূ সুফ্য়ান দমে গিয়ে বললেন, রমলা! আমার জানা ছিল না তুমি এতটা বদলে গেছ । ভাবতে পারিনি, নিজ পিতাকেও এ বিছানায় বসতে দেবে না ।' (আল-ইসাবা ৪খ, ২৯৮)

হযরত উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা যে নিজ পিতাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানায় বসতে দিলেন না, এটা মূলত আলোচ্য হাদীছেরই অনুসরণ । এতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ

'তোমরা অপসন্দ কর এমন কাউকে তারা তোমাদের বিছানা ব্যবহার করতে দেবে না ' ।

স্বামী ডাকলে সব কাজ ছেড়ে দেবে

وَعَنْ اَبِيْ عَلِيْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ

'হযরত তাল্‌ক ইবন 'আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে ডাকে তখন সে যেন চলে আসে, যদিও তখন চুলার কাছে (রান্নায় ব্যস্ত) থাকে' । (তিরমিযী,হাদীছ নং ১০৮০)

অর্থাৎ, স্ত্রী যতই ব্যস্ত থাকুক, তা চুলায় রুটি সেঁকার কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, তবুও স্বামী তার প্রয়োজনে ডাকলে তাতে সাড়া দিতে হবে । কাজের অজুহাত দেখিয়ে সাড়াদান হতে বিরত থাকার কোন অবকাশ নেই ।

বিবাহ প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের বৈধ উপায়

এই যে বিধানসমূহ দেওয়া হয়েছে এর মূল কারণ, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নর-নারীর শরীরে প্রাকৃতিকভাবেই এক চাহিদা রেখেছেন । অতঃপর সে চাহিদা পূরণের জন্য এক বৈধ ব্যবস্থাও দিয়েছেন । সে ব্যবস্থাই হচ্ছে বিবাহ । দাম্পত্য প্রসংগসমূহের মধ্যে এই চাহিদা পূরণের বিষয়টাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । এ চাহিদা পূরণের জন্যই 'বিবাহ' নামক বৈধ পথ খুলে

দেওয়া হয়েছে। যাতে কোনও নর-নারীরই মনে এ চাহিদা পূরণের জন্য কোন অবৈধ পন্থার চিন্তা না আসে। বরং স্ত্রী দ্বারা স্বামী পরিতৃপ্ত হবে এবং স্বামী দ্বারা স্ত্রী। ফলে তাদের অন্য কারও দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন হবে না।

বিবাহ করা খুব সহজ

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টাকে খুব সহজ করে দিয়েছেন। বর কনে থাকবে আর দু'জন সাক্ষী। সাক্ষীদের সামনে তারা ঈজাব ও কবূল অর্থাৎ প্রস্তাব ও গ্রহণ করবে, ব্যস বিবাহ হয়ে গেল। এমন কি বিবাহের খুত্বা পড়াও জরুরি নয়। খুত্বা পড়া সুন্নত। এমনিভাবে কাজী বা অন্য কাউকে দিয়ে বিবাহ পড়ানোও জরুরি নয়। অন্যকে দিয়ে পড়ানো সুন্নত। কিন্তু তা যদি নাও পড়ানো হয় এবং বর-কনে নিজে-নিজে দু'জন সাক্ষীর সামনে ঈজাব-কবূল করে নেয়–অর্থাৎ একজন বলে, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম আর অন্যজন বলে আমি কবূল করলাম, তাতেই বিবাহ হয়ে যায়। বিবাহের জন্য না মসজিদে যাওয়া জরুরি, না মাঝখানে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে রাখা দরকার। হালাল পন্থাকে সহজ করার জন্যই বিবাহকে এসব শর্ত থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

বরকতপূর্ণ বিবাহ

অন্য দিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিবাহের অনুষ্ঠানকে যেন সাদামাঠা রাখা হয়। কোনও রকম রসম-রেওয়াজ ও শর্তপালন ও লম্বা চওড়া আয়োজন ছাড়াই যেন সহজভাবে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, সন্তান-সন্ততি যখন সাবালক হয়ে যাবে, তখন তার বিবাহ সম্পন্ন করে ফেল, যাতে কোন অবৈধ পথে যাওয়ার ইচ্ছা তার না হয়। এবং হালাল পন্থা সহজ হয়ে যায়। এক হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً

'সর্বাপেক্ষা বেশি বরকতপূর্ণ বিবাহ সেটাই, যাতে খরচা খুব কম হয়' অর্থাৎ, ধুমধাম ছাড়া সহজ-সরলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৩৩৮৮)

বোঝা গেল, যত বেশি টাকা খরচ করা হবে এবং যত বেশি ধুমধাম করা হবে বরকতও তত কম হবে।

হযরত 'আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ (রাযি.)-এর বিবাহ

হযরত 'আবদ্দুর রহমান ইবন 'আওফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী। 'আশ্যারায়ে মুবাশ্‌শারার একজন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতেই একসংগে যেই দশজন সাহাবী সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তারা জান্নাতে যাবেন, তিনিও তাদের একজন। একবার তিনি মজলিসে হাজির হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জামায় হলদে রং দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জামায় রং কিসের ?

তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। বিবাহকালে যে সুগন্ধি লাগানো হয়েছিল এটা তার রং। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَعَلَيْكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

'আল্লাহ তা'আলা এ বিবাহে তোমাকে বরকত দান করুন। অন্তত একটা ছাগল দিয়ে হলেও ওলীমা কর'।

(বুখারী, হাদীছ নং ১৯০৭: মুসলিম, হাদীছ নং ২৫৫৬: তিরমিযী, হাদীছ নং ১০১৪: নাসাঈ, হাদীছ নং ৩২৯: আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ১৮০৪: ইবন মাজা:: হাদীছ নং ১৮৯৭; আহমাদ, হাদীছ নং ১২২২৪)

লক্ষণীয় বিষয় হল, হযরত 'আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ (রাযি.) 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যতম সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। অথচ তিনি নিজ বিবাহানুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকলেন না। কেবল কি ডাকলেনই না! তাঁকে জানালেন না পর্যন্ত।

পরে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জামায় রংয়ের ছাপ দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন জানালেন যে, বিয়ে করেছেন। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও কোন অভিযোগ তুললেন না যে, তুমি নিজে নিজেই বিয়ে করে ফেললে? আমাকে জানালে না পর্যন্ত? অভিযোগ তো করলেনই না, উল্টো তাকে ওলীমা করার পরামর্শ দিচ্ছেন। এসবের কারণ শরী'আত বিবাহের ব্যাপারটাকে খুব সহজ করেছে। এর জন্য বিশেষ কোন অনুষ্ঠান করা এবং তাতে আত্মীয়-স্বজন, ঘনিষ্ঠজন ও সমাজের নেতৃবর্গকে রাখার কোন শর্ত আরোপ করেনি।

বর্তমানে বিবাহকে অত্যন্ত কঠিন করে তোলা হয়েছে

একবার হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি।

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৯৪৮: মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৬৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৪৪৮২)

ইনিও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী। সর্বদা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। অথচ বিবাহে দা'ওয়াত দিলেন না। কেন দিলেন না? দিলেন না এ জন্য যে, সে সময় বিবাহানুষ্ঠানের জন্য বিশেষ কোন আয়োজন করার রেওয়াজই ছিল না। বিবাহে ঘটা করতে হবে, মাসাধিককাল আগে থেকেই তার জন্য তোড়জোড় চালাতে হবে, গোটা খান্দানের মধ্যে ধুম পড়ে যাবে, মোটকথা এ জাতীয় হৈ হুল্লোড়ের কোন ব্যাপারই সে সময়কার বিবাহে ছিল না। অত্যন্ত সাদামাটাভাবেই তা সম্পন্ন করা হত। শরী'আত বিবাহকে এ রকমই সহজ করেছিল। কিন্তু আমরাই নিজেদের রসম-রেওয়াজ দ্বারা তাকে কঠিন করে ফেলেছি। আর তার খেসারতও আমাদেরকে দিতে হচ্ছে। অবিবাহিতা মেয়েকে দীর্ঘকাল ঘরে বসিয়ে রাখতে হচ্ছে । হয়ত যৌতুকের টাকা নেই। অথবা শানদার অনুষ্ঠান করার মত প্রস্তুতি নেই।

মোটকথা, বড় রকমের একটা খরচার ব্যাপার রয়েছে। তা জোগাড় না করা পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মূলত এসব রসম-রেওয়াজের আপদ আমরা হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের থেকে গ্রহণ করেছি। এ বিষয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য যে সুন্নত রেখে গেছেন আমরা তা ছেড়ে দিয়েছি। এর পরিণামে ইন্দ্রিয় চাহিদা পূরণের বৈধ পন্থা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেননা, হালাল উপায়ে চাহিদা পূরণ করতে হলে এখন গুচ্ছের খরচা প্রয়োজন। লাখ-লাখ টাকা দরকার। অত টাকা সকলের নেই। টাকা জোগাড় হলেই বিবাহ করতে পারবে, নইলে নয়। অন্যদিকে হারাম উপায়ে চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা চারদিকেই খোলা। যখন চাও, যেভাবে চাও তা গ্রহণ করতে পার। রাতদিন টিভি চলছে, ফিল্ম দেখা হচ্ছে। তা ইন্দ্রিয় চাহিদায় উত্তাপ ছাড়াচ্ছে। কামেচ্ছা প্রবল হয়ে উঠছে। পথে-ঘাটে বের হলে চোখ হেফাজত করা কঠিন। পরিণামে অশ্লীলতা, নগ্নতা ও নির্লজ্জতার অভিশাপ সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। এসব কিছুর মূলে ওই বিধর্মীয় রসম-রেওয়াজ। ওইসব রসম-রেওয়াজ আমাদের সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

যৌতুক বর্তমান সমাজের একটি অভিশাপ

এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি দায়িত্ব বর্তমান বিত্তবান শ্রেণীর উপর। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রতিরোধে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ না নেবে ততক্ষণ এ অভিশাপ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। তাদেরকে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, 'আমরা কোনও রকম যৌতুকের কারবার করব না এবং বিধর্মীয় সব রসম-রেওয়াজ খতম করে ফেলব। তারা এ নীতি অবলম্বন না করা পর্যন্ত সমাজে পরিবর্তন আসবে না। কেননা, একজন গরীব লোক চিন্তা করে, আমাকে যতদূর সম্ভব নিজ মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে নাক উঁচু না রাখলে চলবে না। চোখে পড়ার মত খরচ না করলে আমার ইজ্জত থাকবে না। মানসম্মত যৌতুক না দিলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন মেয়েকে খোটা দেবে। ফকির-কঞ্জুস বলে গাল দেবে। বর্তমানকালে যৌতুককে বিবাহের এক অপরিহার্য অনুসংগ বানিয়ে ফেলা হয়েছে। ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র জোগাড় করা, যেখানে স্বামীর দায়িত্ব ছিল, সেখানে এখন তা স্ত্রীর বাবার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জামাতার হাতে নিজ কলিজার টুকরাকে সমর্পণ করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে মোটা অংকের টাকা ও জামাতার ঘর সাজানোর জন্য দামি ফার্নিচারও দিতে হবে। অর্থাৎ নিজেকে সর্বস্বান্ত করে হলেও অন্যের ঘর আবাদ করে দিতে হবে। অথচ শরী'আতে এর কোনওই ভিত্তি নেই। কিন্তু বেচারা গরীবগণ আজকাল এটা করতে বাধ্য। অন্যথায় মেয়ের বিয়ে হবে না। হলেও তাকে বহুমুখী নির্যাতন সইতে হবে। কাজেই এর থেকে নিস্তার পেতে হলে ধনী ও বিত্তবান শ্রেণীকেই এগিয়ে আসতে হবে। তারা যখন সহজ সরলভাবে বিয়েশাদি সম্পন্ন করবে এবং এটাকে একটা আন্দোলনের রূপ দেবে তখনই সমাজ ধীরে-ধীরে এ অভিশাপ থেকে নিস্তার পাবে। অন্যথায় এ আযাব দূর করা কঠিন। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদের অন্তরে বিষয়টা জাগিয়ে দিন। আমীন।

স্ত্রীকে হুকুম করতাম যেন স্বামীকে সিজদা করে

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

'হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি যদি কাউকে কারও সিজদা করার হুকুম করতাম, তবে স্ত্রীকে হুকুম করতাম যেন সে তার স্বামীকে সিজদা করে।

(তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৭৯; ইবন মাজাঃ, হাদীছ নং ১৮৪৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১২১৫৩

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে যেহেতু সিজদা করা জায়েয নয়, তাই আমি এ হুকুম করছি না। কিন্তু তা যদি জায়েয হত, কোন মানুষকে যদি সিজদা করার অনুমতি থাকত, তবে স্ত্রীকে বলতাম, যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।

এটা দুই হৃদয়ের সম্পর্ক

বস্তুত জীবনের পরিভ্রমণে নর-নারীর মিলিত জীবন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ধারক। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে আমীর ও তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে পুরুষের হাতে যে নেতৃত্ব, এটা অন্যান্য নেতৃত্বের মত নয়। অন্যসব নেতৃত্ব হয় সাময়িক। আজ একজন নেতা তো কাল আরেকজন। কেউ যখন কোন দেশের অধিপতি হয়, তার সে অধিপতিত্ব হয় নির্দিষ্টকালের জন্য। গতকাল পর্যন্ত একজন ছিল রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্তু আজ আর সে রাষ্ট্রপ্রধান নয়। আজ সে জেলখানায় বন্দী। তার স্থানে অন্য একজন মসনদে আমীর। সাবেক প্রধানকে আজ কেউ কানাকড়ি দিয়েও পোঁছে না। সুতরাং এসব নেতৃত্ব ও অধিপতিত্ব বড় ক্ষণস্থায়ী। আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সারা জীবনের। তাদের সংগ প্রতিক্ষণের, সখ্য প্রতি নিঃশ্বাসের। কাজেই এ সম্পর্কের ভিত্তিতে পুরুষের যে নেতৃত্ব লাভ হয়, তা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। কিংবা দাম্পত্য সম্পর্ক যতদিন স্থায়ী থাকে এ নেতৃত্বও ততদিন বলবৎ থাকে। তাই বলি এ নেতৃত্ব অন্যসব নেতৃত্ব থেকে আলাদা। সেসব নেতৃত্বে নেতা ও তার অধীনের মধ্যে এক ধরনের আইনগত সম্পর্ক কার্যকর থাকে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল আইনগত ব্যাপার নয়। বরং এটা হৃদয়ের সম্পর্ক। এতে থাকে দুই প্রাণের সম্মিলন। তাই দাম্পত্যসংশ্লিষ্ট সব কিছুতেই থাকে তাদের মিলিত প্রাণের ছোঁয়া এবং এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কাউকে কারও সিজদা করার হুকুম করলে নারীকেই হুকুম করতাম যেন তার স্বামীকে সিজদা করে, যেহেতু সে তার সারাটা জীবনের নেতা।

সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসার জন

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি হল প্রত্যেককে তার নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা। যখন স্বামীকে সম্বোধন করে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, তখন সবটা কথাই ছিল স্ত্রীর হক সম্পর্কে। এক-এক করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক হচ্ছে এই-এই।

তোমাকে এসব হক সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আবার যখন নারীকে লক্ষ করে নির্দেশনা দিচ্ছেন, তখন তাকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। তিনি নারীকে জানাচ্ছেন, তোমাকে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর ভূ-পৃষ্ঠে তোমার সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ও সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসার উপযুক্ত ব্যক্তি তোমার স্বামী। তুমি যতক্ষণ এ সত্য উপলব্ধি করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার দ্বারা তার হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় হবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম সকলের উপর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন হুকুম এসে গেলে তার বিপরীতে বাবা-মা, স্বামী কারও কোন আনুগত্য চলবে না। তার বিপরীত না হলে সেক্ষেত্রে স্বামীর স্থান সকলের উপরে। কাজেই তাকে খুশি করার ফিকির কর। তার হক আদায়ের চেষ্টা কর ও তার আনুগত্যে যত্নবান থাক।

আধুনিক সভ্যতার সব কিছুই উল্টো

বর্তমানকালে সবকিছুই উল্টোদিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। হযরত ক্বারী তাইয়্যেব ছাহেব (রহ.) বলতেন, আধুনিক সভ্যতায় সবকিছু উল্টে গেছে। এমনকি প্রদীপকেই দেখুন না। আগে বাতির নেচে অন্ধকার থাকত আর এখন বাতির উপরে (অর্থাৎ ঝুলন্ত বাল্বের উপরে) অন্ধকার থাকে। এলট-পালট যে কতটা হয়েছে তা পারিবারিক জীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ঘরকন্নার কাজটাই দেখুন না। যদিও তা শরীয়তী আইনে স্ত্রীর দায়িত্ব নয়, কিন্তু এটা হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সুন্নত তো অবশ্যই। হযরত ফাতেমা রাযিলাল্লাহু আনহা ঘরের সব কাজ নিজ হাতে করতেন। অন্যদিকে স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করারও হুকুম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোন নারী যদি ঘরের কাজকর্ম করে এবং স্বামী-সন্তানের জন্য রান্নাবান্না করে তবে তার বিনিময়ে তার জন্য প্রভূত ছওয়াব লেখা হয়। কিন্তু অধুনা উল্টো সভ্যতার সবক হল নারী কেন ঘরে বসে থাকবে ও ঘরের কাজ কর্ম করবে? এটা পশ্চাদপদতা। এটা সেকেলে ধারণা। ঘরের চার দেয়ালে সে আর বন্দী থাকবে না। সুতরাং নারী আজ ঘরের কাজ করতে রাজি নয়। অথচ এ নারীই যখন উড়োজাহাজে এয়ার হোস্টেস হয়ে চারশ' লোককে খাবার দেয়, ট্রে সাজিয়ে তাদের সামনে নিয়ে যায়, চারশ' লোকের বিপজ্জনক দৃষ্টির লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়, একজন তার থেকে এক কাজ নেয় তো অন্যজন তাকে অন্য কাজের ফরমায়েশ করে, এমনকি অহেতুকও কাজ নিতে

চায়, বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ডাক দেয়, অহেতুক কথা বলে, বিনা দরকারেও কোন একটা কাজ করে দিতে বলে, সে হাসিমুখেই তা বরণ করে নেয়। আধুনিক সভ্যতা এই সেবার নাম দিয়েছে স্বাধীনতা, আবার সেই নারীই ঘরে স্বামী-সন্তান ও ভাইবোনদের সেবা করলে তাকে বলা হচ্ছে দাসীবৃত্তি এবং প্রগতিবিরোধী কাজ।

একই নারী হোটেলে ওয়েটার হিসেবে কাজ করছে, রাত দিন মানুষের সেবা করছে, খাবার খাওয়াচ্ছে, পানি ঢেলে দিচ্ছে আর বলা হচ্ছে সে নারী স্বাধীনতা ভোগ করছে। সে কারও সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছে বা স্টেনোগ্রাফারের কাজ করছে আর বলা হচ্ছে এটা তার স্বাধীনতা, কিন্তু সে-ই আবার ঘরের ভেতর থেকে স্বামী-সন্তান ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ির খেদমত করলে বলা হয় সেকেলেপনা। কবি বলেন,

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا نام خرد

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

'বুদ্ধিমত্তার নাম রেখে দিলে পাগলামি আর পাগলামির নাম বুদ্ধিমত্তা,
গুণী হে! কত কারিশামাই না আপনি দেখাতে পারেন!

স্ত্রীর দায়িত্ব

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, দুনিয়ার কোনও ব্যক্তিরই সেবা করা তার দায়িত্ব নয়, তার উপর কোনও যিম্মাদারি নেই, কারও কোন ভার তার উপর ন্যস্ত করা হয়নি। সকল ভার ও সব দায়িত্ব থেকে তুমি মুক্ত। কেবল একটাই কাজ তোমার। তুমি নিজ ঘরে শান্ত হয়ে থাক, নিজ স্বামীর আনুগত্য কর এবং সন্তানের পরিচর্যা কর। ব্যস এই তোমার দায়িত্ব। এর মাধ্যমেই তুমি জাতি গঠনের ভূমিকা রাখতে পার। এরই দ্বারা তুমি হতে পার জাতির কর্ণধার। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে এই সম্মানজনক স্থান দান করেছেন। এখন তোমার ইচ্ছা, এই স্থান তুমি গ্রহণ করবে, না নিজের জন্য লাঞ্ছনা ডেকে আনবে। যারা শরী'আতপ্রদত্ত মর্যাদা উপেক্ষা করে মরিচিকার পেছনে ছুটছে তারা নিজেদের কী লাঞ্ছনাকর জীবনে নিয়ে গেছে তা তো চর্মচক্ষেই দেখা যাচ্ছে।

সেই নারী সোজা জান্নাতে যাবে

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

'হযরত উম্মু সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী এ অবস্থায় মারা যাবে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।

(তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৮১; ইবন মাজাঃ, হাদীছ নং ১৮৪৪)

তারা তোমাদের দিন কতকের অতিথি

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ. قَاتَلَكِ اللهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রাযি.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কাউকে তার স্ত্রী দুনিয়ায় কষ্ট দান করে, তখন তার হুর স্ত্রী বলে, তাকে কষ্ট দিও না। সে তো তোমার কাছে কয়েক দিনের অতিথি। শীঘ্রই সে তোমাকে ত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে আসবে'। (তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৯৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২১০৮৫)

কখনও কখনও স্ত্রীর মেজায-তবীয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। তাই সামান্য কারণেও তা বিগড়ে যায়। কারণে-অকারণে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এর ফলে সে স্বামীকে কষ্ট দিয়ে বসে। ওদিকে নেককার পুরুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী স্ত্রীরও ব্যবস্থা রেখেছেন। তারা হল আয়তলোচন পবিত্র হুর। দুনিয়ার স্ত্রী নেককার স্বামীকে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী স্ত্রী তাকে অভিশাপ দেয় যে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নষ্ট-ভ্রষ্ট স্বভাবের নারীদেরকে লক্ষ করে বলছেন, তোমরা স্বামীদেরকে কষ্ট দিও না। কেননা, কষ্ট দিলে প্রকৃতপক্ষে তার কোন ক্ষতি নেই। ক্ষতি তোমারই। তুমি তাকে কষ্ট দিলে কতদিন দিতে পারবে। দুনিয়ার সামান্য ক'দিনের জীবনেই তো ! তারপর সে জান্নাতে চলে যাবে। সেখানে তার জন্য যে 'আয়তলোচনা হুর স্ত্রী' রয়েছে তারা তাকে কষ্ট দেবে না। তারা তাকে বেজায় ভালোবাসবে। বরং তোমরা যে স্বামীদেরকে কষ্ট দিচ্ছ এ কারণে সেই স্ত্রীগণ ব্যাথা পাচ্ছে। ফলে তারা তোমাদেরকে অভিশাপ দেয় এবং কষ্টদান থেকে নিবৃত্ত হতে বলে।

পুরুষের জন্য কঠিন পরীক্ষা

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

'হযরত উসামা ইবন যায়দ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন, আমি আমার পরে এমন কোন ফিত্না (পরীক্ষা) রেখে যাইনি, যা পুরুষদের পক্ষে নারীদের ফিত্না অপেক্ষা বেশি ক্ষতিকর।'

দুনিয়ায় পুরুষদের পক্ষে নারীর ফিত্নাই সর্বাপেক্ষা কঠিন ফিত্না। এর ব্যাখ্যা লিখলে একটা মোটা বই হয়ে যাবে। নারীগণ যে কতভাবে পুরুষদের জন্য ফিত্না তার তালিকা বড় দীর্ঘ।

নারী কিভাবে পুরুষের জন্য পরীক্ষা

ফিতনা অর্থ পরীক্ষা। আল্লাহ ইহজগতে নারীদেরকে পুরুষদের জন্য পরীক্ষার বিষয় বানিয়েছেন। এক সংক্ষিপ্ত মজলিসে সে পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া তো সম্ভব নয়, তাই কিছুটা ইশারা করে দেওয়া যাচ্ছে।

এক পরীক্ষা তো আমরা হযরত ইয়ূসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা দ্বারা জানতে পারি। তিনি নারী দ্বারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন! আল্লাহ পুরুষের অন্তরে নারীর প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ রেখেছেন। সেই সাথে তিনি হালাল ও হারাম উভয় পন্থা জানিয়ে দিয়েছেন। এবার তার পরীক্ষা, সে তার স্বভাবগত আকর্ষণের ভিত্তিতে নারীকে পাওয়ার জন্য হালাল পন্থা অবলম্বন করে, না হারাম পন্থা। এ পুরুষের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা।

দ্বিতীয় পরীক্ষা হয় এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা যে নারীকে তার জন্য হালাল করেছেন, অর্থাৎ তার স্ত্রী, তার প্রতি সে কি রকম আচরণ করে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রকম আচরণ করতে বলেছেন, সে রকমই করে, না সে তার প্রতি দুর্ব্যবহার করে ও তার হক নষ্ট করে?

তৃতীয় পরীক্ষার বিষয় হল, সে স্ত্রীর ভালোবাসায় সীমালংঘন করে না তো? অর্থাৎ এমন তো নয় যে, সে তার ভালোবাসার মধ্যে গিয়ে দীনের বিধানাবলী অগ্রাহ্য করছে? সে হয়ত শুনেছে যে, স্ত্রীর হকসমূহ আদায় করা জরুরি ও তাকে খুশি রাখা বাঞ্ছনীয়। এখন সে বৈধ-অবৈধ নির্বিচারে, তার মনোরঞ্জন করে চলছে। তার অবৈধ ইচ্ছাও পূরণ করছে। দ্বীনী শিক্ষা ও মেজায অনুযায়ী তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে না। এটাও তার এক পরীক্ষা। সুতরাং স্বামীকে একদেশদর্শী হলে চলবে না, দু'দিকেই নজর রাখতে হবে। একদিকে মহববতের দাবি স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি না ধরা। অন্যদিকে দ্বীনের দাবি শরী'আতবিরোধী কাজে তার সংশোধন করা। মোটকথা, পরীক্ষার কোন শেষ নেই। আল্লাহ তা'আলার সাহায্যেই এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা যাকে তাওফীক দেন, সে স্ত্রীর হক ও আদায় করবে এবং তার তালিম-তরবিয়তের দিকেও লক্ষ রাখবে। স্ত্রীর

লাভ-ক্ষতির ব্যাপারেও সতর্ক থাকবে এবং সে যাতে হারাম ও অবৈধ কিছুতে জড়িয়ে না যায়, সে দিকেও লক্ষ রাখবে। এভাবে সকল ক্ষেত্রে উভয় দিকে লক্ষ রাখা সহজ নয়। আল্লাহর বিশেষ তাওফীক দ্বারাও এতে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। এ কারণেই নবীজি দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاۤءِ

হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে নারীদের ফিত্‌না থেকে পানাহ চাই।

(কানযুল-'উম্মাল, ২খ, ১৮৯, হাদীছ নং ৩৬৮৭; জামি'উল-আহাদীছ, হাদীছ নং ৫০৪৩)

এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য ও সফলকাম হওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য দরকার। তার তাওফীক ছাড়া এতে সাফল্য সম্ভব নয়। কাজেই সকলের উচিত আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হওয়া ও দু'আ করা যে, হে আল্লাহ ! এ পরীক্ষায় আপনি আমাকে কৃতকার্য করুন, যাতে ভুল-ভ্রান্তি না হয়, পদস্খলিত না হই, সে ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। তাই নিজ দু'আসমূহের মধ্যে উপরে বর্ণিত দু'আটিও শামিল রাখা চাই।

প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ-নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'

(বুখারী হাদীছ নং ৮৪৪; মুসলিম, হাদীছ নং ৩৪০৮; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৬২৭; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২৫৩৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৪৯২০)

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও সারগর্ভ হাদীছ, কথা অল্প, কিন্তু মর্ম বিস্তর। এটা বলা হয়েছে আমাদের প্রত্যেককেই উপর কোনও না কোনও দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। প্রত্যেকের উপরই কোনও না কোনও বস্তু এবং কোনও না কোনও ব্যক্তির দেখাশোনা করার ভার অর্পিত রয়েছে। সে দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে যে, তা কতটুকু আদায় করেছে।

رَاعٍ এর মূল অর্থ তত্ত্বাবধায়ক, রাখাল, শাসক। রাখালের দায়িত্ব গবাদি পশুর তত্ত্বাবধান করা, শাসকের দায়িত্ব জনগণের তত্ত্বাবধান করা। প্রজাসাধারণকে رَعِيَّةٌ বলা হয়, যেহেতু তারা শাসকের তত্ত্বাবধানাধীন থাকে। তো মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই 'তত্ত্বাবধায়ক'। প্রত্যেককে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে তাদের তত্ত্ববধানকার্য কি রকম করেছে।

রাষ্ট্রনায়ক জনগণের তত্ত্বাবধায়ক

উপরিউক্ত হাদীছের পরবর্তী অংশ হল وَالْأَمِيْرُ رَاعٍ 'আমীর তত্ত্বাবধায়ক'। প্রত্যেক আমীরই তার অধীন ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধায়ক। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, সে তাদের তত্ত্বাবধানকার্যের দায়িত্ব কতটুকু আদায় করেছে? ইসলামে আমীর সম্পর্কে ধারণা এ রকম নয় যে, তিনি মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরে সকলের থেকে আলাদা হয়ে যাবেন এবং মানুষের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দেবেন। বরং এ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হল যে, আমীর একজন রাখাল, এ কারণেই হযরত 'উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, ফোরাত নদীর তীরে কোন কুকুরও যদি ক্ষুধার্ত মারা যায়, তবে আমার ভয় হয় কিয়ামতের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'উমর তোমার শাসনকালে ফোরাতের তীরে কুকুর অনাহারে মরল কেন?

খিলাফত মূলত এক কঠিন দায়িত্ব ভার

এ কারণেই শাহাদতের আগে হযরত 'উমর রাযিয়াল্লাহু 'আনহু যখন মারাত্মক আহত, তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল আপনার পরে কে খলীফা হবে আপনি নিজেই তা ঠিক করে দিন। কেউ-কেউ বলেছিল, আপনার পুত্র হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রাযি.)কেই খলীফা বানিয়ে যান। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রাযি.) একজন মহান সাহাবী। জ্ঞান-গরিমা, তাক্ওয়া-পরহেযগারি, ইখলাস ইত্যাদি কোনও ব্যাপারেই তাঁর সম্পর্কে কারও কোন অভিযোগ তোলার সুযোগ ছিল না। অথচ লোকেরা হযরত ফারুকে আযম (রাযি.)-এর সামনে তাঁর নাম উল্লেখ করলে তিনি এই বলে সে প্রস্তাব নাকচ করে দেন যে, 'তোমরা আমার সামনে খলীফা হিসেবে এমন এক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করছ, যে নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়মও জানে না।

ঘটনা এ রকম, হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু তা দিয়েছিলেন স্ত্রীর ঋতুকালীন সময়ে। অথচ এ সময় তালাক দেওয়া জায়েয নয়। তাঁর সে মাস'আলা জানা ছিল না। পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সে তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়ার হুকুম দেন। তিনি প্রত্যাহার করে নেন (এক বা দুই রাজ'ঈ তালাকের ক্ষেত্রে প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে)। হযরত 'উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ঘটনার দিকে ইশারা করেই বলেছিলেন, 'তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে খলীফা বানাতে চাচ্ছ, যে কিনা স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়মও জানে না'। আমি কিভাবে তাকে খলীফা বানাতে পারি?

লোকে পীড়াপীড়ি করতে থাকল। তারা বলল, সে কিস্‌সা খতম হয়ে গেছে মাস'আলা জানা না থাকার কারণেই তিনি তা করেছিলেন। সেই ঘটনার কারণে তিনি খিলাফতের অনুপযুক্ত হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই এর উপযুক্ত। আপনি তাকে খলীফা বানিয়ে দিন। এর উত্তরে হযরত ফারুকে আজম (রাযি.) যে কথা বলেন, তা চির স্মরণীয়। তিনি বলেন খিলাফতের ফাঁস খাত্তাবের সন্তানদের মধ্যে একজনের গলায় পড়েছে এই যথেষ্ট। তারপর আর এ খান্দানের অন্য কারও গলায় এ ফাঁস লাগাতে চাই না। খিলাফত ও নেতৃত্ব অনেক বড় যিম্মাদারি, এটা অনেক ভারী বোঝা। আখিরাতে যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে হিসাব দিতে দাঁড়াব, তখন যদি সমান-সমানেও পার পাই সেটাকেই অনেক বড় প্রাপ্তি মনে করব।

ইসলামে এটাই নেতৃত্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি। নিজেকে একজন রাখাল মনে করা, দায়িত্বের ভারবাহী মনে করা আর চিন্তা করা যে, আমাকে জবাবদিহি করতে হবে এর হক আমি কিভাবে আদায় করেছি।

স্বামী হচ্ছে স্ত্রী ও সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক

তারপর ইরশাদ করেন-

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

'পুরুষ তার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধায়ক। পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যবর্গ সকলেই শামিল। সে তাদের সকলের কর্তা। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, পরিবারের যে সদস্যদেরকে তোমার দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছিল, তোমার সেই বিবি-বাচ্চাদের সাথে তোমার আচরণ কেমন ছিল? তুমি তাদের কেমন তত্ত্বাবধান করেছিলে? তাদের হকসমূহ কতটা আদায় করেছিলে? তারা দ্বীনের উপর চলছে কি না, সে খবর রেখেছিলে কি? তারা জাহান্নামের পথে যাতে না চলে সে ব্যাপারে সতর্ক ছিলে কি? এ গুলোকে তুমি নিজ দায়িত্ব মনে করেছিলে কি? তোমার অন্তরে এ দায়িত্ব পালনের সদিচ্ছা জেগেছিল কি? কিয়ামতের দিন পুরুষকে এসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

'হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজ পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর' (তাহরীম : ৬)

আয়াত বলছে, কেবল নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চিন্তাই যথেষ্ট নয়। নিজে তো নামায পড়ছ, রোযা রাখছ, ফরয-ওয়াজিব আদায় করছ, নফল ইবাদত ও তাসবীহ-তাহ্লীলও করছ, অন্যদিকে ছেলেমেয়ে ভুল পথে চলছে সে দিকে লক্ষ নেই, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চিন্তা নেই। এ রকমই যদি হয়, তবে মনে রেখ নিজেও বাঁচতে পারবে না। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কৈফিয়ত দিতে হবে কেন নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করনি? কাজেই আযাব কেবল তাদেরকেই দেওয়া হবে না, তোমাকেও দেওয়া হবে। তাই বলা হয়েছে 'পুরুষ তার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধায়ক'।

নারী স্বামীগৃহ ও তার সন্তানদের তত্ত্ববধায়ক

তারপর ইরশাদ করেন-

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ

'এবং নারী তার স্বামীগৃহ ও তার সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক'। এতে নারীর কাঁধে দু'টি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। স্বামীর ঘর রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সন্তানদের দেখাশোনা করা। অর্থাৎ সতর্ক থাকবে যাতে ঘরের আসবাবপত্র ও মালামাল ঠিকঠাক থাকে, নষ্ট না হয় ও চুরি না যায়। ঘরের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার যথাযথ তদারকি করা তার দায়িত্ব। আর দ্বিতীয় দায়িত্ব হল সন্তানদের সঠিক পরিচর্যা করা। তাদের পার্থিব সেবা-যত্নও করবে এবং দ্বীনী পরিচর্যাও করবে। এ সব স্ত্রীর দায়িত্ব। এ হাদীছে এভাবে প্রত্যেকের দায়িত্ব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা আদায়ের জন্য সচেতন করা হয়েছে।

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর আদর্শ অনুসরণ করুন

হযরত ফাতেমা (রাযি.) জান্নাতের সমস্ত নারীর মধ্যমণি। বিবাহের পর যখন হযরত 'আলী (রাযি.)-এর বাড়ীতে আসলেন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন হযরত 'আলী (রাযি.) বাইরের কাজ সামলাবেন আর হযরত ফাতেমা (রাযি.) ঘরের কাজ করবেন। সেমতে তিনি ঘরের কাজকর্ম করতেন। আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে সবকিছু আনজাম দিতেন। স্বামীর সেবা-যত্নও করতেন। এতে খুব মেহনত হত। আজকালের মত তো নয় যে, সুইচ অন করে দিল আর খাবার তৈরি হয়ে গেল। কতদিন আগের কথা! রুটি বানাতে হলে প্রথমে চাক্কি দ্বারা আটা পিষতে হত। চুলা জ্বালানোর জন্য কাঠ আনতে হত। সবকিছুই প্রাচীন দিনের শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

সুতরাং তাঁর কাজের এক দীর্ঘ তালিকা ছিল। কিন্তু তিনি তা করতেন। আগ্রহের সাথেই করতেন। এতে অনেক কষ্ট হত। পরে খায়বার যুদ্ধে যখন

প্রচুর গনীমতের মাল আসল, যার মধ্যে অনেক গোলাম-বাঁদীও ছিল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বন্টন করছিলেন, তখন কেউ এসে হযরত ফাতেমা (রাযি.)-কে বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি দাসী চান। তাতে আপনার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে। সুতরাং তিনি 'উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু 'আনহার ঘরে এসে হাজির হলেন এবং তাকে অনুরোধ করলেন, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন যে, চাক্কি পিষতে পিষতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে এবং পানির মশক বইতে বইতে কাঁধে নীল দাগ পড়ে গেছে। যেহেতু গনীমতের মাল বন্টন হচ্ছে, তাতে বহু গোলাম-বাঁদীও আছে, তাই আমাকে যদি একটি গোলাম বা বাঁদী দেওয়া হয়, তাতে আমি এই কষ্ট থেকে কিছুটা মুক্তি পাই। এই বলে তিনি নিজ বাড়িতে চলে গেলেন।

তারপর যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে আসলেন, হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মেয়ে ফাতেমা এসেছিল এবং এই এই বলছিল। দয়ার সাগর প্রিয়নবী ! কোনও বাপ যখন তার আদরের দুলালী সম্পর্কে শোনে, চাক্কি পিষতে পিষতে হাতে কড়া পড়ে গেছে আর মশক বইতে বইতে কাঁধ নীল হয়ে গেছে, তখন কল্পনা করুন তার অন্তরে আবেগের কি তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। আর এ তো দয়ার নবী ও তার প্রাণপ্রিয় কন্যার ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখুন নবীজি তাঁর আদরের দুলালীকে কী শেখাচ্ছেন।

তিনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে ডাকালেন। বললেন, ফাতেমা! তুমি দাস বা দাসীর জন্য অনুরোধ করেছ। কিন্তু আম্মা! যতক্ষণ মদীনার প্রত্যেকের ভাগে একটি দাস বা দাসী না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তো মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাকে কোন দাস-দাসী দিতে পারি না ! তবে হ্যাঁ, আমি তোমাকে একটা ব্যবস্থা দিচ্ছি, যা তোমার পক্ষে দাস-দাসী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হবে। রাতে তুমি যখন বিছানায় যাবে এবং ঘুমানোর ইচ্ছা করবে তখন তেত্রিশ বার سُبْحَانَ اللهِ তেত্রিশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং চৌত্রিশবার اَللهُ اَكْبَرُ পড়ে নেবে। এটা তোমার জন্য দাস-দাসী অপেক্ষা উত্তম। মেয়েও তো ছিলেন দোজাহানের সর্দার সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি পাল্টা কিছু বললেন না। বরং এ শিক্ষাতেই তিনি খুশি হয়ে গেলেন এবং শান্ত মনে বাড়ি ফিরে গেলেন। এ কারণেই একে তাসবীহে ফাতেমী বলে।

(জামি'উল-উসূল, ৬খ, ১০৫)

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কন্যাকে জগতের নারী সমাজের জন্য এক উৎকৃষ্ট আদর্শ বানিয়ে দিয়েছেন। তার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, স্ত্রী কেমন হতে হয়। আইনগত অধিকার যাই হোক না কেন, সুন্নত তাই যা আমরা হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু 'আনহার মধ্যে দেখতে পাই। অর্থাৎ নারী ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। আর সে হিসেবে ঘরের যাবতীয় কাজকে নিজের কাজ মনে করে আন্তরিকতার সাথে তা আনজাম দেবে।

সন্তানের তালিম-তরবিয়াত মায়ের দায়িত্ব

স্ত্রী কেবল ঘরের তত্ত্বাবধায়কই নয়, সন্তান-সন্ততির তদারক করাও তার দায়িত্ব। সন্তানের লালন-পালন। তার সেবা-যত্ন, দৈহিক ও মানসিক পরিচর্যা, ও আদব-কায়দা শেখানোর দায়িত্বও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর উপরই অর্পণ করেছেন। সন্তানের সঠিক তারবিয়াত যদি না হয় এবং ইসলামী আদব কায়দা সে না শেখে, তবে সে সম্পর্কে প্রথমে মাকেই জবাবদিহি করতে হবে এবং তারপর বাবাকে। কেননা এর যিম্মাদারি প্রথমত মায়ের উপরই বর্তায়। সুতরাং জিজ্ঞেস করা হবে তুমি তোমার কোলের সন্তানকে দ্বীন ও ঈমান কেন শেখালে না? তার মধ্যে ইসলামী আদব-কায়দা জন্মাল না কেন?

তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন 'নারীকে তার স্বামীগৃহ ও তার সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে'। তারপর পুনরায় প্রথম বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্বাধীন বিষয়াবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে'।

আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদের প্রত্যেককে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য বোঝার ও তা পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত খণ্ড : পৃষ্ঠা : ৭৩-১১৬

স্ত্রীকে ভালোবাসা দুনিয়াদারি নয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) কোন এক মুরীদের চিঠির উত্তরে লেখেন, স্ত্রীর ভালোবাসা দুনিয়া বটে, কিন্তু বৈধ, বরং প্রশংসনীয় কাজ যদি না তাতে দ্বীনের ব্যাপারে গাফলতি দেখা দেয়। স্ত্রীর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যই কাম্য। তাক্ওয়া বৃদ্ধি পেলে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাও বেড়ে যায়। (আনফাসে 'ঈসা, পৃ.১৭৫)

পাপকাজে উৎসাহ যোগায় এমন সব কিছুই দুনিয়া

কুরআন-হাদীছে যে দুনিয়ার নিন্দা করা হয়েছে, তা হচ্ছে পাপকর্মে প্রেরণাদায়ী বিষয়াবলী। যেমন বলা হয়েছে-

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

'দুনিয়াপ্রেম' সকল গুনাহের মূল'। (কানযুল-উম্মাল, ৩খ,৩৫৩, হাদীছ ৬১১৪)

কুরআন মাজীদে ইরশাদ,

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

'পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ মাত্র'। (হাদীদ : ২০)

এ জাতীয় আয়াত ও হাদীছে দু'রকম জিনিস বোঝানো হয়েছে, ক. দুনিয়ার সাথে এমন গভীর সম্পর্ক, যদ্দরুন গুনাহের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। ফরয ও ওয়াজিব কাজে গাফলতিও গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। খ. বৈধ বিষয়াবলীতে গভীর আসক্তি।

বৈধ বিষয়াবলীতে নিমগ্নতাও দুনিয়া

দুনিয়ার সাথে যে সম্পর্ক সরাসরি গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করে না, কিন্তু অতিরিক্ত মগ্নতা সৃষ্টি করে দেয়, যদ্দরুন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই একই ধ্যান, পার্থিব বিষয়-আসয় ছাড়া মনে আর কোন চিন্তা জাগে না, কোথায় কি বৈধ ব্যাপার আছে সেই ভাবনাই মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে, মনে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও আখিরাতের চিন্তা কখনও উঁকি দেয় না, এটাও এক ধরনের দুনিয়া। ফতোয়ার দৃষ্টিতে এ অবস্থাকে গুনাহ বলা যায় না বটে, যেহেতু এখনও পর্যন্ত কোন পাপকর্ম সংঘটিত হয়নি, কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এ পর্যায়ের নিমগ্নতা শেষ পর্যন্ত মানুষকে গুনাহ পর্যন্ত নিয়ে যায়। কাজেই দুনিয়ার প্রতি এতটা মনোযোগও থাকা উচিত নয়।

দুনিয়ার সাথে যে সম্পর্ক উপরিউক্ত দুই পর্যায়ের নয়, তা ক্ষতিকর নয়। অর্থাৎ যে সম্পর্ক দ্বারা কার্যত গুনাহের কাজ সংঘটিত হয় না কিংবা এতটা নিমগ্নতাও দেখা না দেয়, যদ্দরুন সর্বক্ষণ ওই একই চিন্তা-ভাবনা মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে, সে পর্যায়ের সম্পৃক্ততা দূষণীয় নয়। তা দ্বারা ক্ষতি তো হয়ই না; বরং উপকারই সাধিত হয়। বরং এ জাতীয় সম্পর্ক আখিরাতের উন্নতি ও আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সোপান বনে যায়। সুতরাং মানুষের কর্তব্য উপরে বর্ণিত দুই স্তরের দুনিয়াদারি থেকে বেঁচে থাকা। তখন পার্থিব সম্পৃক্ততা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

রূমী (রহ.) বলেন,

چیست دنیا از خدا غافل شدن   نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

'দুনিয়া বলতে আল্লাহ সম্পর্কে গাফেল হওয়াকেই বোঝায়। পোশাক-আশাক, সোনা-দানা ও বিবি-বাচ্চা দুনিয়া নয়।

আল্লাহ ও আখিরাতের ব্যাপারে গাফেল হয়ে গেলেই দুনিয়া নিন্দনীয় হয়ে যায়, অন্যথায় অর্থ-সম্পদের পাহাড়ই গড়ে উঠুক না কেন, তা দুনিয়াদারি নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নিন্দনীয় নয়।

দুনিয়ায় লিপ্ত সকলেই কি কাফের?

জনৈক বুযুর্গ বলেন,

اہل دنیا کافران مطلق اند   ہر دم اندر بق بق و در حق حق اند

'দুনিয়াদারিতে লিপ্ত সকলেই কাফের। তারা সর্বক্ষণ দুনিয়া নিয়ে বকবক করে, সর্বক্ষণ এই নিয়েই মেতে থাকে'।

এ বুযুর্গকে দেখা যাচ্ছে দুনিয়ায় লিপ্ত সকলকেই কাফের বলে দিয়েছেন।

তার এ মন্তবের ব্যাখ্যা কি? ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন তিনি এর দ্বারা দুনিয়ার সাথে সেই নিবিড় সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন, যদ্দরুন লোক সম্পূর্ণরূপেই ইহলৌকিক হয়ে যায়, সে আখিরাতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ তা'আলাকেও বিশ্বাস করে না। সে তো কাফিরই বটে।

হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি এর বড় চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে মূল كافر مطلق উদ্দেশ্য এবং دنيادار বিধেয়। কাজেই যে অর্থ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। এতে সব দুনিয়াদারকে কাফের বলা হয়নি। বরং এর অর্থ হল, যত কাফের আছে, তারা সকলেই দুনিয়াদার। ইহজগতই তাদের ধ্যান-জ্ঞান। এছাড়া কিছু বোঝে না।

গাফলত ও উদাসিনতাই দুনিয়া

মোটকথা, ধন-সম্পদ ও আসবাব পত্রের নাম 'দুনিয়া' নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফিল হয়ে যাওয়াকেই 'দুনিয়া' বলে। আল্লাহ তা'আলার দ্বীন থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া, আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিতির কথা মনে না আসা ও আখিরাত সম্পর্কে বেখবর হয়ে হয়ে যাওয়াই মূলত 'দুনিয়া'। এই 'গাফলত' না থাকলে এই দুনিয়াই আখিরাতের পক্ষে সহায়ক হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই তো নিজ সত্তার হক আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। নিজ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়কে জরুরি সাব্যস্ত করেছেন। এসব হক আদায়ের লক্ষে অর্থোপার্জন করলে তাতে তো আল্লাহ তা'আলার হুকুমই পালন করা হয়। কাজেই এ কামাই-রোজগার গাফলত নয়। একে নিন্দনীয় দুনিয়া বলা যায় না।

এরূপ দুনিয়া সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে,

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ

'আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর'। (জুমু'আ : ১০)

এতে দুনিয়াকে আল্লাহর ফযল ও অনুগ্রহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আরোপিত দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ের লক্ষে অর্থোপার্জন করা হচ্ছে। এটা তো তাঁর ফযলই বটে। একে নিন্দনীয় দুনিয়া বলা যায় কি করে। বরং এটা দ্বীন এবং এটা আখিরাতের পক্ষে সহায়ক।

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা দ্বীনই বটে

হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি যে বলেছেন, 'স্ত্রীকে ভালোবাসা তো কাম্য'। তার কারণ কুরআন মাজীদে এ ভালোবাসাকে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

'তার একটি নিদর্শন হল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে সঙ্গিনী বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে প্রশান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও মমতা সঞ্চার করেছেন'।

(সূরা রূম : ২১)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাদীছ শরীফে এর হুকুম দিয়েছেন, তিনি বলেন,

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ وَاَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِيْ

'তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে শ্রেষ্ঠ। আর জেনে রেখ আমি আমার স্ত্রীদের কাছে শ্রেষ্ঠ।

অপর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

'তোমরা নারীদের প্রতি সদাচরণের উপদেশ গ্রহণ কর'।

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৭৮৭; মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৭১; তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৮৩; ইবন মাজা:, হাদীছ নং ১৮৪১)

এসব হাদীছের নির্দেশ পালনার্থে কেউ স্ত্রীকে ভালোবাসলে সেটা তার দুনিয়াদারি নয়; বরং প্রকৃষ্ট দ্বীনদারি এবং এটা অবশ্যই কাম্য।

তাক্ওয়ার বৃদ্ধিতে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাও বাড়ে

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, মানুষের অন্তরে যখন তাক্ওয়া বৃদ্ধি পায় তখন স্ত্রীর প্রতি মহব্বতও বেড়ে যায়। কেননা, সে জানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমার উপর স্ত্রীর বিভিন্ন হক আরোপিত রয়েছে। সেগুলো আদায় করা আমার কর্তব্য। সুতরাং সে নিয়তে যখন সে স্ত্রীর হকসমূহ আদায় করবে তখন এর জন্য তাকে ছওয়াব দান করা হবে।

আমাদের ও তাদের মহব্বতের মধ্যে প্রভেদ

এ কারণেই আওলিয়ায়ে কিরাম স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে ভরপুর মহব্বত করে থাকেন। আমরাও তাদের ভালোবাসি বটে, কিন্তু তারা যতটা ভালোবাসেন ততটা নয়। তা ছাড়া তাদের ও আমাদের ভালোবাসার মধ্যে অনেক পার্থক্য। আপাতদৃষ্টিতে একই মনে হয়। আমরাও ভালোবাসি, তারাও ভালোবসেন, আমরা তাদের সাথে হাসি-তামাশা ও আনন্দ ফুর্তি করি, তারাও করেন, আমরাও স্ত্রীর প্রতি আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি এবং তারাও তা করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয় মহব্বতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

তাদের মহব্বতের লক্ষ হয় হকসমূহ আদায়

পার্থক্য এই যে, আমরা ভালোবাসি পার্থিব আনন্দ উপভোগের জন্য। যেমন আমরা যে আমাদের সন্তানদের সাথে খেলাধুলা করি, তা করি আনন্দ পাই বলে। স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ হই এ কারণে যে, তাতে আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু আওলিয়া কিরাম যে মহব্বত করেন তাতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্য। তারা চিন্তা করেন, আমাদের প্রতি তাদের বহু হক আরোপিত আছে, সেগুলো আদায় করা আল্লাহ তা'আলার হুকুম। সেই হুকুম পালনের জযবাতেই তাঁরা তাদের ভালোবাসেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে তাদের যে নূর ও বরকত অনুভূত হয়, স্ত্রী ও সন্তানদের ভালোবাসা ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্টতায়ও সেই নূর ও বরকত তারা অনুভব করেন। সুতরাং স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে তাদের সম্পর্ক ও আমাদের সম্পর্কে আসমান-যমীনের পার্থক্য।

মহীয়সী স্ত্রীদের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনন্দ-ফুর্তি

আমি আমার শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী (রহ.)-এর কাছে শুনেছি, হযরত হাকীমুল-উম্মত থানভী (রহ.) একদিন বলেন, এক সময় আমার কাছে বিস্ময় বোধ হত যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ পুণ্যবতী স্ত্রীদের সাথে এমন আনন্দ-ফুর্তি কিভাবে করতেন, যেমনটা বিভিন্ন হাদীছে পাওয়া যায়। তিনি হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিচ্ছেন, নিজ কাঁধের পেছনে তাকে দাঁড় করিয়ে হাবশীদের সামরিক কসরত দেখাচ্ছেন, রাতে তাঁকে এগার নারীর কিস্‌সা শোনাচ্ছেন ইত্যাদি! আল্লাহ তা'আলার সাথে যাঁর

সার্বক্ষণিকের যোগাযোগ, যাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে, যাঁর কাছে ফিরিশতাদের নিয়মিত আসা-যাওয়া এবং ঊর্ধ্বজগতের সাথে যার নিবিড় সম্পর্ক, দুনিয়ার তুচ্ছ-ক্ষুদ্র বিষয়েও কিভাবে তাঁর দৃষ্টি থাকে? বিষয়টা চিন্তা করে আমার তাজ্জব লাগত।

আলহামদুলিল্লাহ, পরে বিষয়টা আমার বুঝে এসেছে। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। উভয় অবস্থা এক পাত্রে জমা হতে পারে। স্ত্রী-সন্তানদের সাথে যা করছেন মূলত তার ধরন একটু ভিন্ন। কেননা, তার নিকট সে সব ব্যাপারও আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীর প্রকাশ। কেননা, নিয়ত বদলের পর দুনিয়ার সব কাজেই সেই নূর দেখা দেয়, যা খালেস 'ইবাদতের মধ্যেই থাকে।

কুত্‌বী পড়ে ঈসালে ছওয়াব

আমি আমার মহান পিতার কাছে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর একটি ঘটনা শুনেছি। একদা তিনি কুত্‌বী (যুক্তিবিদ্যার বিখ্যাত গ্রন্থ) পড়াচ্ছিলেন। এসময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মায়ের ইন্তিকাল হয়ে গেছে। ঈসালে ছওয়াবের দরখাস্ত। হযরত (রহ.) হাত তুলে দু'আ শুরু করে দিলেন, হে আল্লাহ! আমরা যে সবক পড়ছিলাম এর সওয়াব তাকে পৌঁছিয়ে দিন। লোকটি হয়রান। কুতবীরও কি ঈসালে ছওয়াব হয়? কুরআন মাজীদ বা হাদীছ শরীফ পড়ে ঈসালে ছওয়াব করলে একটা কথা ছিল। কুত্‌বী পড়ে কিভাবে ঈসালে ছওয়াব করা যায়?

হযরত (রহ.) বললেন, মিয়া, নিয়ত ঠিক থাকলে আমার দৃষ্টিতে বুখারী শরীফ ও কুতবীর ছওয়াবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বুখারী শরীফ পড়ে যে ছওয়াব পাওয়া যায়, সহীহ নিয়ত দ্বারা কুত্‌বী পড়েও সেই ছওয়াব পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

'মোল্লা হাসান'-এর দরসে অন্তরে 'আল্লাহ-আল্লাহ' জারি

আমি আমার মহান পিতার কাছে শুনেছি, আমার দাদা হযরত মাওলানা ইয়াসীন রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি বলতেন, আমরা হযরত শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি 'আলাইহির কাছে মোল্লা হাসান (মানতিক-যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ) পড়তাম। সবককালে আমরা নিজ কানে শুনতে পেতাম তার 'কলব' থেকে 'আল্লাহ-আল্লাহ' ধ্বনি আসছে। মানতিকের রচনাদিকে তো কেউ-কেউ 'ময়লা-আবর্জনা' নামেও অভিহিত করেছে। অথচ তারই সবকে হযরতের এই অবস্থা। নিয়ত সহীহ ছিল, তরিকা শুদ্ধ ছিল। সেজন্যই এমন বিষয়ের পঠন-পাঠনেও নূর ও বরকত পাওয়া যেত।

সুন্নতের ইত্তিবা'ই আসল জিনিস

আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিয়ত শুদ্ধ করে দিন। সব কিছুতে সুন্নতের অনুসরণ করার নিয়ত থাকা চাই। কেননা, জীবনের যে কোনও কাজের সাথেই সুন্নতের সম্পর্ক আছে। যাই করবে কোনও না কোনওভাবে সুন্নতের সাথে তার যোগসূত্র পাবে। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নত ব্যাপ্ত। কাজেই প্রতিটি কাজেই সুন্নতের অনুসরণ করার নিয়ত করে নিবে। তাতে সে কাজ শেষ পর্যন্ত কেবল দুনিয়া থাকবে না, দ্বীন হয়ে যাবে। ফলে দুনিয়াবী কাজেই সেই নূর ও বরকত লাভ হবে, যা খালেস 'ইবাদতে হয়ে থাকে। তখন আর সে কাজ নিন্দনীয় দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।

এর জন্য অনুশীলন দরকার

কিন্তু এটা এমনি এমনি হয়ে যাবে না। এর জন্য মশক করা চাই। আমাদের হযরত ডাক্তার 'আব্দুল-হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, আমি দীর্ঘদিন সুন্নতের ইত্তিবা' করার অনুশীলন নিয়েছি। যেমন সামনে খাবার রাখা আছে। সুস্বাদু খাবার। পেটে ক্ষুধাও আছে। এবং খেতে ইচ্ছাও হচ্ছে। কিন্তু তখনই না খেয়ে একটু বিলম্ব করেছি। ইচ্ছা করেছি, কেবল মনের চাহিদার কারণে খাব না। তারপর চিন্তা করেছি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর নিজ সত্তারও হক রেখেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল সামনে খাবার এলে আল্লাহ তা'আলার শুক্‌রের সাথে তা গ্রহণ করতেন। এবার আমি তাঁর সুন্নতের অনুসরণার্থে খানা খাব, তারপর 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে খানা শুরু করেছি। এভাবে নিয়ত সহীহ করেছি। নিয়ত যখন শুদ্ধ হয়ে গেছে, তখন সে খানা আর দুনিয়া থাকেনি, বরং দ্বীনে পরিণত হয়ে গেছে।

এভাবে ঘরে ঢুকেছি। শিশুপুত্র খেলছে। দেখে ভালো লাগছে। মনে চাইল তাকে কোলে নেই, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য থেমে গেছি। সংকল্প করলাম মনে চেয়েছে বলে এ কাজ করব না। তারপর চিন্তা করলাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদেরকে আদর করতেন। এবার আমিও তাঁর সুন্নতের অনুসরণার্থে শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করব। অনন্তর তাকে কোলে নিলাম। আদর করলাম। ব্যস সুন্নতের ইত্তিবা' করায় একাজও দ্বীনী কাজে পরিণত হয়ে গেছে।

সারকথা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত কাজ আছে, তার মধ্যে এমন কোন কাজ নেই, যাকে সহীহ নিয়তের মাধ্যমে সুন্নতী কাজ বানানো যায় না ও দ্বীনী কাজে বদলে ফেলা যায় না। সুন্নতের অনুসরণ করার নিয়তে করলে

দুনিয়ার কাজও 'দ্বীন' বনে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও দয়ায় আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী মাজালিস; খণ্ড : ৪ পৃষ্ঠা : ১৮৯-২০০

পিতামাতার খেদমত দ্বারা জান্নাত লাভ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ
لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ O بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَ
الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ

'তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তার শরীক করবে না এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে ' (নিসা : ৩৬)

ইমাম নববী (রহ.) পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার সম্পর্কে 'রিয়াযুস-সালিহীন' গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ দাঁড় করিয়েছেন এবং এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীছসমূহ উদ্ধৃত করেছেন। আমি পূর্বেও আরয করেছিলাম যে, এসব পরিচ্ছেদের সম্পর্ক 'হুকূকুল-'ইবাদ'-এর সাথে। পেছনে এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ গত হয়েছে এবং বান্দার বিভিন্ন হক সম্পর্কিত হাদীছ আপনারা শুনেছেন। এই নতুন পরিচ্ছেদটি পিতামাতার হক সম্পর্কে। এতে উপরিউক্ত আয়াতের পর কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ আমল কী ?

عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ . قَالَ: سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ ؟ قَالَ: اَلصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ: ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ
قُلْتُ. ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ. اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

'হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন, সময়মত সালাত আদায় করা। জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ'।

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৯৬; নাসাঈ, হাদীছ নং ৬০৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৩৬৯৫)

এ হাদীছের ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও উত্তম আমল হল সময়মত সালাত আদায়, দ্বিতীয় স্থানে আছে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার আর তৃতীয় স্থানে আল্লাহর পথে জিহাদ।

সৎকাজের প্রতি লোভ

এ স্থানে দু'টি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া চাই। হাদীছ গ্রন্থসমূহে লক্ষ করলে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বহু সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। এর দ্বারা সৎকর্মের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের প্রবল আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। যে আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয় তা আন্‌জাম দেওয়া ও নিজেদের জীবনে তা প্রতিফলিত করার জন্য চিন্তা ও চেষ্টা তাদের সব সময়ই থাকত। আসলে তো তাদের মন-মস্তিষ্ক ছিল আখিরাতমুখী। মাথায় সর্বদা আখিরাতের ফিকিরই কাজ করত। আখিরাতে কিভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, কিভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় সেটাই ছিল তাদের আসল চাওয়া। তাই সর্বদা জানতে চাইতেন কোন আমলে কী ছওয়াব এবং চেষ্টায় থাকতেন যাতে সে ছওয়াব হাসিল হয়ে যায়।

আমরা তো ফযীলতের হাদীছসমূহে কোন্ আমলের কী ফযীলত, কি কাজ করলে কি ছওয়াব পাওয়া যায় তা পড়ি ও শুনি। অথচ যথাযথভাবে তা পালন করার উৎসাহ জাগে না। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন অন্যরকম। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমল সম্পর্কেও যখন জানতে পারতেন তা একটা ছওয়াবের কাজ, তখন অতি দ্রুত তা পালনে সচেষ্ট হতেন।

আহা কত কীরাত খুইয়ে দিলাম!

একবার হযরত ইবন 'উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সামনে হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাদীছ শোনালেন যে, রাসূলে

আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের জানাযায় শরীক হয়, সে এক কীরাত পুণ্য লাভ করে (সে কালে বিশেষ একটা পরিমাপকে কীরাত বলা হত। তা দ্বারা সোনারূপা মাপা হত)। আর যে ব্যক্তি জানাযার পর মরদেহের পেছনে পেছনে যায়, তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত আর যে ব্যক্তি দাফনেও শরীক থাকে, তার জন্য রয়েছে তিন কীরাত। এমনিতে তো কীরাত এক ছোট পরিমাপ। কিন্তু অপর এক হাদীছ দ্বারা জানা যায় জান্নাতের কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) যখন এ হাদীছ শোনালেন, তখন হযরত ইবন 'উমর (রাযি.) আফসোস করে বললেন, আহা! এ হাদীছ আগে শুনিনি। ফলে আমি কত-কত কীরাত খুইয়ে ফেলেছি। (বুখারী, হাদীছ নং ১২২৯)

বুঝাতে চাচ্ছিলেন, আগে আমার জানা ছিল না যে, জানাযার নামায পড়া, মায়্যিতের পেছনে চলা এবং দাফনে শরীক হওয়ার এত ফযীলত। আগে জানলে আমি এর প্রতি যত্নবান থাকতাম। না জানাতে যত্নবান থাকতে পারিনি, ফলে আমার বহু কীরাত হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

হযরত ইবন 'উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এমন এক মহান সাহাবী যার গোটা জীবনই সুন্নতের রঙে রঙিন ছিল । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ মোতাবেক জীবন কাটানোই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা। অনুমান করা যায় তার আমলনামায় কত রাশি-রাশি পুণ্য ছিল? অথচ তা সত্ত্বেও যখন একটা আমল সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ হল, তখন কেমন আক্ষেপ করছেন যে, কেন আমি আরও আগে থেকে এ আমল করলাম না। আমার যে কত পুণ্য হাতছাড়া হয়ে গেল!

এ অবস্থা ছিল সাহাবায়ে কিরামের সকলেরই। সামান্য কিছু পুণ্য হলেও তা কিভাবে অর্জন করে নেওয়া যায় এটাই ছিল তাদের ধ্যান-জ্ঞান। একটাই প্রচেষ্টা ছিল, কিভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে পুণ্য বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল হয়ে যায়।

প্রশ্ন এক, উত্তর বিভিন্ন

এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম বারবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কোনটি? বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সাহাবীকে বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। যেমন এ হাদীছে উত্তর দিয়েছেন, সর্বোত্তম আমল 'সময়মত নামায পড়া'। পেছনে এক হাদীছ গেছে। তাতে

এক সাহাবীর এ রকম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, সর্বোত্তম আমল হল এই যে, আল্লাহর যিক্‌রে তোমার-জিহবা যেন ভেজা থাকে।

(তিরমিযী, হাদীছ নং ৩২৯৭; ইবন মাজাঃ, হাদীছ নং ৩৭৮৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৭০২০)

অর্থাৎ সর্বক্ষণ তোমার মুখে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র জারি থাকবে, চলাফেরা, ওঠাবসা সর্বাবস্থায় তাঁর যিক্‌র করবে। যিক্‌রে তোমার রসনা সিক্ত থাকবে। এটাই আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয় আমল।

অপর এক বর্ণনায় আছে, এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কী ? উত্তর দিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল হল, কোন কাজ নিয়মিতভাবে করা। (বুখারী, হাদীছ নং ১০৬৪:মুসলিম, হাদীছ নং ১৩০৩; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৭৮৩: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২২৯১৫)

অপর এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কী? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা সর্বোত্তম আমল।

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৭৯/৩৫৬)

মোটকথা, তিনি একেক সাহাবীকে একেক উত্তর দিয়েছেন আপাতদৃষ্টিতে এসব উত্তর পরস্পরবিরোধী মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই।

প্রত্যেকের উত্তম আমল পৃথক

বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থাভেদে সর্বোত্তম আমলে প্রভেদ হয়ে থাকে। কারও পক্ষে সময়মত নামায আদায় সর্বোত্তম আমল, কারও পক্ষে সর্বোত্তম আমল পিতামাতার আনুগত্য, কারও পক্ষে আল্লাহর পথে জিহাদ, কারও পক্ষে বেশি বেশি আল্লাহর যিকর। সময় ও ব্যক্তির অবস্থাভেদে এ পার্থক্য হয়। যেমন কোন কোন সাহাবী সম্পর্কে আগে থেকেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল যে, তারা এমনিতেই যথাসময়ে সালাত আদায়ে যত্নবান। তাদের সামনে এর বেশি ফযীলত তুলে ধারার দরকার নেই, কিন্তু তাদের দ্বারা পিতামাতার হক আদায়ে ত্রুটি হচ্ছে। সুতরাং বিশেষভাবে তাদেরকে জানালেন, তোমাদের পক্ষে সর্বোত্তম আমল হল পিতামাতার আনুগত্য।

কোন সাহাবীকে দেখলেন ইবাদত-বন্দেগী ঠিক-ঠিক করছেন, জিহাদও করছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার যিকরের দিকে অতটা লক্ষ নেই। তাকে বললেন, তোমার পক্ষে সর্বোত্তম আমল আল্লাহ তা'আলার যিকর। এভাবে

বিভিন্ন সাহাবীকে তাদের অবস্থাগত পার্থক্যের কারণে তিনি বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। না হয় এমনিতে সবগুলো আমলই উত্তম। প্রত্যেকটিরই বিশেষ ফযীলত আছে অর্থাৎ সময়মত নামায পড়া, পিতামাতার আনুগত্য করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা, সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার যিকির করা সবই ফযীলতপূর্ণ আমল। কিন্তু ব্যক্তির অবস্থাভেদে ফযীলত বদলাতে থাকে।

নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব

এ হাদীছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোত্তম আমলের বিন্যাস করেছেন এ রকম-সর্বোত্তম আমল সময় মত সালাত আদায়, কেবল নামায পড়া নয়, বরং সময়ের ব্যাপারে সতর্ক থেকে ঠিক সময়ে তা আদায় করা। অনেক সময় মানুষের ওয়াক্তের দিকে লক্ষ থাকে না। সময় পার হয়ে যায়, অথচ সে ভাবে নামায কাযা হল তাতে সমস্যা কি, পরে আদায় করে নেব। এটা কিছুতেই সমীচীন নয়। বরং সময়মত নামায আদায়ে যত্নবান থাকা উচিত। কুরআন মাজীদে ইরশাদ-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

'দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন'। (মা'ঊন : ৪-৫)

অর্থাৎ নামাযের সময় আসে, তারপর চলেও যায়, কিন্তু তাদের সে দিকে কোন লক্ষ নেই, নামায আদায়ের চিন্তা নেই, শেষ পর্যন্ত তা কাযা হয়ে যায়। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

'যে ব্যক্তির আছরের নামায ছুটে যায়, (অর্থাৎ সময় চলে যায় অথচ-নামায পড়া হয়নি) তার যেন পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ সব লুট হয়ে গেছে।

(বুখারী,হাদীছ নং ৫১৯: মুসলিম, হাদীছ নং ৯৯১: তিরমিযী, হাদীছ নং ১৬০: নাসাঈ, হাদীছ নং ৫০৮; আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ৩৫১: ইবন মাজা:, হাদীছ নং ৬৭৭: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৪৩১৭: মুআত্তা মালিক, হাদীছ নং ১৮; দারিমী, হাদীছ নং ১২০২)

অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি যেমন নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, আছরের নামায যার কাযা হয়ে যায় সেও সেই রকম সর্বস্বান্ত। কাজেই নামায কাযা করা অতি ভয়াবহ কাজ। কঠিন সতর্কবাণী এর জন্য শোনানো হয়েছে। সুতরাং নামাযের প্রতি সতর্ক ও সচেতন থাকা চাই, যাতে তা ওয়াক্ত মত আদায় করা হয়।

জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব

এ হাদীছে দ্বিতীয় উত্তম আমল বলা হয়েছে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারকে আর তৃতীয় উত্তম কাজ বলা হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদকে। এভাবে এ হাদীছে জিহাদের উপর পিতামাতার আনুগত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ আপনি জানেন জিহাদ কত বড় আমল, এর কত ফযীলত! হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তাতে শহীদ হয়ে যায়, জান্নাতে পৌছার পর তার আকাঙ্ক্ষা হবে তাকে যদি আবারও দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হত এবং আবারও শহীদ হতে পারত আর এভাবে অতিরিক্ত আরও দশবার শাহাদাত লাভ করে শহীদের প্রাপ্য সম্মান হাসিল করতে পারত।

(বুখারী, হাদীছ নং ২৬০৬; মুসলিম, হাদীছ নং ৩৪৮৮; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৫৮৫; নাসাঈ, হাদীছ নং ৩১০৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১১৫৫৬)

এক হাদীছে আছে, মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের বিভিন্ন স্তর ও জান্নাত প্রত্যক্ষ করবে তার অন্তরে কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসার আগ্রহ দেখা দেবে না। কেননা, যে জান্নাত সে লাভ করেছে তার বিপরীতে দুনিয়া যে কত ক্ষণস্থায়ী, কত নিকৃষ্ট ও কত মিছে, তা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাজেই 'আবার যদি দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম' এই কল্পনাই তার মনে আসবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি জিহাদ করতে করতে আল্লাহ তা'আলার পথে শহীদ হয়ে গেছে সে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে, আমাকে যদি ফের দুনিয়ায় পাঠানো হত এবং সেখানে গিয়ে আবারও জিহাদ করতে পারতাম আর পুনরায় আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ পেতাম!

এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার মনের ইচ্ছা আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হয়ে যাই, তারপর আমাকে জীবিত করা হোক, ফের শহীদ হয়ে যাই, আবারও আমাকে জীবিত করা হোক এবং পুনরায় শহীদ হয়ে যাই। বস্তুত জান্নাতে যাওয়ার পর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না। কেবল শহীদই ব্যতিক্রম। সেই এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে। জিহাদের এমনই ফযীলত।

(বুখারী, হাদীছ নং ২৫৮৮; মুসলিম, হাদীছ নং ৩৪৮৪; নাসাঈ, হাদীছ নং ৩১০১; ইবন মাজা:, হাদীছ নং ২৭৪৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৬৮৬০)

পিতামাতার হক

কিন্তু পিতামাতার আনুগত্য ও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারকে জিহাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই বুযুর্গানে দীন বলেন, বান্দার যত রকম হক আছে তার মধ্যে পিতামাতার হক সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ায়

আর কারও হক তাদের হক অপেক্ষা বেশি মর্যাদা রাখে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে মানব অস্তিত্বের মাধ্যম বানিয়েছেন। মানুষ যাদের মাধ্যমে ইহলোকে আগমন করে তাদের চেয়ে বেশি সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত আর কে হতে পারে? এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের হককে আর সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের ছওয়াব এত বেশি যে, হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, কেউ যদি মহব্বতের দৃষ্টিতে একবার পিতামাতার দিকে তাকায়, তবে বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি হজ্জ ও একটি 'উমরার সওয়াব দান করেন।

একমাত্র পিতামাতার স্নেহ-মমতাই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থে হয়ে থাকে

মনে রাখতে হবে, দুনিয়ায় যত স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা আছে, তার সবগুলিতেই মানুষের কোনও না কোনও স্বার্থ সম্পৃক্ত থাকে। ইহজগতে স্বার্থহীন ভালোবাসা কোথাও পাওয়া যাবে না। ব্যতিক্রম কেবল পিতামাতা। তারা সন্তানকে যে ভালোবাসে তার পেছনে তাদের কোন স্বার্থ থাকে না। এ ভালোবাসায় তাদের নিজেদের কোন লাভ-লোকসানের হিসাব থাকে না। এ ছাড়া আর কারও ভালোবাসা নিঃস্বার্থ হয় না। স্বামী স্ত্রীকে যে ভালোবাসে তাতে তার নিজের স্বার্থ জড়িত থাকে। স্ত্রীও স্বামীকে ভালোবাসে নিজের স্বার্থে। ভাই-ভাইয়ের ভালোবাসা এবং অন্য যে কোনও পারস্পরিক ভালোবাসার পেছনে কোনও না কোনও স্বার্থ সক্রিয় থাকে। সব জায়গাতে স্বার্থের টানেই একজন অন্যজনকে ভালোবাসে। কেবল একটা ভালোবাসাই স্বার্থের ক্লেদমুক্ত। সেটা পিতামাতার ভালোবাসা। পিতামাতা নিজ সন্তানকে যে ভালোবাসে তাদের নিজেদের কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে না। তারা সন্তানকে ভালোবাসে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। নিজের ক্ষতিরও পরওয়া করে না প্রাণ চলে যাক, তবুও কামনা থাকে সন্তানের যেন কোন ক্ষতি না হয়। বরং প্রাণের বিনিময়েও তাদের উপকার করতে সচেষ্ট থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের হককে অন্য সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষাও তার বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

পিতামাতার খেদমত করতে পারা মহা সৌভাগ্য

হাদীছ শরীফে আছে, জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জিহাদে যাওয়ার বড় সাধ। জিহাদ দ্বারা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ

তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর কাছে ছওয়াব ও পুণ্যলাভ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, বাস্তবিকই কি তুমি ছওয়াব লাভের আশায় জিহাদে যেতে চাচ্ছ? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি কেবল ছওয়াবই অর্জন করতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতমাতা কি জীবিত? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ, আমার পিতামাতা জীবিত আছেন, তিনি বললেন, তবে তুমি তাদের কাছে চলে যাও এবং তাদের খেদমত করতে থাক। কেননা, ছওয়াব পাওয়াই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাদের খেদমত করে তুমি যে ছওয়াব পাবে জিহাদে গিয়েও তা অর্জন হবে না। এক বর্ণনায় আছে,

فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

'তবে গিয়ে তাদের খেদমত ও সেবার জিহাদ কর। এসব হাদীছে পিতামাতার খেদমতকে জিহাদেরও উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

(বুখারী, হাদীছ নং২৭৮২: মুসলিম, হাদীছ নং ৪৬২৩: তিরমিযী, হাদীছ নং ১৫৯৪: নাসাঈ, হাদীছ নং ৩০৫২: আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২১৬৭: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৬২৫৭)

নিজের সখ মেটানোর নাম দ্বীন নয়

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী (রহ.) একটি কথা বলতেন, যা সর্বদা স্মরণ রাখার মত। তিনি বলতেন, ভাই নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ পূরণ করার নাম দ্বীন নয়; বরং দ্বীন হল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার নাম। তাকিয়ে দেখ আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে কোন সময়ের কি দাবি, সেই দাবি পূরণ কর, এটাই দ্বীন। আমার ওই জিনিসের প্রতি আগ্রহ, ওই কাজ করার সখ আর তা করলাম, এর নাম দ্বীন নয়, যেমন কারও সাধ জাগল সর্বদা প্রথম কাতারে নামায পড়বে, কারও সখ জিহাদে যাবে, কারও সাধ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বের হয়ে যাবে সন্দেহ নেই এসবই দ্বীনের কাজ এবং এগুলো করলে প্রভূত ছওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু এর সাথে এটাও লক্ষ করতে হবে যে, এখন আমার কাছে সময়ের দাবি কী? উদাহরণত ঘরে পিতামাতা আছে এবং তোমার খেদমত ছাড়া তাদের চলে না।

এ অবস্থায় তোমার সখ হল জামাতে প্রথম কাতারে নামায পড়বে, অথচ তারা এতটাই অসুস্থ যে, নিজে নিজে নড়াচড়াও করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমার প্রতি সময়ের দাবি হল পিতামাতার সেবায় লেগে থাকা। এজন্য প্রথম কাতারে যোগদানের ফযীলত ছাড়ার প্রয়োজন হলে তাও ছাড়তে হবে। এমন কি প্রয়োজনে জামাতও ছাড়বে। ঘরে একাকি নামায পড়ে পিতামাতার খেদমত করবে, তাদের যত্ন নেবে, এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করবে। তুমি যদি এ অবস্থায় নিজের সখ মেটানোর জন্য মসজিদে চলে যাও, প্রথম কাতারে গিয়ে শামিল হও আর এদিকে তোমার অসুস্থ পিতামাতা কষ্ট পায়, তবে এটা দ্বীনের অনুসরণ হল না, নিজ সখ মেটানো হল।

এটা সেই অবস্থার কথা, যখন মসজিদ দূরে হয় এবং আসা যাওয়া করতে সময়ের দরকার হয় আর এদিকে পিতামাতা এমন অসুস্থ যে, তোমার অনুপস্থিতিতে তাদের কষ্ট হবে। পক্ষান্তরে মসজিদ যদি কাছে হয় আর পিতামাতা এমন অসুস্থ না হয় যে, পুত্রের সামান্য সময়ের অনুপস্থিতিতেও তাদের কষ্ট হয়ে যাবে কিংবা কষ্ট হলেও সে সময় তাদের সেবা করার মত অন্যলোক থাকে, তবে এ অবস্থায় মসজিদে গিয়ে জামাতেই নামায পড়তে হবে।

হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান (রহ.)-এর আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মনে কর এক জনহীন স্থানে কোনও ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে অবস্থান করছে। কাছাকাছি কোন লোকজন নেই। এ অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেল। কাছে মসজিদ নেই। আছে দূরে বসতি এলাকায়। লোকটি তার স্ত্রীকে বলল, নামাযের সময় হয়ে গেছে। তুমি অপেক্ষা কর, আমি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে আসি। স্ত্রী বলল, এই নির্জন স্থানে আমি একা। কাছে কোন জনমানুষ নেই। এ অবস্থায় আমাকে একা ফেলে দূরে কোথাও গেলে ভয়ে আমার জান চলে যাবে। কিন্তু স্বামী তা শুনতে রাজি নয়। সে বলল, জামাতে প্রথম কাতারে নামায পড়ার অনেক ফযীলত। আমার তো সে ফযীলত লাভ করতে হবে। তুমি যা কিছুই বল না কেন, আমি মসজিদে গিয়ে জামাতের প্রথম কাতারেই নামায পড়ব। হযরত (রহ.) বলেন, এটা দ্বীন হল না। এটা প্রথম কাতারে নামায পড়ার যে সখ তার মনে দেখা দিয়েছে সেই সখ মেটানোই হবে। দ্বীনের অনুসরণ হবে না। কেননা, এ অবস্থায় সময়ের দাবি হল স্ত্রীর সঙ্গে থাকা। এবং এটাই দ্বীনের নির্দেশ। সে জামাতে না গিয়ে সেখানেই একা নামায পড়বে আর তাই হবে দ্বীনের অনুসরণ। অন্যথায় নিজের সখ পূরণ করা হবে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ হবে না, অথচ দ্বীন সেটাই।

কিংবা মনে করুন ঘরে পিতামাতা অসুস্থ। স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে। আপনার সেবা তাদের প্রয়োজন। কিন্তু আপনার তাবলীগে যাওয়ার আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আপনি তাদের জানিয়ে দিলেন আমি তাবলীগে যাচ্ছি। দেখুন এমনিতে তাবলীগে যাওয়া অনেক বড় ছওয়াবের কাজ। কিন্তু আপনার ঘরে তো অসুস্থ পিতামাতা রয়েছে এবং আছে বিবি-বাচ্চা। আপনার সেবা ছাড়া তাদের চলে না। তাদের সেবা করাই এখন আপনার কাছে সময়ের দাবি। এ অবস্থায় তাদের ছেড়ে তাবলীগে চলে গেলে সেটা হবে নিজের সখ পূরণ দ্বীনের অনুসরণ হবে না। দ্বীন নিজের সখ পূরণ করার নাম নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার নাম, যেই সময়ের যা দাবি তা পূরণ করাই দ্বীনের শিক্ষা। সুতরাং সেটাই আনজাম দিন।

আপনি তো এ হাদীছে দেখলেন, সাহাবী এসে আরয করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি জিহাদে যেতে চাই। কিন্তু তিনি তাকে নিষেধ করে দিলেন এবং বলে দিলেন, তুমি গিয়ে পিতামাতার খেদমত কর। এটাই এখন তোমার প্রতি হুকুম।

হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.)-এর বৃত্তান্ত

হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানার লোক। তিনি মুসলিম ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর সংগে সাক্ষাত করার প্রচণ্ড আগ্রহ তাঁরও ছিল। তাঁর সাক্ষাত লাভ কত বড়ই না সৌভাগ্যের ব্যাপার। এরচে' বড় সৌভাগ্য জগতে আর কি থাকতে পারে ? তাঁর ইহলোক ত্যাগের পর এ সৌভাগ্য লাভের তো কোন উপায় থাকে না। সুতরাং হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.) নববী দরবারে দরখাস্ত পাঠালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার খেদমতে হাজির হতে চাই, কিন্তু আমার মা অসুস্থ। আমার খেদমত ছাড়া তার চলে না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিষেধ করে দিলেন। বললেন, মায়ের সেবা কর। আমার সংগে সাক্ষাত করতে এখানে এসো না।

(মুসলিম, হাদীছ নং ৪৬১৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৫৭; সুনান দারিমী, হাদীছ নং ৪৪০)

চিন্তা করুন, যে পর্যায়ের ঈমানদারই হোক না কেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে সাক্ষাত করার আগ্রহে তো কারও কমতি থাকতে পারে না; বরং এ আগ্রহ একজন মুসলিমের অন্তরে কী মাত্রায় থাকে

তা কারও পক্ষে ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জীবিত, ইহলোকে বর্তমান, তখন একজন মুসলিমের অন্তরে তাঁকে দু'চোখে দেখার উদ্দীপনা কী পরিমাণ থাকতে পারে। আজ তিনি ইহলোকে নেই, কিন্তু তাঁর একজন সাধারণ উম্মতও তাঁর পবিত্র রওযায় হাজির হওয়ার তাড়না কী পরিমাণ বোধ করে? এজন্য সে কেমন অস্থির উতলা হয়ে যায়? আহা ! একবার যদি হাজির হতে পারতাম। একবারের জন্যও যদি পবিত্র রওযার যিয়ারত নসীব হত!

কিন্তু হযরত উওয়ায়স (রহ.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ ও এর প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনাকে মাতৃসেবার জন্য উৎসর্গ করলেন। নববী দরবার থেকে যখন হুকুম হয়েছে মায়ের খেদমত কর এবং আমার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্যকে ত্যাগ কর, তখন সেই হুকুমের স্বার্থে সাক্ষাতের সৌভাগ্যকে কোরবানী করলেন। এর ফলে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হলেন, সে মর্যাদা তো কেবল সাক্ষাত দ্বারাই লাভ করা যায়। সাক্ষাত যখন নসীব হল না, তখন সাহাবী হওয়াও হল না, অথচ এটা এমন এক মর্যাদা, যার ধারে কাছেও অন্য কোন মর্যাদা পৌঁছতে পারে না। কেউ যত বড় ওলী ও বুযুর্গই হোক না কেন কোন সাহাবীর মর্যাদাকে সে স্পর্শ করতে পারে না। তা করা সম্ভব নয়।

সাহাবীত্বের উচ্চাসন

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) একজন তাবে' তাবি'ঈন। খ্যাতনামা বুযুর্গ, ফকীহ ও মুহাদ্দিছ। একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে একটি আশ্চর্য প্রশ্ন করল। জিজ্ঞেস করল, হযরত মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু 'আনহু শ্রেষ্ঠ, না হযরত 'উমর ইবন 'আব্দুল 'আযীয রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি? প্রশ্নকর্তা এমন একজন সাহাবীকেই বেছে নিয়েছেন, যার সম্পর্কে লোকে নানা রকম কথা চাউর করে দিয়েছে। তাঁর ও হযরত 'আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। আহ্‌লুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের বিশ্বাস হল, সে বিরোধে হযরত 'আলী (রাযি.)-ই হকের উপর ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর ভুল ছিল ইজতিহাদভিত্তিক। এটা উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত।

তো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সে এমন একজনকেই বেছে নিল, যার সম্পর্কে উম্মতের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে এবং বিরুদ্ধবাদীরা নানারকম গুজব তাঁর সম্পর্কে ছড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে তাবি'ঈদের মধ্যে বেছে নিয়েছে

এমন এক মহান ব্যক্তিত্বকে, যার ন্যায়পরায়ণতা, তাক্ওয়া-পরহেযগারী ছিল সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। তার উপাধিই পড়ে গিয়েছিল 'দ্বিতীয় 'উমর'। ইনি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছিলেন। যা হোক হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ভাই, তুমি জিজ্ঞেস করছ, হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-শ্রেষ্ঠ, না হযরত 'উমর ইবন 'আব্দুল 'আযীয (রহ.)? আরে, হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) এর ব্যক্তিত্ব তো অনেক দূরের কথা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থেকে জিহাদকালে যে ধুলোবালি তাঁর নাকে লেগেছিল, সে মাটিও তো হযরত 'উমর ইবন 'আব্দুল 'আযীয (রহ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের বদৌলতে সাহাবীত্বের যে মর্যাদা হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর নসীব হয়েছিল, জীবনভর সাধনা করেও তো কারও পক্ষে সে মর্যাদার ধারেকাছেও পৌঁছা সম্ভব নয়। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৩৯)

মায়ের খেদমত করতে থাক

তো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 'উওয়ায়েস করনী (রহ.) কে হুকুম দিলেন, আমার যিয়ারত লাভের প্রয়োজন নেই, সাহাবীত্বের মর্যাদা লাভ করার দরকার নেই; বরং মায়ের সেবায় লেগে থাক।

আমাদের মত মূঢ় কেউ হলে বলত, সাহাবীত্বের মহামর্যাদা তো পরে কখনও লাভ করা সম্ভব নয়। মা অসুস্থ তো কী হয়েছে। কোনও না কোনও প্রয়োজনে ঘরের বাইরে তো যাওয়া পড়েই। এটাও তো একটা প্রয়োজন। সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য তো হেলা করার মত জিনিস নয়। এ প্রয়োজন পূরণার্থে ঘরের বাইরে যাওয়া যেতেই পারে। সুতরাং গিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করে আসি। কিন্তু হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.) তা করেননি, তাঁর তো লক্ষ নিজ আগ্রহ পূরণ করা ছিল না। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের দিকে তাঁর নজর ছিল না। উদ্দীপনা যা ছিল, তা কেবলই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার। সেই অনুগত্য ও অনুসরণের তাগিদে তিনি সাক্ষাত লাভের আগ্রহকে ত্যাগ করলেন এবং ঘরে মায়ের খেদমতে নিয়োজিত থাকলেন। পরিশেষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়ে গেল। হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.) আর তাঁর সাক্ষাত লাভ করতে পারলেন না।

মাতৃসেবার পুরস্কার

হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.) মাতৃসেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে সাহাবীত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারলেন না বটে, কিন্তু পরকালীন পুরস্কার যা পাওয়ার সে তো ভিন্ন কথা, দুনিয়ায়ও যে তিনি একদম বঞ্চিত হলেন তা নয়; বরং নববী দরবার হতে সেই সেবার বদৌলতে এমন এক পুরস্কারই তিনি লাভ করলেন, যা দুনিয়ার মহামানবদের কাতারে তাকে ভিন্ন এক মাত্রা দান করেছে। সে পুরস্কার এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 'উমর ফারুক (রাযি.) কে বলেন, হে 'উমর! কোনও এক সময় ইয়ামানের করন এলাকা হতে মদীনায় এক ব্যক্তি আসবে। তার গঠন-প্রকৃতি হবে এ রকম। হে 'উমর! তার সাক্ষাত পেলে তুমি নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আ করিয়ে নিও। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবূল করবেন।

বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, অতঃপর ইয়ামান থেকে যখনই কোন কাফেলা আসত, হযরত 'উমর (রাযি.) খোঁজ নিতেন সে কাফেলায় করনের উওয়ায়স নামক কোন ব্যক্তি আছে কি না। পরিশেষে একবার একটি কাফেলা আসল এবং খলীফা জানতে পারলেন, সে কাফেলায় উওয়ায়স করনী (রহ.) আছেন। তিনি যারপরনাই খুশি হলেন। তারপর কাফেলার লোকদের কাছে চলে গেলেন এবং তার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত হুলিয়াও মিলিয়ে দেখলেন। সব অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। শেষে তিনি আরয করলেন, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। উওয়ায়স করনী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার দ্বারা দু'আ করানোর জন্য এসেছেন? তা ব্যাপার কী?

খলীফা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন, যখন 'করন' থেকে উওয়ায়স আসবে, তখন নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আ করিও। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবূল করবেন। এ কথা শুনতেই হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.)-এর চোখে অশ্রুর বান ডাকল ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন।

(মুসলিম, হাদীছ নং ৪৬১৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৫৭;

সুনানে দারিমী, হাদীছ নং ৪৪০)

দেখুন, হযরত ফারুকে আজম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মত মহা মহোদয় সাহাবীকে বলা হচ্ছে নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আ করিয়ে নিও। এত বড় মর্যাদা হযরত উওয়ায়স করনী কিভাবে লাভ করলেন? ওই

মাতৃসেবা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম পালনার্থে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে না গিয়ে বরং মাতৃসেবাতেই থেকে গিয়েছিলেন। এখন আমার কর্তব্য তাঁর হুকুম তা'মিল করা, তাতে যা-কিছুই হোক না কেন।

সাহাবায়ে কিরামের নবী-প্রেমজনিত ত্যাগ-তিতিক্ষা

এমন কোন সাহাবী ছিলেন, যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি উৎসর্গিতপ্রাণ ছিলেন না? আমার একটা লেখায় বলেছিলাম এবং নিশ্চয়ই সঠিক বলেছিলাম যে, প্রত্যেক সাহাবীই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কোরবান ছিলেন। এমনই কোরবান যে, কারও যদি নিজ প্রাণ দিয়ে অন্যের পরমায়ু বৃদ্ধির সুযোগ থাকত, তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক-একটি নিঃশ্বাস বৃদ্ধির জন্যেও সাহাবায়ে কিরামের প্রত্যেকে নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। তাঁরা তাঁর জন্যে এমনই জাননেছার ছিলেন। তাদের নবীপ্রেমের তো কোন থই ছিল না। প্রিয় নবীর নূরানী অস্তিত্ব এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল হওয়া তাদের সহ্য হত না। এমন কি যুদ্ধের ময়দানেও তাদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

হযরত আবূ দুজানা (রাযি.) একজন বীর সাহাবী। উহুদের যুদ্ধকালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তাঁকে একখানি তরবারি দিয়েছিলেন। তিনি সেই তরবারি নিয়ে যখন শত্রুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে চতুর্দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসছিল। হযরত আবূ দুজানা (রাযি.) থমকে দাঁড়ালেন। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি কর্তব্য স্থির করে ফেললেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরে তীরের দিকে পিঠ পেতে দাঁড়ালেন। সব তীর নিজ পিঠে বিঁধতে দিলেন। সে দিকে বুক পাততে চাইলে বিলক্ষণ পারতেন, কিন্তু তাতে প্রিয়নবী পিছনে পড়ে যান আর তাঁর জ্যোর্তিময় সত্তা দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। তা যে সহ্য করা অনেক বেশি কঠিন। (আদবের প্রতিও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল না কি?)। সুতরাং সেই ঘোর যুদ্ধাবস্থায়ও এতটা সতর্কতা, যাতে প্রিয়নবীর দিকে পেছন পড়ে না যায়। তার চে' পৃষ্ঠদেশ শত্রুর দিকেই থাকুক, সব তীর তাতেই বিদ্ধ হোক, একটিও

প্রিয়নবীর পাক দেহে না লাগুক, সেই সঙ্গে পবিত্র সত্তাও চোখের সামনে দীপ্তিমান থাকুক। (আল-মু'জামুল-কাবীর, হাদীছ নং ১৫৩৫৬' ১৩খ, ২৩৬ পৃ; মাজমা'উয-যাওয়াইদ, ৬খ, ১১৩)

এমনই ছিল সাহাবায়ে কিরামের নবীপ্রেম। প্রতিটি লহ্মা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে কাটাতে চাইতেন। প্রয়োজনের তাগিদে বাড়িতে যেতেন, কিন্তু কখন আবার ফিরে আসবেন সেজন্য অস্থির হয়ে যেতেন। তাঁর চোখের আড়ালে এক মুহূর্ত কাটানোও তাদের পক্ষে দুর্বিষহ বোধ হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাদের কাউকে শামে, কাউকে ইয়ামানে, কাউকে মিসরে পাঠাচ্ছেন আর হুকুম দিচ্ছেন, সেখানে গিয়ে দ্বীনের কাজ কর, ইসলামের বার্তা পৌঁছাও, হুকুম পাওয়ার পর দরবারে থাকার অদম্য উদ্দীপনা সত্ত্বেও তাদের কেউ কালক্ষেপণ করেননি। সকল আগ্রহ, সকল সাধ সেই আদেশের সামনে কোরবান করে দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকেই সব কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। পবিত্র মদীনা ছেড়ে সেই সব দূর দেশে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

আমাদের হযরত (রহ.) বড় চমৎকার কথা বলতেন। স্মরণ রাখার মত। তিনি বলতেন, দ্বীন হচ্ছে সময়ের দাবি অনুযায়ী কাজ করার নাম। ভেবে দেখ এই সময়ের কী চাহিদা। সেই মত কাজ কর। সময়ের চাহিদা যদি হয় পিতামাতার সেবা করা, তবে তার বিপরীতে জিহাদ মূল্যহীন, তাবলীগ মূল্যহীন। এমনি কি জামাতও মূল্যহীন। ঘরে একাকি নামায পড়ে নেবে, তবু পিতামাতার সেবা ত্যাগ করবে না। এসব ইবাদত অনেক বড় এবং এমনিতে এসবের প্রভূত ফযীলত, কিন্তু এখন সময়ের দাবি যেহেতু পিতামাতার সেবা তাই সেটাই অগ্রগণ্য। সর্বদা এ দিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

পিতামাতার খেদমতের গুরুত্ব

পিতামাতার খেদমতের প্রতি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সমস্ত ইবাদতের উপরে এর স্থান দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে এক-দু'টি নয়, বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

'আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।'

('আনকাবূত : ৮)

অপর এক আয়াতে আছে-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। (সূরা ইসরা : ২৩)

দেখুন, এ আয়াতে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশকে তাওহীদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন তাওহীদের পর মানুষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল পিতামাতার খেদমত ও আনুগত্য করা।

পিতামাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে

তারপর আল্লাহ তা'আলা কি চমৎকার ভঙ্গিতে ইরশাদ করেন,

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا۝

'যদি তাদের কোনও একজন বা দু'জনই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ্' শব্দটি বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ভাবে নম্র কথা বলো'। (সূরা ইসরা : ২৩)

মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে নানা রকম দুর্বলতা দেখা দেয়। স্মরণশক্তি কমে যায়, বুদ্ধি-বিবেচনায় ঘাটতি দেখা দেয়, ফলে অনেক সময় ভুল-চুক কথার উপর জিদ ধরে বসে। এ কারণেই বিশেষভাবে তাদের বার্ধক্যাবস্থার কথা উল্লেখ করে বলা হচ্ছে, এসময় পিতামাতা যদি তোমাদের দৃষ্টিতে ভুল-এমন কোন বিষয়েও পীড়াপীড়ি করে, তবুও তোমারা বিরক্তি প্রকাশ করো না এবং উফ শব্দটিও উচ্চারণ করো না। ধমক তো দেবেই না, বরং সর্বদা তাদের সম্মান রক্ষা করে কথা বলবে। তারপর ইরশাদ হয়েছে,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

'মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত করো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা ইসরা : ২৪)

ডায়েরির এক পৃষ্ঠা

আমি একবার কারও রচনায় একটি ঘটনা পড়েছিলাম, সত্য না মিথ্যা জানি না, কিন্তু ঘটনাটি বড় শিক্ষণীয়। এক ব্যক্তি তার পুত্রকে উচ্চশিক্ষা

দিয়ে বেশ জ্ঞানী-পণ্ডিত বানিয়ে দিয়েছে। সে এখন বার্ধক্যে উপনীত। একদিন সে ঘরের চত্বরে বসা। হঠাৎ একটি কাক এসে দেওয়ালে বসে পড়ল। পুত্রকে জিজ্ঞেস করল, বাবা এটা কি? সে বলল, আব্বা এটা একটা কাক। একটু পর আবার জিজ্ঞেস করল, বাবা, এটা কি? ছেলে বলল, আব্বা, বলেছি তো এটা কাক। একটু পর আবার জিজ্ঞেস করল, বাবা এটা কি? এবার ছেলের কণ্ঠস্বর বদলে গেল, তীব্র স্বরে বলল, এটা কাক, কাক। সামান্য পরে পিতা ফের জিজ্ঞেস করল, বাবা এটা কি?

এবার আর পুত্রধনের সহ্য হল না। মহা বিরক্ত হয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, কি আপনি একটা কথা বারবার জিজ্ঞেস করছেন! হাজারবার বলেছি এটা কাক। আপনার কি বুঝে আসছে না? এ ভাবে ছেলে বাপকে ধমকাতে থাকল। ক্ষণিক পর বাবা নিজ কামরায় চলে গেল এবং একটা পুরানো ডায়েরি বের করে আনল। ছেলের সামনে ডায়েরির একটা পৃষ্ঠা খুলে ধরে বলল, বাছা, একটু পড়ে দেখ তো কি লেখা আছে?

বিদ্বান পুত্র ডায়েরি পড়তে লাগল। তাতে লেখা আছে, আজ আমার ছোট ছেলে চত্বরে বসা ছিল। হঠাৎ একটা কাক আসল। ছেলে একের পর এক পচিশবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, আব্বা এটা কি ? আমি পচিশবারই তাকে উত্তর দিলাম, বাবা এটা একটা কাক। তার এ উপর্যুপরি জিজ্ঞাসায় আমার বড় মজা লাগছিল।

ছেলের পড়া শেষ হলে বাবা বলল, দেখলে তো বাছা, এই হল পিতা-পুত্রে পার্থক্য। তুমি যখন ছোট শিশু ছিলে, এই একই প্রশ্ন আমাকে পরপর পচিশবার করেছিলে। প্রতিবার আমি শান্তভাবে উত্তর দিয়েছি। কেবল তাই নয়, আমি অনুভূতিও প্রকাশ করেছি যে, তোমার শৈশবের সেই উপর্যুপরি প্রশ্নে আমার বড় মজা লাগছিল। আজ আমি যখন মাত্র পাঁচবার সেই প্রশ্ন করলাম, তুমি কত রেগে গেলে।

পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

তো আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে জানাচ্ছেন যে, দেখ বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর পিতামাতার স্বভাব কিছুটা খিটখিটে হয়ে যাবে। অসহিষ্ণুতা দেখা দেবে। নানা রকম দুর্বলতা দেখা দেবে। তখন তাদের অনেক কিছুই তোমাদের ভালো লাগবে না। কিন্তু তখন স্মরণ রেখ, তোমরা তোমাদের শৈশবে তাদের সাথে আরও অনেক বেশি বিরক্তিকর কাজ করেছ। কিন্তু তারা তা সহ্য করেছিল। কাজেই এখন তোমাদেরকেও তাদের এ জাতীয় কাজ সয়ে নিতে

হবে। বিরক্ত হওয়া যাবে না। এমন কি পিতামাতা যদি কাফেরও হয়, তবুও কুরআন মাজীদের নির্দেশ হল,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

'তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না, কিন্তু পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।

(লুকমান :১৫)

অর্থাৎ তাদের শিরকী নির্দেশ মানবে না বটে, কিন্তু তাদের সাথে ব্যবহার সর্বাবস্থায়ই ভালো করবে। কেননা, তারা কাফের হলেও বাবা-মা তো বটে।

ভেবে দেখুন, পিতামাতার আনুগত্য ও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারকে কী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজকের জগত সব ব্যাপারেই উল্টো দিকে চলছে। এখন তো যথারীতি এমন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যাতে সন্তানের অন্তর থেকে পিতামাতার আনুগত্য ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের আভাসটুকুও মুছে যায়। যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয় পিতামাতাও মানুষ, আমরাও মানুষ, তাদের ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ কী? কাজেই আমাদের উপর তাদের হক থাকবে কেন?

মানুষ যখন দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করার চেতনায় ঘুন ধরে এবং আখিরাতের চিন্তা লোপ পায়, তখনই অন্তরে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হয় আর মুখে এ রকম বাজে কথাবার্তা উচ্চারিত হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন । আমীন।

পিতামাতার অবাধ্যতা করার পরিণাম

আরয করছিলাম যে, পিতামাতার আনুগত্য করা অবশ্যকর্তব্য। পিতামাতা কোন কাজের হুকুম দিলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা পালন করা সন্তানের জন্য ফরয। ঠিক নামায-রোযার মতই ফরয যদি না সে কাজ শরী'আত বিরোধী হয়। শরী'আতে যে কাজ জায়েয পিতামাতা হুকুম করলে তা করা ফরয হয়ে যায়। না করলে কঠিন গুনাহ হয়, যেমন গুনাহ হয় নামায ছেড়ে দিলে। পরিভাষায় একেই 'উকূকুল-ওয়ালিদায়ন' বা পিতামাতার অবাধ্যতা বলে। বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, পিতামাতার অবাধ্যতা করলে তার পরিণামে মৃত্যুকালে কালেমা নসীব হয় না।

একটি উপদেশমূলক ঘটনা

এক ব্যক্তির ঘটনা। মুমূর্ষ অবস্থা, যে কোনও মুহূর্তে দম চলে যেতে পারে। সকলে চেষ্টা করছিল যাতে কালেমা তাইয়্যেবা পড়ে নেয়। কিন্তু মুখে কালেমা জারি হচ্ছিল না। শেষে এক বুযুর্গকে ডেকে আনা হল। বলা হল, তার মুখে যে কালেমা আসছে না, এখন উপায় কী? বুযুর্গ বললেন, তার মা বাবা জীবিত আছে কিনা, থাকলে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও। মনে হচ্ছে সে পিতামাতার অবাধ্যতা করেছে এবং সে জন্যেই তার এ দুরবস্থা। তাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা না হওয়া পর্যন্ত তার এ অবস্থা কাটবে না, তার মুখে কালেমা জারি হবে না।

এবার চিন্তা করুন পিতামাতার অবাধ্যতা করা ও তাদের মনে কষ্ট দেওয়া কি সংগীন জিনিস। এর পরিণতি কত ভয়াবহ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কারণেই নিজ শিক্ষামালায় পিতামাতার সম্মান রক্ষা ও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কোন সাহাবী তার কাছে পরামর্শের জন্য আসলে তাকে বিশেষভাবে পিতামাতার সেবা করার জন্য বলতেন।

ইলম শেখার জন্য পিতামাতার অনুমতি

আমাদের এই দারুল 'উলূমে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তালেবুল 'ইলম ভর্তি হওয়ার জন্য আসে, 'ইলম শেখার প্রতি তাদের বড় সখ। 'আলেম হওয়া ও কওমী শিক্ষা অর্জনের জন্য তাদের অশেষ আগ্রহ। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করা হয়, পিতামাতার এজাযত নিয়ে এসেছ তো? অনেকেই বলে, এজাযত নিয়ে আসেনি। তাদের কথা, আমরা তো নিরুপায়, তারা যে ইলমের জন্য অনুমতি দেয় না! তাই অনুমতি ছাড়াই চলে এসেছি। আমি তাদের বলি, মনে রাখতে হবে, আলেম বনা ওয়াজিব নয়। কিন্তু পিতামাতার আনুগত্য করা ফরয। হ্যাঁ, একজন মুসলিমরূপে জীবন-যাপনের জন্য যতটুকু শিক্ষা দরকার, যেমন নামায, রোযা, ওযূ-গোসল, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয ইত্যাদি জরুরি ইল্‌ম শিখতেও যদি তারা বাধা দেয়, সে ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করার সুযোগ নেই। কিন্তু মাওলানা-মওলবী হওয়ার পূর্ণ কোর্স শেষ করা ফরয বা ওয়াজিব নয়। এর জন্য পিতামাতার অনুমতি আবশ্যক, তারা অনুমতি না দিলে এটা জায়েয হবে না। কেউ যদি তাদের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও মওলবী হওয়ার মেহনত করে, তবে আমাদের হযরত (রহ.)-এর সেই কথাই

প্রযোজ্য হবে যে, সে কেবল নিজ সখ পূরণ করছে, তার এ মেহনত দীনের কাজ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর যথার্থ উপলব্ধি দান করুন-আমীন !

জান্নাত লাভের সহজ পথ

মনে রাখুন, পিতামাতা অনেক বড় নি'আমত। তারা যতদিন জীবিত থাকে, সন্তানের পক্ষে ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তাদের অপেক্ষা বড় নি'আমত কিছু নেই। সুতরাং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে যদি পিতামাতার দিকে ভক্তিভরে তাকায়, তার আমলনামায় একটি হজ্জ ও একটি 'উমরার ছওয়াব লেখা হয়।

(আদ-দুররুল-মানছূর, ৫খ, ২৬৪: জামি'উল-আহাদীছ, ১৯খ, ৩০৪ পৃ. হাদীছ নং ২০৮২১)

অপর এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি বড় হতভাগা, যে তার পিতামাতাকে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ তাদের খেদমত করে নিজ গুনাহসমূহ মাফ করাতে পারল না'।

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৮২৫৪)

সুতরাং কারও বৃদ্ধ পিতামাতা থাকলে তার পক্ষে জান্নাত লাভ এত সহজ যে, অন্য কোন উপায়ে অত সহজে জান্নাত লাভ সম্ভব নয়। সামান্য একটু খেদমত করলেই তাদের অন্তর থেকে দু'আ বের হয়ে আসে আর এভাবে আখিরাত নির্মাণ হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা নানান বাহানায় মানুষকে জান্নাত দিতে চান। তুমি এই সহজ বাহানায় জান্নাত পেয়ে যেতে পার।

মোটকথা, পিতামাতা যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাদেরকে মহা নি'আমত গণ্য করা চাই এবং তাদের কদর করা চাই। অনেকেই পিতামাতা চলে যাওয়ার পর আক্ষেপ করে, আহা, জীবিত থাকতে মূল্য দিলাম না, তাদের মনভরে খেদমত করলাম না, সুযোগ থাকতেও জান্নাত কামাই করলাম না। কিন্তু সময় হারিয়ে সেই আক্ষেপের তো কোন ফায়দা নেই।

পিতামাতার মৃত্যুর পর প্রতিকারের উপায়

পিতামাতার মৃত্যু হয়ে গেলে অধিকাংশ লোকের অনুভূতি হয় যে, কত বড় নি'আমত চলে গেল, কিন্তু কদর করা হল না। প্রশ্ন হচ্ছে, এখন কি প্রতিকারের কোন পথ খোলা নেই? নিশ্চয়ই আছে, আল্লাহ তা'আলা অশেষ মেহেরবান। তাঁর দরজা বান্দার জন্য সদা উন্মুক্ত। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা

এই পথ খোলা রেখেছেন যে, কেউ যদি পিতামাতার হক আদায়ে ক্রটি করে এবং তাদের দ্বারা নিজ আখিরাত না গোছায়, তবে সে দু'টি কাজ করতে পারে। এক তো তাদের জন্য ঈসালে ছওয়াব করা। অর্থাৎ দান-সদকা, নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি যতটুকুই সম্ভব করে তার ছওয়াব তাদেরকে হাদিয়া করবে। এর মাধ্যমে জীবদ্দশায় কৃত ক্রটির প্রতিকার হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কাজ হল, পিতামাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে যোগাযোগ রাখা, তাদের প্রতি সদাচরণ করা এবং পিতামাতার সাথে যেরূপ ব্যবহার করা দরকার ছিল সে রকম ব্যবহার তাদের সাথে করা। এর মাধ্যমেও আল্লাহ তা'আলা সেই ক্রটির প্রতিকার করে দেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

পিতার হক অপেক্ষা মায়ের হক তিন গুণ

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِيْ؟ قَالَ: اُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: اُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: اُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: اَبُوْكَ

'হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ। মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে ? তিনি বললেন, তোমার মা'। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা। (মুসলিমঃ হাদীছ নং ৪৬২২)

এ হাদীছে প্রশ্নকর্তার উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার মায়ের নাম নিয়ে বলেছেন, সেই সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার। চুতর্থবার বলেছেন পিতা। 'উলামায়ে কিরাম এ হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, মায়ের হক পিতার চেয়ে তিন গুণ বেশি। কেননা, সন্তানের লালন-পালনে মা যে কষ্ট করেন, পিতাকে তার এক-চতুর্থাংশও করতে হয় না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা মাকে হকও দিয়েছেন বেশি। পিতাকে দিয়েছেন এক ভাগ, মাকে তিনভাগ।

পিতার প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন ও মায়ের খেদমত

সুতরাং 'উলামায়ে কিরাম বলেন, পিতামাতাকে হাদিয়া দেওয়ার সময় মাকে বেশি দেওয়া চাই। বুযুর্গানে দ্বীন এ প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তারা বলেন, এক হল তা'জীম (মর্যাদা জ্ঞাপন ও সম্মান প্রদর্শন) আরেক হল খেদমত ও সদ্ব্যবহার। দুটো আলাদা জিনিস। তা'জীমের ক্ষেত্রে পিতার অগ্রাধিকার আর খেদমতে মায়ের প্রাপ্য বেশি। হাদীছে যে মায়ের হক পিতার তিন গুণ বলা হয়েছে, এর সম্পর্ক খেদমতের সাথে। অর্থাৎ সন্তানের কর্তব্য খেদমতে মাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। পিতার চেয়ে তার খেদমত বেশি করা। এ হক মাকে তিন গুণ বেশি দেওয়া হয়েছে।

সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা সন্তানদেরকে মা'মুখী করেছেন। পিতার চেয়ে মায়ের সাথেই সন্তানেরা বেশি সহজ ও সচ্ছন্দ হয়। তাই অনেক কথা পিতাকে খুলে বলতে পারে না, কিন্তু মায়ের কাছে অকপটে বলে ফেলে। তাই শরী'আত এ দিকেও লক্ষ রেখেছে। হাফেজ ইবন হাজার (রহ.) 'ফাতহুল-বারী' গ্রন্থে এই মূলনীতি লিখে দিয়েছেন যে, সন্তান পিতাকে বেশি তা'জীম করবে আর খেদমত বেশি করবে মায়ের।

মাতৃসেবার সুফল

মাতৃসেবা অতি মূল্যবান জিনিস। কল্পনাই করা যায় না তা মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌছিয়ে দেয়। আপনারা হযরত উওয়ায়স করনী (রহ.)-এর ঘটনা তো শুনলেনই। এ জাতীয় আরও বহু ঘটনা আছে। যেমন ইমাম গাযালী (রহ.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ যে, বহুদিন পর্যন্ত কেবল মায়ের সেবায় ব্যস্ত থাকার কারণে তার পক্ষে 'ইলমে দ্বীন' শেখায় আত্মনিয়োগ সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরে যখন সে সুযোগ পান তখন আল্লাহ তা'আলা তাতে এমন বরকত দান করেন যে, জগত জানে 'ইলমের কোন শিখরে তিনি পৌছে গিয়েছিলেন. কাজেই মাতৃসেবাকে মহামূল্যবান সম্পদ মনে করা চাই।

ফিরে গিয়ে পিতামাতার সেবা কর

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ . اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللهِ تَعَالَى قَالَ فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَيٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا. قَالَ فَتَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا

'হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল-'আস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল, আমি হিজরত ও জিহাদের উপর আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করতে চাই (অর্থাৎ আমি দুটি কাজের জন্য আপনার হাতে অঙ্গীকার গ্রহণ করতে এসেছি।

ক. আমি আমার দেশ ছেড়ে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে থাকতে চাই এবং

খ. আপনার পাশে থেকে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই। আর এর দ্বারা আমার নিয়ত আল্লাহ তা'আলার কাছে ছওয়াব ও প্রতিদান লাভ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতামাতা কেউ জীবিত আছেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ, দু'জনই জীবিত। তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহ তা'আলার কাছে ছওয়াব ও প্রতিদানেরই আশা কর? সে বলল হাঁ।

তিনি বললেন, তাহলে (আমার সাথে জিহাদে না গিয়ে বরং) তুমি নিজ পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। (মুসলিম, হাদীস নং ৪৬২৪: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৬২৩৯)

দেখুন এ হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাথে জিহাদের ফযীলতকে তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের উপর কোরবান করে দিলেন এবং তাকে তার পিতামাতার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

অপর এক হাদীছে আছে, একবার জিহাদের প্রস্তুতি চলছিল। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে এসেছি। আমি আসার সময় আমার পিতামাতা কাঁদছিলেন। অর্থাৎ তারা আমাকে জিহাদে আসার অনুমতি দিচ্ছিল না। তাই তাঁরা কাঁদছিল। তবু আমি জিহাদে অংশগ্রহণের প্রেরণায় চলে এসেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে বললেন,

اِرْجِعْ فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا

'ফিরে যাও এবং তাদের মুখে হাসি ফোটাও, যেমন তাদের কাঁদিয়ে এসেছ'। (আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ২১৬৬; ইবন মাজা; হাদীছ নং ২৭৭২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৬৬১৫)

অর্থাৎ তিনি পিতামাতাকে কাঁদিয়ে তাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে খুশি করতে বললেন।

'সীমারেখা' রক্ষা করাই দ্বীন

এটা হল সীমারেখার হেফাযত একারণেই আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, দ্বীন মূলত 'সীমারেখা' হেফাজত করার নাম। জিহাদের ফযীলত শুনে কেবল সে দিকেই ঝুঁকে পড়া এবং সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে তাতে শরীক হতে চলে যাওয়ার নাম দ্বীন নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত হুকুমের দিকে লক্ষ রেখে যথাসময়ে যথাবিহিত কাজ করা চাই। আমার মহান পিতা হযরত মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) বলতেন, আজকাল মানুষ একদেশদর্শী হয়ে গেছে মুখে লাগাম লাগানো থাকলে ঘোড়া যেমন এক দিকেই ছোটে, অন্যদিকে ফিরেও তাকায় না, তেমনি মানুষও একরোখা হয়ে গেছে। যখন কোন কাজ সম্পর্কে জানতে পারে তার অনেক ফযীলত, তখন আর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সে দিকেই দৌড় মারে। একবারও চিন্তা করে না, আমার দায়িত্বে আর কোন কাজ আছে কিনা এবং অন্যান্য কাজের গুরুত্ব ও সীমারেখাই বা কী?

আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য

সব দিকে লক্ষ রেখে চলা এবং সব কিছুর সীমারেখা হেফাজত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাধারণত এগুণ কেবল পড়াশুনার দ্বারা বা জ্ঞানলাভের দ্বারা অর্জিত হয়ে যায় না। এর জন্য আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য অবলম্বন করতে হয়। আমি মুখে বলে দিলাম, আপনি শুনে নিলেন, এটাই যথেষ্ট নয়। কিতাবেও এসব কথা লেখা আছে। কিন্তু কোন সময়ে কোন পন্থা অবলম্বন করা চাই, কোন পরিস্থিতিতে কোন কাজকে প্রাধান্য দিতে হয়, এটা কোন কামেল শায়খের সাহচর্য ছাড়া আত্মস্থ করা যায় না। মানুষের স্বভাবই হল হয় বাড়াবাড়ি করবে, নয়ত শৈথিল্য। কামেল শায়খই বলে দিতে পারেন, কোন্ মুহূর্তে কি কাজ করতে হবে। আমার পক্ষে কখন কোন কাজ উত্তম, কোনটা উত্তম নয়, তা বুঝতে হলে শায়খের কাছে সমর্পিত হতে হবে। হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর কাছে যখন কেউ ইসলাহের জন্য আসত, তখন তিনি অনেককে ওজীফা ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য কাজে লাগিয়ে দিতেন। এর কারণ, তিনি জানতেন, এ ছাড়া সে সীমারেখার হেফাজতে অভ্যস্ত হতে পারবে না।

শরী'আত, সুন্নত ও তরীকত

আমাদের হযরত ডাক্তার 'আব্দুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, যত রকমের হক আছে সবই শরী'আত। অর্থাৎ শরী'আত হল হকসমূহের নাম। আল্লাহ তা'আলার হক ও বান্দার হক-এই উভয় প্রকারের যত হক আছে তার সমষ্টিই শরী'আত। আর যত হুদূদ বা সীমারেখা আছে, তা সুন্নত। অর্থাৎ সুন্নত দ্বারা জানা যায় কোন হকের কি সীমানা। হক্কুল্লাহর সীমা কোন পর্যন্ত এবং হক্কুল-'ইবাদের সীমানা কোন পর্যন্ত তা জানতে হলে সুন্নতের শরণাপন্ন হতে হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতই এ কথা শিক্ষা দেয় যে, কোন হক কোন সীমা পর্যন্ত আদায় করতে হবে। তো এই গেল শরী'আত ও সুন্নত। বাকি থাকল তরীকত। তরীকত হল হুদূদ বা সীমারেখার হেফাজত। অর্থাৎ সুন্নত দ্বারা হুকূকের যে সীমারেখা জানা গেল, তা সংরক্ষণ করাকেই তাসাওউফ ও সুলূক বা তরীকত বলা হয়। তরীকতের মাধ্যমেই হুদূদের হেফাজত হয়।

সারকথা শরী'আতের সবটাই হুকূক (বিভিন্ন রকমের হক)

সমগ্র সুন্নত হল সেই হুকূকের সীমারেখা আর তরীকত সেই সীমারেখার সংরক্ষণ। ব্যস এই তিনিটি জিনিস অর্জিত হয়ে গেলে আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। কিন্তু এসব জিনিস এমনিতেই হাসিল হয়ে যায় না। এর জন্য দরকার কামেল শায়খের সাহচর্য, কোন আল্লাহওয়ালার হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। আল্লাহওয়ালার সামনে নিজেকে পিষ্ট ও দলিত না করা পর্যন্ত এ মহাসম্পদ অর্জন করা যায় না। বলা হয়েছে-

قال را بگزار صاحب حال شو پیش مردے کامل پامال شو

'কথা ছাড়, ভাবের সাগরে ডুব দাও। কোন কামেল ব্যক্তির হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সপে দাও'।

কোন লোক যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কামেল শায়খ ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির হাতে নিজেকে সপে না দেবে এবং নিজেকে তার সামনে দলিত-মথিত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শরী'আত, সুন্নত ও তরীকতের উপর নিজেকে চালিত করতে পারবে না; বরং সে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার শিকার হয়ে যাবে। কখনও এইটা ধরবে, ওইটা ছাড়বে, কখনও ওইটা ধরবে তো এইটা ছাড়বে। কখনও এদিকে ঝুঁকবে, কখনও ওদিকে ঝুঁকবে। গোটা তাসাওউফের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার প্রান্তিকতা হতে বাঁচানো।এবং মধ্যপন্থায় নিয়ে আসা। তাকে শিখিয়ে দেওয়া যে, কোন

সময়ের কি দাবি, যাতে সে একরোখা নীতির শিকার হয়ে বিশেষ কোনও দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে না পড়ে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ইসলাহী খুতুবাত; ১খণ্ড, ৫৩-৭৮ পৃষ্ঠা

সন্তানদের তারবিয়াত (গড়ে তোলার কাজ) কিভাবে করবেন?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۞

'হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে কঠোর-কঠিন ফিরিশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা আদেশ করেন তা এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তাই করে'। (তাহ্‌রীম : ৬)

ইমাম নববী (রহ) 'রিয়াযুস-সালিহীন' গ্রন্থে স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ কেবল এই উদ্দেশ্যে দাঁড় করিয়েছেন যে, এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিতে চান, তার কর্তব্য কেবল নিজেকে উদ্ধার করাই নয়। সে তার নিজেকে সংশোধন করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না; বরং নিজ পরিবার-পরিজন, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং অধীনস্থ সকলের ইসলাহ করাও জরুরি। তাদেরকে দ্বীনের উপর আনার চেষ্টা করা, ফরয ও ওয়াজিব কাজসমূহ যাতে ঠিক ঠিক পালন করে সেদিকে লক্ষ রাখা, গুনাহ হতে বেঁচে থাকার জন্য তাগিদ দেওয়া এবং তাদেরকে শরী'আতসম্মত জীবনে অভ্যস্ত করে তোলাও তার দায়িত্ব। এ লক্ষে তিনি এ পরিচ্ছেদে কয়েকটি আয়াত ও কিছু হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন।

কেমন প্রীতি সম্ভাষণ!

যে আয়াত পেশ করা হল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এটি মূল শিরোনামস্বরূপ। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সম্বোধন করছেন এই বলে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

'হে মু'মিনগণ'!

আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের সম্বোধন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা শব্দ ব্যবহার করেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

আমাদের হযরত ডাক্তার 'আব্দুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

'শব্দগুচ্ছে' সম্বোধন করে থাকেন। এটা অত্যন্ত প্রীতিব্যঞ্জক সম্ভাষণ। এর অর্থ 'হে মু'মিনগণ! হে ওই সকল লোক, যারা ঈমান এনেছ'। এ সম্ভাষণ প্রীতিরসে সিঞ্চিত। সাধারণত কাউকে সম্বোধন করা হয় তার নাম নিয়ে। 'হে অমুক' ! বলে। কখনও কখনও পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র ধরেও সম্বোধন করা হয়। যেমন কোন পিতা তার পুত্রকে সম্বোধনকালে কখনও তো তার নাম নিয়ে বলে, হে অমুক। আবার কখনও বলে, হে বেটা! ওহে বাছা! বলাবাহুল্য এই দ্বিতীয় সম্বোধন অনেক বেশি প্রীতিপূর্ণ। এটা শুনতেও বড় ভালো লাগে। কেননা, এ সম্বোধনে যে স্নেহ-মমতার পরশ পাওয়া যায়, নামযুক্ত সম্বোধনে তা কখনও পাওয়া যায় না।

বেটা হে! ওহে বাছা! অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ডাক

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উছমানী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি একজন যুগশ্রেষ্ঠ 'আলেম ও ফকীহ ছিলেন। আমরা যখন তাকে দেখেছি জ্ঞান-গরিমায় পাকিস্তানে কি, সারা বিশ্বে তার সাথে তুলনা করার মত কেউ ছিল না। সমগ্র পৃথিবীতে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য স্বীকার করা হত। শায়খুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ''আল্লামা' যোগে নাম নেওয়া হত । আরও বিভিন্ন সম্মানসূচক অভিধা তার নামে যুক্ত হত। মাঝে-মাঝে তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। তখন আমার দাদী জীবিত ছিলেন। সম্পর্কে তিনি 'আল্লামার মামী ছিলেন। তাই হযরত 'আল্লামাকে তিনি' বেটা' সম্বোধনে ডাকতেন। এই বলে দু'আ করতেন যে, 'বেটা বেঁচে থেক'। আমরা

এতবড় 'আল্লামাকে যখন এই শব্দে ডাক দিতে শুনতাম বড় অবাক হতাম। সারা জগত যাকে শায়খুল ইসলাম নামে অভিহিত করে, তিনি কিনা তাকে' বেটা, বলে সম্বোধন করছেন!

কিন্তু 'আল্লামা 'উছমানী (রহ.) বলতেন, আমি মুফ্‌তী সাহেব [মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)]-এর বাড়িতে আসি দু'টি উদ্দেশ্যে। একটি হল মুফ্‌তী সাহেবের সাথে সাক্ষাত করা আর দ্বিতীয়টি এই যে, বর্তমানে ইহজগতে আমাকে 'বেটা' বলে ডাকার আর কেউ নেই। এতে যেই আনন্দ ও আস্বাদ বোধ করি, অন্য কোন সম্বোধনে তা বোধ করি না।

আসলে এর মূল্য তো কেবল সেই বুঝতে পারে, যে এ ডাকের মর্ম জানে এবং যেই আবেগ ও অনুভূতি থেকে এটা উৎসারিত হয়, তার সাথে পরিচিত থাকে। হযরত 'আল্লামা (রহ.) তাকে যে 'বেটা' বলে ডাকা হচ্ছে, তা কত বড় নি'আমত তা জানতেন আর সে কারণেই তিনি এর কদর করতেন। এমন একটা সময় আসে, যখন মানুষ এ জাতীয় শব্দ শোনার জন্য পিপাসা বোধ করে।

সুতরাং হযরত ডাক্তার 'আব্দুল হাই আরেফী (রহ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا। "শব্দগুচ্ছে' সম্ভাষণ করে তাঁর সাথে মু'মিনদের সম্পর্ককে স্মরণ করিয়ে দেন, যা ঈমান আনার দ্বারা আল্লাহর সাথে প্রতিজন ঈমানদারের স্থাপিত হয়েছে। বাবা যেমন তার ছেলেকে 'বাছা হে' বলে সম্বোধন করে এটাও ঠিক সে রকমই। বাবার বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে, সামনে তোমাকে যে কথা বলা হচ্ছে, তার সবটাই স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতা থেকে উৎসারিত। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলাও কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এই প্রীতি সম্ভাষণ দ্বারা বোঝাতে চান যে, বান্দা, যে বিধান আমি তোমাকে দিতে যাচ্ছি, তা তোমার প্রতি আমার মমতা, ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতা থেকেই দিচ্ছি। তুমি আন্তরিকভাবে গ্রহণ কর। কুরআন মাজীদের সে সব জায়গারই একটি হচ্ছে এই আয়াত।

ব্যক্তিগত আমল নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানাচ্ছেন, হে বান্দা! কেবল এতটুকুতেই সব শেষ হয়ে যায় না যে, তুমি শুধু নিজেকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে ক্ষান্ত হয়ে যাবে আর এই ভেবে নিশ্চিন্তি বোধ করবে যে, আমার কাজ শেষ। বরং নিজ পরিবার, পরিজনকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচানো জরুরি, এখন তো এমন দৃশ্য সচরাচরই চোখে পড়ে, কোন ব্যক্তি নিজে বেশ দ্বীনদার, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যত্নের সাথে আদায় করছে। জামাতে প্রথম কাতারে দাঁড়ায়।

ঠিকভাবে রোযা রাখছে। যাকাত আদায়েও অবহেলা করে না। আল্লাহর পথে দান-খয়রাত খুব করে। যত আদেশ-নিষেধ আছে, সবই পালনের চেষ্টা করে, কিন্তু তার ঘরের দিকে তাকাও, বিবি-বাচ্চার প্রতি লক্ষ কর, সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য চোখে পড়বে। উভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য, ইনি কোন দিকে যাচ্ছেন আর তারা কোথায় চলছে। ইনি পশ্চিমমুখী হয়ে আছেন আর তাদের চেহারা পূর্ব দিকে। না তাদের নামাযের চিন্তা আছে, না দ্বীনী দায়িত্ব-কর্তব্যের অনুভূতি। তারা গুনাহকে গুনাহ মনে করে না। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সব পাপের সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে। অথচ সাহেবের এ নিয়ে কোন ভাবনা নেই। ভাবখানা হল, আমি তো নামায পড়ছি, জামাতের প্রথম কাতারে থাকি, পূর্ণ শরী'আত মেনে চলার চেষ্টা করি, আর কি চাই? চাই তো বটেই! আল্লাহ তা'আলা কাজ কেবল এতটুকুই দেননি। তিনি আরও কিছু চান। তিনি চান ঘরের কর্তা ঘরের লোকজনকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে, ঘরের লোকজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ফিকির না করলে তার নিজেরও রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে না। 'আমি নিজে তো কেবল নিজ আমলেরই মালিক ছিলাম, ছেলেমেয়েরা অন্যদিকে গেলে আমি কি করতে পারি, এ জাতীয় কথা বলে নিজেকে রক্ষা করা যাবে না। কেননা, তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করাও তোমার দায়িত্ব ছিল। সে দায়িত্ব পালনে যখন তুমি অবহেলা করেছ, তখন আখিরাতে তোমাকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতেই হবে।

ছেলেমেয়ে না মানলে কি করব?

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন, 'নিজকে ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর'। মূলত এর দ্বারা একটি খটকার জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমাদের অনেকেরই অন্তরে তা দেখা দেয়। যখন কাউকে বলা হয়, নিজ সন্তানদেরকেও দ্বীনের শিক্ষা দাও, দ্বীনের কিছু কথা তাদের বল। তাদেরকে দ্বীনের দিকে ডাক এবং গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা কর, তখন এর উত্তরে বলে, আমরা ছেলেমেয়েদেরকে দ্বীনের দিকে আনার অনেক চেষ্টা করেছি, তাদেরকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু কী করব, দিনকাল খারাপ, পরিবেশ-পরিস্থিতি ভালো না, তারা আমার কথা একদম শোনে না, যুগ-কালের প্রভাবে তারা অন্যপথ ধরেছে, সে পথই তাদের পসন্দ, কিছুতেই তা বদলাতে প্রস্তুত নয়। আর কি করা যাবে, তাদের আমল তাদের সাথে যাবে, আমার আমল আমার সাথে। তাদেরকে তো আর জোর করে বদলাতে পারব না! তারা এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে হযরত নূহ

'আলাইহিস-সালাম ও তার পুত্রের বৃত্তান্ত উল্লেখ করে। পুত্র কিনান শেষ পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়। হযরত নূহ 'আলাইহিস-সালাম তাকে বাঁচাতে পারেননি। তাকে ডুবে মরতে হয়েছে। আমরাও সে রকম চেষ্টা করছি। তারা না মানলে তো আমাদের কিছু করার নেই।

দুনিয়ার আগুন থেকে তাদেরকে কিভাবে বাঁচানো হয়?

কুরআন মাজীদ এস্থলে نَارًا শব্দ ব্যবহার করে সেই অজুহাত ও খটকার উত্তর দিয়ে দিয়েছে। এ মূলনীতি তো ঠিকই আছে যে, পিতামাতা যদি সন্তানকে বেদ্বীনী থেকে বাঁচানোর পুরোপুরি চেষ্টা করে, তবে ইনশাআল্লাহ তারা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং সন্তানদের দুষ্কর্মের জন্য তাদেরকে দায়ী করা হবে না; বরং সে দায় সম্পূর্ণ সন্তানদের উপরই থেকে যাবে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হল সন্তানদেরকে বেদ্বীনী থেকে বাঁচানোর চেষ্টা তারা ঠিক কী পরিমাণ করেছে? আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা করা হয়, ঠিক সেই পরিমাণে করেছে কি? কুরআন মাজীদ 'আগুন' শব্দ ব্যবহার করে এটাই জানাচ্ছে যে, তাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা সেভাবেই করতে হবে, যেমন চেষ্টা আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য করা হয়।

মনে করুন কোথাও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। তার মধ্যে কেউ পড়ে গেলে বাঁচার কোন উপায় থাকে না। আপনার অবোধ শিশু সেই আগুন দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে দেখল বড় চমৎকার দৃশ্য। কাজেই সে সেদিকে এগিয়ে গেল। বলুন তো, এ অবস্থায় আপনি কী করবেন? আপনি কি বসে বসে এই উপদেশ দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করবেন যে, বাছা, ওদিকে যেও না। দেখছ না মারাত্মক আগুন! ওদিকে গেলে পুড়ে যাবে। নির্ঘাত মারা পড়বে। বাবা, ফিরে এসো।

বলুন তো কেউ কি এই মৌখিক উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যায়? এ উপদেশের পরও যদি শিশুটি সেই আগুনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তবে কি বাবা-মা এই বলে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে যে, আমরা তাকে যথেষ্ট বুঝিয়েছিলাম, নিজ দায়িত্ব আদায় করেছিলাম, কিন্তু সে তা মানেনি, বরং সে সব উপদেশ অগ্রাহ্য করে নিজ খুশিতে আগুনের মধ্যে ঢুকে গেছে। সুতরাং আমাদের কি করার আছে? আসল কথা দুনিয়ার কোন বাবা-মা এমন করবে না। তারা প্রকৃত বাবা-মা হয়ে থাকলে যখন দেখবে শিশুটি আগুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আর কলিজায় পানি থাকবে না, উপদেশ দেবে কি, উড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোলে করে সেখান থেকে নিয়ে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা স্থিরই হতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তোমরা নিজ সন্তানকে দুনিয়ার তুচ্ছ আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যখন কেবল মৌখিক জমা-খরচকেই যথেষ্ট মনে করছ না, তখন জাহান্নামের আগুন, যার খরতাপের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, দুনিয়ায় বসে যার তীব্রতা কল্পনা করাই সম্ভব নয়, সেই আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য মৌখিক উপদেশকেই যথেষ্ট মনে করছ কিভাবে? সুতরাং অত সহজে একথা বলে দেওয়ার সুযোগ নেই যে, আমরা তাদেরকে অনেক বুঝিয়েছি ও উপদেশ দিয়েছি, আমাদের দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে।

আজকাল দ্বীন ছাড়া সব কিছুরই ফিকির আছে

হযরত নূহ 'আলাইহিস-সালাম ও তাঁর পুত্রের যে উদাহরণ দেওয়া হয়, আর বলা হয় তাঁর পুত্র কাফেরই থেকে গিয়েছিল, তিনি তাকে বাঁচাতে পারেননি, এটা চলবার নয়। কেননা, পুত্রকে সঠিক পথে আনার জন্য তিনি কতটা চেষ্টা করেছেন সেটাও তো দেখতে হবে। টানা নয়শ' বছর তাঁর চেষ্টা অব্যাহত ছিল। তা সত্ত্বেও যখন সে তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, তখন দায় সম্পূর্ণ তার নিজেরই, সেজন্য হযরত নূহ 'আলাইহিস-সালামকে দোষ দেওয়ার কোন উপায় নেই। তিনি নিজ দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আদায় করেছিলেন। কিন্তু আমরা ঠিক কতটা দায়িত্ব পালন করি। এক-দু'বার ডেকেই মনে করি অনেক করেছি। ব্যস এরপর আর কিছু করার আছে বলে মনে করি না। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে বসে যাই। অথচ বাস্তবিক আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যেমন চেষ্টা করা হয়ে থাকে, গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্যও তার পেছনে সেই রকম চেষ্টা করা দরকার ছিল। ঠিক সে রকম চেষ্টা করা না হয়ে থাকলে বুঝতে হবে দায়িত্ব আদায় হয়নি। আজকাল তো পিতামাতাকে ছেলেমেয়ের প্রতি বিষয়েই চিন্তা করতে দেখা যায়। কিভাবে তার উচ্চ শিক্ষা হবে, তার ক্যারিয়ার গড়বে, কিভাবে সে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এসব নিয়ে তাদের চিন্তার অন্ত নেই। তাদের খাওয়া পরা নিয়েও তারা কি পেরেশান থাকে, অথচ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বীন, সে নিয়ে তাদের কোন ভাবনা নেই।

খানিকটা বেদ্বীন হয়ে গেছে

আমার পরিচিত এক লোক, যে বেশ উচ্চ শিক্ষিত ছিল এবং দ্বীনদার ও তাহাজ্জুদগোযার ছিল। তার ছেলে আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছে। কোথাও একটা ভালো চাকরি পেয়ে গেছে। বাবা খুব খুশি। একদিন তৃপ্তির সাথে বলছিল, মাশাআল্লাহ আমার ছেলে এমন উচ্চ ডিগ্রি

লাভ করেছে। তার একটা ভালো চাকরি হয়ে গেছে। এখন বলা যায় সামাজিকভাবে সে প্রতিষ্ঠিত। তবে খানিকটা বেদ্বীন হয়ে গেছে। কিন্তু ক্যারিয়ার বেশ শানদার গড়ে ফেলেছে।

ভাবুন তো দেখি, সে বিষয়টাকে কেমন লঘুভাবে নিচ্ছে! তার অনুভূতি হল ছেলে খানিকটা বেদ্বীন হয়ে গেছে। কিন্তু ক্যারিয়ার বেশ শানদার গড়ে ফেলেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বেদ্বীন হওয়াটা তেমন কোন ব্যাপার নয়। একটু বদলেছে বটে, কিন্তু তা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই. অথচ সে নিজে বেশ দ্বীনদার লোক ছিল, নিয়মিত তাহাজ্জুদও পড়ত।

কেবল জানটা চলে গেছে এই যা!

আমাদের মহান পিতা হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শফী' (রহ.) একটি ঘটনা শোনাতেন। এক ব্যক্তির ইন্তিকাল হয়ে গেছে। কিন্তু লোকজন তাকে জীবিত মনে করছিল। কাজেই ডাক্তার আনা হল। কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা দরকার তার হয়েছে কি? নড়াচড়া করছে না কেন? ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল। শেষে বলল, রোগী একদম ঠিক আছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সুস্থ। কোন সমস্যা নেই। কেবল জানটা একটু বের হয়ে গেছে।

ঠিক এ রকমই ওই ভদ্রলোকের মন্তব্য। মাশাআল্লাহ ছেলে খুব ভালো ক্যারিয়ার গড়ে ফেলেছে। কেবল একটু বেদ্বীন হয়ে গেছে এই যা। যেন বেদ্বীন হওয়াটা এমন কোন ব্যাপার নয়, যা দ্বারা বিশেষ কিছু ক্ষতি হতে পারে।

নতুন প্রজন্মের অবস্থা

আজকাল আমাদের সব দৌড়ঝাঁপ দুনিয়া নিয়ে। সন্তানদের প্রতিটি বিষয়ে লক্ষ আছে, কিন্তু দ্বীনের দিকে কোন লক্ষ নেই। ভাই দ্বীন যদি এতটাই ভ্রূক্ষেপের অযোগ্য জিনিস, তবে আপনি কেন কষ্ট করে নামায পড়ছেন, মসজিদে যাচ্ছেন এবং তাহাজ্জুদের জন্য জাগছেন? আপনিও নিজ পুত্রের মত কেন ক্যারেকটরের পেছনে পড়ে থাকলেন না?

এখন আর শুরুতেই সন্তানদেরকে দ্বীন শেখানোর কোন গরজ বোধ হয় না। জন্ম হওয়ার পরই তাদেরকে নার্সারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তাদেরকে কুকুর-বেড়াল শেখানো হয়, কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তার নাম শেখানো হয় না। দ্বীনের কোন কথা কানে দেওয়া হয় না। এখন তো সেই প্রজন্মেরই কাল। তারা ওইভাবে তৈরি হয়ে গেছে। তাদেরই হাতে ক্ষমতার বাগডোর। জীবন ও সমাজ তারাই পরিচালনা করছে। জন্ম লাভের পরই তারা স্কুলমুখী

হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কালামের উপর তাদের নজর পড়েনি। কুরআন পড়তে পারে না। নামায জানে না। গোটা সমাজের প্রতি চোখ বুলান, সংখ্যাগরিষ্ঠকেই পাবেন কুরআন মাজীদ পড়তে পারে না, এবং সঠিকভাবে নামায পড়তে জানে না। কারণ কেবল এই যে, বাবা-মা' তাদের সন্তানকে জন্মের আগেই ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তির ফিকির করছে কিন্তু শিশু বড় হয়ে যায় তবু তাকে দ্বীন শেখানোর কোন গরজ বোধ করে না।

সন্তান এখন পিতামাতার মাথার উপর সওয়ার

আল্লাহ তা'আলার নীতি মোতাবেকই সব ঘটছে, হাদীছ শরীফে তাঁর একটা নীতি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন মাখলূককে খুশী করার জন্য আল্লাহ তা'আলাকে নারাজ করে আল্লাহ তা'আলা সেই মাখলূককেই তার মাথার উপর চাপিয়ে দেন। মনে করুন এক ব্যক্তি কাউকে খুশি করার উদ্দেশ্যে কোন পাপকাজ করল এবং সেই পাপের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে নারাজ করল। এর পরিণাম হবে এই যে, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে তার উপর এমনভাবে চাপিয়ে দেবেন যে, সে এখন তার উপর ছড়ি ঘোরাতে থাকবে. বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখুন।

বর্তমানে সেই পরীক্ষা চলছে। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের খুশি করার জন্য সব রকমে তাদের মন রাখছি। তাদের ক্যারিয়ার গড়ুক, রোজগার ভালো হোক, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক এসব কিছুর দিকে পুরোপুরি লক্ষ রাখছি। আর এতে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তাদেরকে দ্বীন শেখানো থেকে বঞ্চিত রাখছি। এই দ্বীন শেখানোটা আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছিল। সে হুকুম অমান্য করে আল্লাহ তা'আলাকে নারাজ করছি। এর পরিণাম এই হয়েছে যে, যেই সন্তানদেরকে খুশি করার জন্য সব রকম সাধ্য-সাধনা করেছি, তারাই এখন মাথার উপর চেপে বসেছে। সমাজের দিকে দেখুন না কিভাবে ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের অবাধ্যতা করছে। তারা এখন বাবা-মার পক্ষে মূর্তিমান আযাব। এর কারণ কেবল এই যে, বাবামা' তাদেরকে দ্বীন শেখানোর কোন গরজ বোধ করেনি। কেবল তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করেছে, তারা যাতে ভালো আয়-রোজগার করতে পারে, সে দিকেই নজর রেখেছে। ভালো চাকরি জুটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে আর সে লক্ষে তাদেরকে বেদ্বীনী পরিবেশে ছেড়ে দিয়েছে। এমন এক পরিবেশে তাদের ছুড়ে দিয়েছে, যেখানে বাবা-মাকে সম্মান করার কোন সবক নেই। বাবা মায়ের আনুগত্য করার কোন শিক্ষা নেই; বরং নিজ খেয়াল-খুশি মত স্বাধীন-অবাধ জীবন যাপনেরই সবক দেওয়া হয়। সেই শিক্ষা মোতাবেক যদি এখন

সেই সন্তান নিজ খেয়াল-খুশি অনুযায়ী চলে, সব সিদ্ধান্ত নিজ ইচ্ছা মোতাবেক নেয়, তবে অবাক হওয়ার কী আছে? কত বাবা-মা আক্ষেপ করে আর কাঁদে। আহা! আমরা কি এরই জন্য সন্তানকে লেখা-পড়া করিয়েছিলাম! কী চেয়েছিলাম আর সে কী করছে! কিন্তু ভাই এটা বৃথা আক্ষেপ। আপনি তাকে চালিয়েছেনই এমন পথে, যার গন্তব্যই আপনার মাথায় চড়ে বসা। আপনি তাকে যে ধরনের শিক্ষা দিয়েছেন, যে পথে চালিয়েছেন, তার চরিত্র তো এরকমই। এ শিক্ষাধারায় বাবামাকে তাদের বার্ধক্যকালে বোঝা মনে করা হয়। এর চেতনা হল, বুড়োকালে তারা ঘরে থাকার উপযুক্ত নয়। তাদের স্থান নার্সিং হোম (Nursing Home)। ব্যস তাদেরকে সেখানেই পাঠিয়ে দাও। আদরের সন্তান তাদেরকে সেখানেই চালান করে দেয়। এখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। এমন কি সেই বৃদ্ধনিবাসে তারা কিভাবে দিন কাটাচ্ছে সেই খবর নেওয়ারও কোন দরকার মনে করে না।

বাবা 'নার্সিং হোম'-এ

পশ্চিমের দেশগুলোতে তো এটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে যে, বৃদ্ধ বাবা নার্সিং হোমে পড়ে রয়েছে, শেষ পর্যন্ত সেখানেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে। সেখানকার ম্যানেজার সাহেব পুত্রধনকে ফোনে খবর দেয়। উত্তরে সে জানায়, ভাই আমি বড় দুঃখিত যে, তার মৃত্যু হয়ে গেল। আপনি মেহেরবানী করে একটু তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করে দিন। দয়া করে বিল পাঠিয়ে দেবেন, আমি পরিশোধ করে দেব। তো সে সব দেশ সম্পর্কে তো এসব অনেক শুনেছি। কিন্তু আমাদের ওই মুসলিম দেশেও কি এটা ভাবা যায় ? তা না-ই যাক, বাস্তবে ঘটা শুরু হয়ে গেছে। এই করাচিতেও একটা নার্সিং হোম আছে। সেখানে বৃদ্ধদের থাকার ব্যবস্থা আছে। দিন কতক আগে এক ভাই আমাকে জানিয়েছে যে, এই নার্সিং হোমেও এরকম এক ঘটনা ঘটেছে। সেখানে এক বৃদ্ধের ইন্তিকাল হলে তার পুত্রকে খবর দেওয়া হল। সে ওয়াদা করল আমি আসছি। কিন্তু পরে ওযর দেখালেন যে, আমাকে অমুক জরুরি মিটিংয়ে যেতে হচ্ছে। কাজেই আপনারাই তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করুন। আমার আসা সম্ভব হচ্ছে না। এই তো সন্তান যাকে খুশি রাখার খাতিরে আল্লাহ তা'আলাকে নারাজ করা হচ্ছে। এরই পরিণামে সেই সন্তানকে মাথার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাদীছে স্পষ্টই বলা হয়েছে, তুমি যেই মাখলূককে খুশী রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলাকে নাখোশ করবে আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর সেই মাখলূকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দেবেন।

যেমন কর্ম তেমনই ফল

সেই সন্তান যখন মাথার উপর চেপে বসেছে, এখন বাবা-মা বসে বসে কাঁদছে আর আক্ষেপ করছে, আহা! ছেলেমেয়ে অন্য পথে চলে যাচ্ছে। ভাই তুমি শুরুতেই যখন তাকে ভিন্ন পথে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছ, তখন তার এ পরিণতি না হয়ে পারে কি? সে পথটাই হল চিন্তা-চেতনা বদলে দেওয়ার, মনোভাব পাল্টে দেওয়ার ও মস্তিষ্ক ঘুরিয়ে দেওয়ার পথ। কাজেই পরিণতি তো এমনই হওয়ার ছিল,

اندرون قعر دریا تختہ بندم کردہ ای   باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش

'হাত পা' বেঁধে আমাকে মাঝনদীতে ফেলে দিলে। আবার কি না বলছ কাপড় যেন না ভিজে!

ভাই ! তুমি প্রথমেই যদি তাকে কুরআন পড়া শেখাতে, কিছু হাদীছ শেখাতে, বিশেষত সেইসব হাদীছ, যাতে রয়েছে মানুষ হওয়ার সবক, যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ যখন ইহলোক ত্যাগ করে যায়, তখন কেবল তিনটি জিনিসই তার কাজে আসে।

ক. তার রেখে যাওয়া এমন ইলম ও জ্ঞান যা মানুষের উপকারে আসে, যেমন দ্বীনী বই-পুস্তক লিখে গেছে, যা পড়ে মানুষ দ্বীন সম্পর্কে জানছে কিংবা মানুষকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিত, তার ছাত্ররাও সেই কাজ চালু রেখেছে, ফলে মানুষের মধ্যে ইলমে দ্বীনের বিস্তার ঘটছে, তো এই উপকারী ইলমের চর্চা সেই ব্যক্তির কাজে আসবে। মৃত্যুর পরও সে এর ছওয়াব পেতে থাকবে।

খ. সাদাকায়ে জারিয়া, অর্থাৎ সে কোন মসজিদ নির্মাণ করে গেছে। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছে, হাসপাতাল তৈরি করে দিয়েছে কিংবা পুকুর, কুয়া ইত্যাদি খনন করে দিয়েছে, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এরূপ কাজের ছওয়াব সে মৃত্যুর পরও পেতে থাকবে এবং

গ. নেক সন্তান। অর্থাৎ দ্বীনদার সন্তান, যে তার মৃত পিতার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম, হাদীছ নং ৭৪২৪)

নেক সন্তান রেখে গেলে পিতামাতা কবরে গিয়েও তার দ্বারা উপকৃত হয়। কেননা সে এখন যত ভালো কাজ করছে তা পিতামাতার দেওয়া সুশিক্ষার কারণেই করতে পারছে। তাই সমপরিমাণ ছওয়াব পিতামাতার আমলনামায়ও লেখা হচ্ছে। এ জাতীয় হাদীছ শিক্ষা দিলে আজ তার এই পরিণাম হত না, ফলে তার বেদ্বীনী কার্যক্রমের কারণে পিতামাতাকে কাঁদতে হত না। কিন্তু তাকে যেহেতু সে পথে চালানোই হয়নি, তাই তার অশুভ পরিণাম নিজ চোখে দেখতে হচ্ছে।

সন্তানদের সুশিক্ষার প্রতি নবীগণের সতর্ক দৃষ্টি

ভাই, নিজের ইসলাহ ও সংশোধন যেমন জরুরি, সন্তানকে দ্বীন শেখানো ও দ্বীনের ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করাও তেমনি জরুরি। তাদেরকে কেবল মৌখিক শিক্ষাদানই যথেষ্ট নয়; বরং হাতে কলমে শেখানো এবং তাকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বতোপ্রকারের চেষ্টা ও যত্ন নিতে হবে। এর জন্য মনের মধ্যে অস্থিরতা থাকতে হবে। ঠিক এই অস্থিরতার মত, যেমনটা দেখা দেয় জ্বলন্ত আগুনের দিকে শিশু সন্তানকে ধাবিত হতে দেখলে। তখন যেমন ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলা হয়, বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে রক্ষা করা হয় এবং তা না করা পর্যন্ত স্থিরতা আসে না, এ ক্ষেত্রেও সেই রকম বেদনা থাকা চাই। কুরআন মাজীদে এর জন্য রয়েছে জোর তাকিদ।

এ তাকিদে কুরআন মাজীদ ভরা। আম্বিয়া 'আলাইহিস-সালামের বৃত্তান্তেও এ বিষয়টা উঠে এসেছে। যেমন হযরত ইসমাঈল 'আলাইহিস-সালামের ঘটনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে—

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ

সে (অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল আলাইহিস-সালাম) নিজ পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাত আদায়ের হুকুম করত। (সূরা মারয়াম : ৫৫)

হযরত ইয়াকুব 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আছে, যখন তার ইন্তিকালের সময় উপস্থিত হল, ছেলেমেয়েদের সকলকে ডাকলেন।

قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ۖ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

বললেন, তোমরা আমার মৃত্যুর পর কার ইবাদত করবে? তারা বলল, আমরা ইবাদত করব আপনার ইলাহের, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের, যিনি একই ইলাহ এবং আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণকারী। (বাকারা : ১৩৩)

লোকে মৃত্যুকালে সন্তানদের ডেকে বলে, আমার মৃত্যুর পর তোমাদের কী হবে? কিভাবে কামাই রোজগার করবে? কিন্তু নবী খবর নিচ্ছেন তাদের ইবাদতের। ওসীয়ত করছেন দ্বীনদারীর। তাদের কোন চিন্তা থাকলে তা ছিল সন্তানদের আখিরাত সম্পর্কিত চিন্তা। সুতরাং আমাদেরও অবস্থা তাদের মত হওয়া দরকার। সন্তান ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কে তাদের অনুরূপ চিন্তাই আমাদের অন্তরে পয়দা করা দরকার।

কিয়ামতের দিন অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে

ব্যাপারটা কেবল পরিবার-পরিজনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং নিজের অধীনে যত লোক আছে যত লোকের উপর নিজ প্রভাব আছে। সকলেরই দ্বীনী পরিচর্যার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। এক ব্যক্তি কোন অফিসের কর্মকর্তা। তার অধীনে অনেক কর্মচারী আছে। তাদের উপর তার প্রভাব আছে। এ ক্ষেত্রে সেই কর্মকর্তার উপর এ দায়িত্বও বর্তায় যে, সে তাদের দ্বীন ও ঈমান গড়ার চেষ্টা করবে। কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, অধীনস্থদেরকে দ্বীনের পথে আনার চেষ্টা তুমি কতটুকু করেছিলে? এক শিক্ষকের অধীনে অনেক ছাত্র আছে। কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি ছাত্রদেরকে দ্বীনের পথে আনার জন্য কী চেষ্টা করেছিলে? যার অধীনে কৃষক-শ্রমিক কাজ করে, তাকেও জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি তাদেরকে দ্বীনের পথে আনার জন্য কী চেষ্টা করেছিলে?

হাদীছ শরীফে ইরশাদ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

তোমরা প্রত্যেকেই যিম্মাদার এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার যিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

(বুখারী, হাদীছ নং ৮৪৪ : মুসলিম, হাদীছ নং ৩৪০৮: তিরমিযী হাদীছ নং ১৬২৭: আবু দাউদ হাদীছ নং ২৫৩৯: মুসনাদে আহমাদ হাদীছ নং ৪৯২০)

সব গুনাহই মূলত আগুন

আমি শুরুতে যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি, এর ব্যাখ্যায় আমার মহান পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) বলতেন, এ আয়াতে যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে মুমিনগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজ পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর, এর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা মনে হচ্ছে, সামনে কোন আগুন জ্বলছে আর তা থেকে বাঁচার জন্য বলা হচ্ছে , অথচ সামনে তো কোন আগুন দেখা যাচ্ছে না। প্রশ্ন হয় তাহলে এরূপ বলার কারণ কী? এর উত্তর হল, চোখের সামনে যত গুনাহ হতে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে সেই গুনাহই আগুন, আপাতদৃষ্টিতে তাকে যতই মনোরম ও আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন। আপাতমধুর এসব দৃশ্য প্রকৃতপক্ষে আগুন। এই দুনিয়া যে নানা রকম গুনাহ দ্বারা ভরে আছে, তাতে মূলত সারাটা দুনিয়া জাহান্নামে পরিণত হয়ে আছে। কিন্তু গুনাহের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকার কারণে আমাদের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে। সে কারণেই গুনাহের অন্ধকার ও এর আগুন আমরা অনুভব করতে পারছি না। নয়ত আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে শুদ্ধচিত্তের

অধিকারী করেছেন, অনুভব-অনুভূতি ঠিক রেখেছেন এবং ঈমানী আলো দান করেছেন, তারা বাস্থবিকই এসব গুনাহকে আগুনরূপেই দেখে থাকে। এর অন্ধকার ঠিকই তাদের নজরে আসে।

এক লোকমা হারাম খাদ্যের কুফল

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং হযরত থানভী (রহ.) এর উসতায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানূতবী (রহ.) বলতেন, একবার জনৈক ব্যক্তির দাওয়াতে তার বাড়িতে খানা খেতে যাওয়া হয়। মাত্র একটি লোকমাই মুখে দেওয়া হয়েছিল, অমনি অনুভব হল খাদ্যে কোন সমস্যা আছে, সম্ভবত এর ব্যবস্থা হালাল উপার্জন দ্বারা করা হয়নি। খোঁজ নেওয়ার পর জানা গেল, বাস্তবিকই তা হালাল উপার্জনের ছিল না। হারাম উপার্জনের সেই লোকমা তার গলায় জ্ঞাতসারে নয়; বরং অজ্ঞাতসারেই চলে গিয়েছিল। হযরত মাওলানা (রহ.) বলেন, আমি সে জন্য তাওবা-ইসতিগফারও করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘ দু'মাস পর্যন্ত সেই লোকমার অন্ধকার অনুভূত হতে থাকে। দু'মাস পর্যন্ত বারবার আমার মনে গুনাহের প্রতি আগ্রহ দেখা দিতে থাকে যে, অমুক গুনাহ করে ফেলি তমুক গুনাহ করে ফেলি। আল্লাহ যাদের অন্তরকে আলোকিত ও পরিশুদ্ধ করেন, এভাবেই তাদের কাছে গুনাহের অন্ধকার অনুভূত হয়। আমরা যেহেতু গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই তা বুঝতে পারি না।

আমরা অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি

আমরা নগরে বৈদ্যতিক আলোয় অভ্যস্ত। সর্বক্ষণ বিজলী বাতি জ্বলছে। তার আলোয় চারদিক ফুটছে। কয়েক মিনিটের জন্যে বিদ্যুত চলে গেলে তবিয়তে চাপ বোধ হয়। কারণ, দৃষ্টি বিজলীর আলোয় অভ্যস্ত। এতে তার আরাম হয়। সেই আরাম টুটে গেলে খুব কষ্ট বোধ হয়। অন্ধকারও খুব খারাপ লাগে। কিন্তু এখনও এমন বহু গ্রাম আছে, যেখানকার মানুষ কখনও বিজলী বাতি চোখে দেখেনি সেখানে চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে থাকে। কিন্তু তাদের সে অন্ধকারে কোন কষ্ট হয় না। কারণ, তারা যেহেতু বিজলী বাতি চোখেই দেখেনি এবং তার আলোতেও অভ্যস্ত হয়নি, অন্ধকারের সাথেই তাদের বাস, তাই অন্ধকারে তাদের কোন কষ্ট হয় না। অন্ধকারে কষ্ট হয় নগরবাসীর, যারা বৈদ্যুতিক আলোয় অভ্যস্ত।

এটাই আমাদের দৃষ্টান্ত। আমরা সকাল-সন্ধা গুনাহ করে কাটাই। সেই অন্ধকারে আমরা অভ্যস্ত। তাই গুনাহের অন্ধকার আমাদের অনুভব হয় না।

তা আমাদের খারাপ লাগে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ঈমানের আলো দান করুন। তাক্ওয়ার নূর দান করুন। কলব সে আলোয় আলোকিত হলে আমরা বুঝতে পারব গুনাহের অন্ধকার কেমন, তা কত গভীর। আমার মহান পিতা বলেন, গুনাহ আসলে আগুন, সে কারণেই কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমদের সম্পদ গ্রাস করে, তারা নিজ উদরে কেবল আগুনই খায়। (নিসা : ১০)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, আগুন খাওয়ার কথাটি প্রতীকী অর্থে বলা হয়েছে, বোঝানো উদ্দেশ্যে তারা হারাম ও অবৈধ খাবারই খায় যার পরিণামে তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। এই অবৈধ খাদ্য জাহান্নামের আগুন রূপে তাদের সামনে প্রকাশ পাবে।

কিন্তু কারও কারও মতে প্রতীকী অর্থে নয়, বরং প্রকৃত অর্থেই একে আগুন বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যে হারাম লোকমা খায় বাস্তবিকই তা আগুন। কিন্তু অনুভূতি নষ্ট করে ফেলার কারণে তা অনুভব করা যায় না। সুতরাং আমাদের চারদিকে যত গুনাহ হচ্ছে তা সবই আগুন। তা জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গার। অনুভূতিহীনতার কারণে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না।

আল্লাহওয়ালাগণ গুনাহের রূপ দেখতে পান

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অর্ন্তদৃষ্টি দান করেন, গুনাহের স্বরূপ তাদের নজরে আসে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্পর্কে বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, কেউ যখন ওযু বা গোসল করত, তখন তার অঙ্গধোওয়া পানিতে ভাসমান গুনাহ দেখতে পেতেন। বুঝতে পারতেন, অমুক- অমুক গুনাহ ভেসে যাচ্ছে।

জনৈক বুযুর্গ সম্পর্কে আছে, তিনি যখন ঘর থেকে বের হতেন কোন কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে নিতেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি যখনই ঘর থেকে বের হন, কাপড়ে মুখ ঢেকে নেন, এর কারণ কী? তিনি উত্তর দিলেন, চেহারা না ঢেকে আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় না। কেননা, যখনই বাইরে যাই কোন মানুষ দেখতে পাই না। শুধু কুকুর, শূকর, হায়েনা গাধা ইত্যাদি আকৃতি নজরে আসে, মানুষের কোন আকৃতি তাদের মধ্যে দেখি না। এর কারণ, তারা যেসব গুনাহ করে তার শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী আমার চোখে এককেজন একেক পশুর আকৃতিতে প্রকাশ পায়।

মোটকথা, গুনাহের প্রকৃত রূপ আমরা দেখতে পাইনা বলে, আমরা গুনাহকে আনন্দ-স্ফূর্তির উপায় মনে করি। না হয় প্রকৃতপক্ষে তা ময়লা, নাপাকী, অন্ধকার ও আগুন।

ইহলোক গুনাহের আগুনে ভরা

আমার মহান পিতা (রহ.) বলতেন, এই যে দুনিয়া গুনাহের আগুনে ভরে আছে, এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় গ্যাস ভরা কক্ষ দ্বারা, সে গ্যাস মূলত আগুনই, কিন্তু দেখা যায় না। দিয়াশলাইয়ের কাঠি দ্বারা একটা খোঁচা দিলেই তার রূপ প্রকাশ পায়। মুহূর্তে স্যারাটা কক্ষ আগুনে জ্বলে ওঠে। অনুরূপ সারাটা সমাজে যে যে গুনাহ ও অসৎকর্ম বিস্তার করছে, প্রকৃতপক্ষে তা আগুন। কেবল শিঙ্গা ফুঁকার যা দেরি। শিঙ্গায় ফু দেওয়া মাত্র সারা জাহান আগুনে জ্বলে উঠবে। আমাদের অসৎকর্মসমূহ মূলত জাহান্নামেরই আগুন। এর থেকে নিজেকেও রক্ষা করুন, পরিবার-পরিজনকেও রক্ষা করুন।

প্রথমে নিজে নিয়মিত নামায পড়ুন

ইমাম নববী (রহ.) দ্বিতীয় আয়াত উদ্ধৃত করেছেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

'পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজে তাতে যত্নবান থাক'।

(তোয়াহা : ১৩২)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুটি হুকুম করেছেন। হুকুম দু'টির ক্রমবিন্যাস কৌতূহলোদ্দীপক। বাহ্যত মনে হয় বলার দরকার ছিল, নিজে নামাযে যত্নবান হও তারপর পরিবারবর্গকে নামায পড়তে হুকুম দাও। কিন্তু এর বিপরীত প্রথমে পরিবার পরিজন সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদেরকে নামাযের হুকুম দাও। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে তুমি নিজে নামায আদায়ে যত্নবান থাক।

এ বিন্যাস দ্বারা মূলত ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, নিজ সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গকে নামাযের হুকুম দেওয়া তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু এ হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা তাতে পুরোপুরি যত্নবান হবে। মুখে তো তাদেরকে নামায পড়তে বললে কিন্তু নিজেরা তা ঠিক-ঠিকভাবে আদায় করছ না বা তা আদায়ে গাফলতি করছ, মনে রাখবে এ অবস্থায় তোমাদের সে আদেশ কোন সুফল দেবে না; বরং আদেশ দেওয়াটাই বৃথা যাবে। সুতরাং পরিবার পরিজনকে নামায পড়তে আদেশ

দেওয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল, নিজে নামাযের প্রতি তাদের চেয়ে বেশি যত্নবান থাকা এবং নামায আদায়ের জন্য নিজেকে তাদের সামনে আদর্শরূপে পেশ করা।

শিশুদের সাথে মিথ্যা বলো না

হাদীছ শরীফে আছে। জনৈক মহিলা তার শিশুকে কোলে নেওয়ার জন্য ডাকছিল, কিন্তু শিশুটি আসতে ইতস্তত: করছিল। শেষে মা তাকে বলল, এসো, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব। তখন বাচ্চাটি দৌড়ে আসল। বিষয়টা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নজরে পড়ল। তিনি সেই মাকে বললেন তুমি যে তাকে কিছু দেওয়ার কথা বলছিলে, সত্যিই কি কিছু দেওয়ার নিয়ত ছিল? সে বলল, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার হাতে খেজুর ছিল, সেটাই দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। তিনি বললেন, তবে তো ঠিক আছে। কিন্তু যদি দেওয়ার নিয়ত না থাকত তবে এটা মিথ্যা কথা হত এবং এজন্য তোমার গুনাহ হত।

(আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩৩৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং (১৫১৪৭)

কেননা, সেক্ষেত্রে শিশুর সাথে মিথ্যা ওয়াদা করা হত। এতে শিশুরও জীবন ক্ষতি হয়ে যায়। কেননা, শৈশবেই তার অন্তরে এই ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হত যে, মিথ্যা বলা এবং ওয়াদা ভঙ্গ করা এমন মন্দ কিছু নয়। সুতরাং এ আয়াতেও ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, পরিবার-পরিজনকে যে আদেশ করবে, নিজে তা অবশ্যই পালন করবে এবং অন্যের তুলনায় নিজে তাতে বেশি যত্নবান থাকবে।

শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি

অতঃপর ইমাম নববী (রহ) হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَخْ كَخْ إِرْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রাযি.)-এর পুত্র হযরত হাসান (রাযি.) (তার শৈশবকালে) সদকার খেজুর থেকে একটা খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। তা দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কাখ্‌ কাখ্‌ (যখন বাচ্চা অখাদ্য কিছু মুখে দেয় এবং তাকে তা ফেলে দেওয়ার জন্য তার মধ্যে সেই জিনিসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা

উদ্দেশ্য হয়, তখন আরবীতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ করা যায়, থু-থু বা ছি-ছি) অর্থাৎ এটা মুখ থেকে ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা অর্থাৎ বনূ হাশিম সদকা খাই না?

(বুখারী, হাদীছ নং ১৩৯৬: মুসলিম, হাদীছ নং ১৭৭৮ : মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৬২৯: সুনানে দারিমী, হাদীছ নং ১৫৮৫)।

হযরত হাসান (রাযি.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্র। তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। মসজিদে নববীতে তিনি একবার খুতবা দিচ্ছিলেন। এসময় হযরত হাসান (রাযি.) মসজিদে ঢুকলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মিম্বার থেকে নেমে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে কোলে তুলে নিলেন। কখনও কখনও এমন হত যে, তিনি নামায পড়ছেন আর শিশু হাসান (রাযি.) তাঁর কাঁধে চড়ে বসেছেন। তারপর সিজদায় যাওয়ার সময় আস্তে নামিয়ে দিতেন। একবার তিনি তাঁকে কোলে নিয়ে বলে ওঠেন-

مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ এই সন্তানেরা মানুষকে কৃপণ ও ভীরু বানিয়ে দেয়।

কেননা, তাদের কারণেই মানুষ অনেক সময় আল্লাহর পথে খরচ করে না। কৃপণতা প্রদর্শন করে। কখনও কখনও বুযদিল হয়ে যায়, পিছুটান থাকার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় যেতে ভয় পায়।

(ইবন মাজাঃ হাদীছ নং ৩৬৫৬: আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৯০৪)

এই প্রিয়পাত্র শিশু হাসান (রাযি.) যখন অজ্ঞতাবশত সদকার একটা খেজুর মুখে দিলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রশয় দিলেন না। এখন থেকেই তাকে গড়ে তুলতে হবে। তাই সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ থেকে তা বের করালেন এবং বললেন, এটা আমাদের খাওয়ার জিনিস নয়।

শিশুদের প্রতি ভালোবাসার সীমা

এ হাদীছে ইঙ্গিত করছে যে, শিশুদের তারবিয়াত ছোট-ছোট জিনিস থেকেই শুরু করতে হয়। এর দ্বারাই তাদের মন-মানসিকতা গড়ে ওঠে। জীবনের প্রকৃত নির্মাণ এভাবেই হয়। এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। এ সুন্নত এখন বলতে গেলে উঠেই গেছে। চারদিকে আজব দৃশ্য। শিশুদের ভুল-ত্রুটি শোধরানোর রেওয়াজ খতম হয়ে গেছে। বাবা-মা এদিকে লক্ষই করে না। আগেও তো বাবা-মা শিশুদের ভালোবাসত। কিন্তু সে ভালোবাসায় তারা বুদ্ধি-বিবেচনারও প্রয়োগ করত। এখনকার ভালোবাসা বড় লাগামহীন। আদরের দুলাল যা কিছুই করুক। যত বড় ভুলই তাদের দ্বারা হোক বাবা-মা তা ধরছে না বা ধরার প্রয়োজন বোধ করছে না। তারা

মনে করে, যেহেতু অবুঝ শিশু তাই সাত খুন মাপ। তাদের ভুল-চুক ধরার ও শোধরানোর কোন প্রয়োজন নেই।

ভাই হে! চিন্তা বরং এভাবে করুন যে, শিশু অবুঝ হলেও আপনি তো অবুঝ নন। তার তারবিয়াত করা তাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা আপনার দায়িত্ব। শিশু আদবের খেলাফ কোন কাজ করলে, শিষ্টাচারবিরোধী আচরণ করলে কিংবা শরী'আতবিরোধী কিছুতে লিপ্ত হলে তাকে বোঝানো এবং সে ব্যাপারে সতর্ক করা পিতামাতার কর্তব্য। তা না করা হলে এবং এর ফলে সে যদি এক সময় অভদ্র ও অসভ্যরূপে বড় হয়, তবে তার খেসারত আপনাকেই দিতে হবে। দায়িত্ব পালনে আপনার অবহেলার কারণেই তো আজ তার এই পরিণাম। কেন আপনি শুরুতে তাকে সভ্যতা-ভব্যতায় অভ্যস্ত করে তুললেন না। যা হোক এ হাদীছটির শিক্ষা হল। শিশুদের ছোট ছোট ভুল-ত্রুটির উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই।

হযরত শায়খুল হাদীছ (রহ)- এর একটি ঘটনা

হযরত শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া (রহ.) আপবীতী (আত্মজীবনী)তে নিজের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি যখন ছোট, বাবা-মা আমার জন্য খুব সুন্দর একটা বালিশ বানিয়ে দিয়েছিলেন, যেমন সাধারণত শিশুদের জন্য তৈরি করা হয়ে থাকে। বালিশটি আমার বড় প্রিয় ছিল। সর্বক্ষণ সেটি আমার সঙ্গে থাকত। একদিন আমার আব্বা শুইতে চাচ্ছিলেন। বালিশ দরকার ছিল। আমি বললাম, আব্বা, আমার বালিশটি নিন। এই বলে আমি আমার বালিশটি তাকে এভাবে দিলাম, যেন আমার কলিজা বের করে তাকে দিচ্ছিলাম। কিন্তু যেই না আমি বালিশটি তাকে দিলাম অমনি তিনি আমাকে একটা চড় লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন, এখনই আমার-আমার বলতে শিখে গেছ? বোঝাতে চাচ্ছিলেন, বালিশটি তো মূলত বাবার দেওয়া। কাজেই সেটাকে নিজের বলে দাবি করা সঠিক নয়।

হযরত শায়খুল হাদীছ (রহ.) লেখেন, তখন তো আমার কাছে ব্যাপারটা খুব খারাপ লেগেছিল। আমি আমার কলিজাটা খুলে দিলাম আর তিনি কিনা তার বদলা দিলেন চড় দিয়ে! কিন্তু আজ বুঝে আসছে, আমার মহান পিতা তখন কত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। সেই চড় আমার মন-মানসিকতার গতিমুখই বদলে দিয়েছিল। বস্তুত এজাতীয় ছোট-ছোট জিনিসের প্রতিও পিতামাতাকে লক্ষ রাখতে হয় আর তা রাখতে পারলেই সন্তানের সত্যিকারের তারবিয়াত হয়। পরিশেষে এক পরিশীলিত মানুষ হয়ে সমাজ সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়।

খানা খাওয়ার একটি আদব

عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ رَبِيبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِيْ بَعْدُ

হযরত আবূ হাফস উমর ইবন আবূ সালামা, যার প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল-আসাদ (রাযি.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৎপুত্র (অর্থাৎ তার স্ত্রী উম্মুল-মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার প্রাক্তন স্বামীর ঔরসজাত সন্তান। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে বিবাহ করেন, তখন মায়ের সঙ্গে এই 'উমরও নবীগৃহে চলে আসেন। মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খুব স্নেহ করতেন)। তিনি বর্ণনা করেন, শৈশবে আমি যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিপালনাধীন ছিলাম, সে সময় একদিন আমি তাঁর সাথে খানা খাচ্ছিলাম। আমার হাত পাত্রে ঘোরাঘুরি করছিল অর্থাৎ কখনও এপাশ দিয়ে লোকমা তুলছিলাম, কখনও ওপাশ দিয়ে। এভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে পসন্দ মত খাবার বেছে বেছে নিচ্ছিলাম) তা দেখে তিনি বললেন, খোকা! খানা খাওয়ার সময় প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়বে। তারপর ডান হাত দিয়ে খাবে এবং পাত্রের যে অংশ তোমার সামনে, সেখান থেকেই খাবে (এখান-সেখান থেকে লোকমা ধরবে না) এভাবেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের তারবিয়াত করতেন। ছোট-ছোট বিষয়গুলোও বুঝিয়ে দিতেন। ভুল-চুক শুধরে দিতেন এবং সঠিক আদব শিখিয়ে দিতেন।

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৯৫৭ ; মুসলিম, হাদীছ নং ৩৭৬৭;
ইবন মাজাঃ হাদীছ ৩২৫৮)

ইসলামী জীবনের অমূল্য আদব

ইকরাশ ইবন যুওয়ায়ব (রাযি.) নামক অপর এক সাহাবী বর্ণনা করেন, একবার আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হই। সামনে যখন খাবার দেওয়া হল আমি এভাবে খেতে লাগলাম যে, একবার এখান থেকে লোকমা নেই, একবার ওখান থেকে। পাত্রের বিভিন্ন স্থানে আমার হাত চলাচল করতে থাকল। তা দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে ফেললেন। তারপর বললেন, ইকরাশ, এক জায়গা থেকে খাও, যেহেতু একই ধরনের খাদ্য। এখান-সেখান থেকে খাওয়াটা অভদ্রতা। দেখতে খারাপ লাগে। কাজেই একই স্থান থেকে খাও। হযরত ইকরাশ (রাযি.) বলেন, আমি এক জায়গা থেকে খাওয়া শুরু করলাম। খাওয়া শেষ হওয়ার পর একটি বড় থালা আনা হল। তাতে নানারকম খেজুর ছড়িয়ে রাখা ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু হুকুম করেছিলেন, একই জায়গা থেকে খাও, তাই আমি একই জায়গা থেকে দুটো করে খেজুর তুলে খাচ্ছিলাম, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বিভিন্ন স্থান থেকে খেজুর নিয়ে খেতে লাগলেন। আমাকে একই জায়গা থেকে খেতে দেখে বললেন, ইকরাশ! যেখান থেকে ইচ্ছা হয় খাও। কেননা, এ পাত্রে বিভিন্ন রকমের খেজুর আছে। এক দিক থেকেই খেলে একই রকম খেজুর খাওয়া হবে। অন্যরকম খেজুর খাওয়া হবে না কাজেই অন্য দিক থেকেও খাও।

(তিরমিযী, হাদীছ নং ১৭৭১: ইবন মাজাঃ হাদীছ নং ৩২৬৫)

শিশুকে দিয়ে সাত বছর বয়সে নামায পড়ানো

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের সন্তাদেরকে তাদের সাত বছর বয়সকালে নামাযের আদেশ দাও। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যায়, তখন নামাযের জন্য তাদেরকে মার। আর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।

(আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪১৭: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৬৪২০)

অর্থাৎ সাত বছর বয়সে যদিও শিশুর উপর নামায পড়া ফরয নয়, কিন্তু নামাযের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সাত বছর বয়স থেকেই নামাযের তাগিদ দাও। এভাবে দশ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে বুঝিয়ে সমঝিয়ে নামায পড়াতে থাক। দশ বছর বয়স হওয়ার পরও যদি নামায না পড়ে তবে শাসন কর, প্রয়োজনে এর জন্য মার। কেননা, এখনও নামায না পড়লে নামাযের অভ্যাস তার গড়ে উঠবে না এবং বালেগ হওয়ার পরও নামায পড়তে চাবে না। আর এসময়ে তার বিছানাও পৃথক করে দাও। দুজন শিশুকে এক বিছানায় ঘুমাতে দিও না।

সাত বছর বয়সের আগে শিক্ষাদান

এ হাদীছে প্রথমে হুকুম দেওয়া হয়েছে শিশুকে দিয়ে নামায পড়ানো সম্পর্কে। বলা হয়েছে, শিশুর বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাকে নামায পড়তে তাগিদ দাও। এর দ্বারা জানা গেল, সাত বছরের আগে তাকে কোন কাজে বাধ্য করা সমীচীন নয়। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলতেন, এ হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, শিশুর বয়স সাত বছর না হওয়া পর্যন্ত তার উপর কোন বোঝা চাপানো উচিত নয়। কোনও কোনও লোককে দেখা যায়, সাত বছরের আগেই শিশুকে দিয়ে রোযা রাখায়। হযরত থানভী (রহ.) এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা তো সাত বছরের আগে নামাযের হুকুম করতে বলেননি, অথচ তুমি সাত বছর না হতেই তাকে দিয়ে রোযা রাখাতে শুরু করেছ। এটা ঠিক নয়। এমনিভাবে সাত বছরের আগে তাকে নামাযের জন্য জোর দেওয়াও উচিত নয়। এজন্যই বলা হয়েছে, সাত বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে মসজিদে আনা সমীচীন নয়। হ্যাঁ মাঝে মধ্যে তাকে আনা যেতে পারে। যদি না সে মসজিদ নষ্ট করবে বলে আশংকা থাকে। এ আনার উদ্দেশ্য থাকবে ধীরে-ধীরে তার মনে নামাযের মহব্বত সৃষ্টি করা। কিন্তু সাত বছরের আগে তার উপর যথারীতি এই বোঝা চাপানো সঙ্গত নয়। আমাদের বুযুর্গগণ তো বলেন, সাত বছরের আগে তার উপর শিক্ষার বোঝাও ফেলা উচিত নয়। হ্যাঁ খেলাধুলার ভেতর দিয়ে যতটুকু শেখানো সম্ভব তা শেখাতে পার। কিন্তু লেখাপড়ার বোঝা কিছুতেই তার মাথায় এ বয়সে চাপানো এবং তাকে যথারীতি ছাত্র বানিয়ে ফেলা ঠিক নয়। এখন তো এই মহামারি দেখা দিয়েছে যে, বাচ্চার বয়স তিন বছর হলেই তার লেখাপড়া শুরু হয়ে যায়। এটা গলত পন্থা। সঠিক পথ হল, তিন বছর বয়সে তাকে ঘরে তা'লীম দাও। অর্থাৎ কালেমা শেখাও। দ্বীনের দু-চারটি কথা শেখাও এবং তাও ঘরে রেখে যতটুকু সম্ভব কর। কিন্তু তাকে যথারীতি ছাত্র বানিয়ে নার্সারিতে পাঠানো কোন ভালো কাজ নয়।

কারী ফাত্হ মুহাম্মাদ (রহ.)-এর ঘটনা

আমাদের বুযুর্গ হযরত মাওলানা কারী ফাত্হ মুহাম্মাদ (রহ.) – আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন – কুরআন মাজীদের এক জীবন্ত মু'জিযা ছিলেন। যারা তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন, তাদের এটা জানা। তিনি সারাটা জীবন কুরআন মাজীদের পঠন-পাঠনে ব্যয় করেছেন। হাদীছ শরীফে দু'আ আছে, হে আল্লাহ, কুরআন মাজীদকে আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত করে দিন, আমার রক্তকণায় মিশ্রিত করে দিন, আমার শরীরে

একীভূত করে দিন এবং আমার আত্মায় স্থাপিত করে দিন। অনুমিত হয়, এ দু'আ তার জন্য পুরোপুরি কবূল হয়ে গেছে। কুরআন মাজীদ যেন তার অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল।

কুরআন মাজীদের ব্যাপারে কারী ছাহেব (রহ.) খুব কঠোর ছিলেন। কোন শিশু তাঁর কাছে আসলে খুব যত্নের সাথে তাঁকে পড়াতেন। পড়ার জন্য খুব উৎসাহ ও তাগিদ দিতেন। সেই সঙ্গে বলতেন, শিশুর বয়স সাত বছর না হওয়া পর্যন্ত যথারীতি শিক্ষার ভার তার উপর চাপানো জায়েয নয়। কেননা, এতে তার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি-বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তিনি উপরিউক্ত হাদীছ দ্বারাই এর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতেন। যেহেতু এ হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদেরকে নামাযের হুকুম দান করার জন্য সাত বছর বয়সের শর্তারোপ করেছেন।

শিশুর বয়স সাত বছর হয়ে গেলে তার উপর পর্যায়ক্রমে শিক্ষার ভার অর্পণ করা চাই। পরিশেষে যখন বয়স দশ বছর হয়ে যাবে, তখন উৎসাহদান ও বোঝানোর সাথে শাসনেরও অবকাশ রয়েছে। বরং প্রয়োজনে তাকে মারাও যাবে। বলা হয়েছে, এখন নামায না পড়লে তাকে মার, শাস্তি দাও।

শিশুদেরকে শাস্তিদান করার সীমারেখা

পিতামাতা বা শিক্ষকের জন্য শিশুদেরকে কোন সীমা পর্যন্ত মারা ও শাস্তিদান করা জায়েয তাও জেনে রাখা দরকার। এমন মার জায়েয নয়, যাতে শিশুর শরীরে দাগ পড়ে যায়। অনেকেই এ দিকে লক্ষ রাখে না। শিশুদেরকে বেধড়ক মারপিট করে। বিভিন্ন মক্তব ও স্কুলে শিক্ষকদের সীমাহীন বেত চালানোর রেওয়াজ পড়ে গেছে। কখনও কখনও মেরে জখম করে ফেলে। রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। এটা কোনওক্রমেই জায়েয নয়। কঠিন গুনাহ। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলতেন, আমার বুঝে আসে না, এ গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার কী উপায় হতে পারে? কেননা, মাফ কার কাছে চাওয়া হবে? শিশুর কাছে চাইলে নাবালেগ হওয়ার কারণে সে তো মাফ করারও এখতিয়ার রাখে না। কেননা, নাবালেগ শিশু ক্ষমা করলে শরীআতে তার সে ক্ষমা ধর্তব্য নয়। এ কারণেই হযরত (রহ.) বলতেন, এ অপরাধ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কোন পথ বুঝে আসে না। এটা এমনই বিপজ্জনক গুনাহ। কাজেই শিক্ষক ও পিতামাতার সতর্ক হয়ে যাওয়া দরকার। তারা যেন শিশুদের এমন মারপিট না করে, যাতে তাদের শরীরে যখম হয়ে যায় বা দাগ পড়ে যায়। মারার অনুমতি কেবল নিতান্তই নিরুপায় অবস্থায়। কাজেই মারার সময় অবশ্যই মাত্রাজ্ঞান রক্ষা করা চাই।

শিশুদেরকে শাস্তিদান করার শরি'আতী নিয়ম

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী (রহ.) শাস্তিদান সম্পর্কে এক চমৎকার ব্যবস্থা দিয়েছেন। এরূপ ব্যবস্থা তাঁর মত ব্যক্তিই দিতে পারে। স্মরণ রাখার মত জিনিস। তিনি বলতেন, যখন ছেলেমেয়েকে মারার প্রয়োজন বোধ হয় কিংবা তাদের উপর রাগ করার দরকার মনে হয়, তখন রাগের সময়ে মারবে না; ববং পরে যখন রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন কৃত্রিম রাগের সাথে মারবে। কেননা, স্বভাবগত রাগের সময় মারলে বা রাগ ঝাড়লে সীমা রক্ষা করতে পারবে না। বরং তখন সীমালংঘন হয়ে যাবে। মারতে হয় যেহেতু প্রয়োজনবশত, তাই সে মার অবশ্যই সীমার মধ্যে হতে হবে। এর জন্য কৃত্রিম রাগ সহায়ক। কৃত্রিমভাবে রাগ করে মারলে প্রয়োজনও সমাধা হয়ে যাবে, আবার সীমালংঘনও হবে না।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আমি জীবনভর এ নিয়ম মেনে চলেছি। কখনও স্বভাবগত রাগের সময় কাউকে মারিনি বা ধমকাইনি। রাগ পড়ে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকেছি এবং অন্তরে কৃত্রিম রাগ জন্মিয়ে প্রয়োজনীয় শাস্তি আরোপ করেছি, যাতে কিছুতেই সীমালংঘন না হয়ে যায়। বস্তুত স্বভাবগত রাগ এমনই জিনিস, যা দেখা দিলে মানুষ সাধারণত সীমার মধ্যে থাকতে পারে না।

শিশুদের তারবিয়াত দানের পন্থা

হযরত থানভী (রহ.) একটা মূলনীতি বলতেন। মূলনীতিটি যদিও সাধারণভাবে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যেহেতু পরিবেশ পরিস্থিতি সবসময় এক রকম থাকে না। স্থান-কাল ভেদে তারতম্য হয়ে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অনুসরণযোগ্য। তিনি বলেন, কেউ যখন কোন অন্যায় কাজ করে, ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে শাস্তিদান সমীচীন নয়। বরং তা করতে গেলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে যায়। কাজেই তখনই কোন ব্যবস্থা না নিয়ে পরে তাকে বুঝিয়ে দাও, বা শাস্তিদানের প্রয়োজন মনে হলে শাস্তি দাও। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক কাজে বারবার টোকাও ঠিক নয়। বরং একবার বসিয়ে বোঝাও যে, তুমি অমুক সময়ে এই কাজ করেছ এবং অমুক সময়ে এই কাজ করেছ। এসব করা তোমার উচিত হয়নি। প্রয়োজনবোধে সবগুলো ভুলের উল্লেখপূর্বক শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে।

বস্তুত রাগ-গোস্সা মানুষের স্বাভবগত ব্যাপার এবং এটা যখন ওঠে তখন অনেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তখন কোন ব্যবস্থা নিতে গেলে তাতে

সীমা রক্ষা করা কঠিন হয়ে যায়। এজন্যই হযরত থানভী (রহ.) যে পন্থা বাতলিয়েছেন, তা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

যাহোক, কথা হচ্ছে প্রয়োজন দেখা দিলে মারাও জায়েয আছে। ইদানীংকালে এ বিষয়ে দুই রকম প্রান্তিকতা বিরাজ করছে। মারবে তো সীমা ছাড়িয়ে যাবে আর মারবে না তো বিলকুলই না, যেন শিশুদের মারা একদম হারাম। উভয়টাই ভুল, দুই ধারার বাড়াবাড়ি। মধ্যবর্তী নিয়মই উত্তম, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন।

তোমাদের প্রত্যেকেই যিম্মাদার

সবশেষে যে হাদীছ উল্লেখ করা হচ্ছে , পেছনে তা কয়েকবার গত হয়েছে। হযরত ইবন উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমাদের প্রত্যেকেই যিম্মাদার এবং প্রত্যেককে তার যিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইমাম অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান একজন যিম্মাদার, তাকে কিয়ামতের দিন তার যিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (যে, তুমি জনগণের সাথে কী রকম ব্যবহার করেছ। তাদের তত্ত্বাবধানকার্য কিভাবে কতটুকু আঞ্জাম দিয়েছে, তাদের অধিকার আদায়ে কতটুকু যত্নবান থেকেছে? পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের যিম্মাদার; কিয়ামতের দিন তাকে তার যিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে (যে, বিবি-বাচ্চাদের দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত ছিল। তাদের বৈষয়িক ও দ্বীনী তত্ত্বাবধান কতুটুকু করেছ? তাদের হকসমূহ কতটুকু আদায় করেছে?) স্ত্রী স্বামীগৃহের যিম্মাদার; তাকে কিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে (যে, তুমি নিজ দায়িত্ব কতুটুকু আদায় করেছ)

আর খাদেম তার মনিবের মালামালের যিম্মাদার; তাকেও কিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে (যে, তোমার উপর যে কর্মভার অর্পণ করা হয়েছিল, যেখানে যে টাকা-পয়সা খরচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা তোমার উপর আমানত ছিল, সে আমানত তুমি কতটুকু রক্ষা করেছ?)

মোটকথা, তোমাদের প্রত্যেকেই (কোনও না কোনও কাজের) যিম্মাদার এবং সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।

(বুখারী, হাদীছ নং ৮৪৪, মুসলিম, হাদীছ নং ৩৪০৮: তিরমিযি, হাদীছ নং ১৬২৭: আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২৫৩৯: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৪৯২০:)

নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে ভাবুন

সবশেষে এ হাদীছটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল একথা বোঝানো যে, দায়িত্বশীলতার বিষয়টি কেবল পিতা ও সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানব জীবনের প্রতিটি শাখায়ই প্রত্যেকের অধীনে কিছু না কিছু লোক থাকে, যেমন ঘরে গৃহকর্তার অধীনে তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি আছে, অফিসে কর্মকর্তার অধীনে কর্মচারীগণ থাকে, দোকানেও মালিকের অধীনে কর্মচারী থাকে, কারও ফ্যাক্টরি থাকে তার অধীনে শ্রমিক থাকে, তো এসকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অধীনে যারা অবস্থান করছে তাদের কাছে দ্বীন পৌছানো, তাদেরকে দ্বীন বোঝানো ও দ্বীনের দিকে তাদের নিয়ে আসার চেষ্টা করা তার দায়িত্ব। একথা ভাবার কোন কারণ নেই যে, আমার দায়িত্ব কেবল আমার নিজ সত্তা এবং পরিবার-পরিজনের মধ্যেই সীমিত। বরং যেখানেই যারা আপনার অধীনে আছে তাদের সকলের ব্যাপারেই আপনার দ্বীনী দায়িত্ব রয়েছে। আপনার অধীনে থাকার কারণে আপনি তাদেরকে দ্বীনের কথা বললে, অন্যদের তুলনায় আপনার কথার তাছির তাদের মধ্যে অনেক বেশি হবে। তারা আপনার কথা সহজে কবুল করবে।

কাজেই আপনার কর্তব্য তাদেরকে দ্বীনের কথা বলা তা না বললে আপনি দায়ী থেকে যাবেন। তারা দ্বীনের উপর না চললে তার দায় আপনার উপরও বর্তাবে, যেহেতু আপনি তাদেরকে দ্বীনের পথে আনার চেষ্টা করেননি। সুতরাং যেখানেই যার অধীনে কেউ না কেউ আছে, তার কর্তব্য তাদের মধ্যে দ্বীনী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

মাত্র দশটা মিনিট বরাদ্দ রাখুন

সন্দেহ নেই আজকাল মানুষের ব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেছে। সময় সীমিত হয়ে গেছে। কিন্তু এতটুকু তো সকলেরই পক্ষেই সম্ভব যে, প্রত্যহ চব্বিশ ঘন্টা থেকে মাত্র দশটা মিনিট আলাদা করে নেবে। এসময় তার কাজ হবে কেবল নিজ অধীনস্থদেরকে দ্বীন বোঝানো তাদেরকে দ্বীনের কথা শোনানো। কোন দ্বীনী বই পাঠ করে শোনানো যেতে পারে। কারও ওয়াজ শোনানো যেতে পারে কিংবা কোন হাদীছের তরজমাই শুনিয়ে দিন। এভাবে তাদের

কানে দ্বীনের কথা পড়তে থাকুক। এক সময় না এক সময় সুফল দেখা দেবেই ইনশাআল্লাহ। এতটুকু কাজ সকলেই করতে পারে। কেউ এতটুকু কাজ নিয়মিত করলেও ইনশাআল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত হাদীছের উপর আমলের সৌভাগ্য হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও এ অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ইসলাহী খুতুবাত; ১ম খণ্ড, ২২-৫০ পৃষ্ঠা

কন্যা সন্তানের লালন-পালন দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত আনাস ইবন মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تُدْرِكَا دَخَلْتُ اَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ مُحَمَّدٌ (ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ) بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَبَابَانِ يُعَجَّلَانِ فِي الدُّنْيَا الْبَغْيُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ

'যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে তাদের সাবালক না হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে সে আর আমি জান্নাতে প্রবেশ-করব এভাবে, এই বলে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আযীয তার শাহাদাত ও মধ্যমা এই দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন। তারপর বললেন, দুটি কাজ এমন, যার শাস্তি মানুষ দুনিয়াতেই নগদ পেয়ে যায় ক. জুলুম খ. আত্মীয়তা ছিন্ন করা।

(হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৬খ, ১৬৩ পৃ.: আল-আদাবুল-মুফরাদ, ১খ, ৩০৮, হাদীছ নং ৮৯৪; কানযুল-উম্মাল হাদীছ নং ৪৫৩৭২)

মহানবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। একটি মেয়েদের লালন-পালন করার ফযীলত সম্পর্কে। কি বিশাল ফযীলতের কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে লালন-পালন করবে সে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জান্নাতে প্রবেশ

করবে এবং তা এমন পাশাপাশি যে, দু'টি আঙুল যেভাবে পাশাপাশি থাকে, ঠিক সেই রকম।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জান্নাতে প্রবেশ অপেক্ষা বড় সৌভাগ্য একজন মানুষের পক্ষে আর কী হতে পারে?

এ হাদীছের প্রেক্ষাপট হল জাহিলী যুগে কন্যা সন্তানের প্রতি মানুষের নির্মমতা। সে কালের মানুষ মেয়েদেরকে বেজায় খারাপ মনে করত। কুরআন মাজীদে সে চিত্র আঁকা হয়েছে এভাবে-

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কাউকে সেই কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্মযাতনায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। (যুখরুফ : ১৭)

আরবের কোন কোন লোক তো কন্যা সন্তানকে এতটাই ঘৃণা করত যে, জন্মের পর তার অস্তিত্বই সহ্য করতে পারত না, শীঘ্র তাকে মাটির নিচে জ্যান্ত পুতে ফেলত। কুরআন মাজীদে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে আসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। (নাহল : ৫৮-৫৯)

মোটকথা, মেয়েদেরকে ঘরে রাখা ও প্রতিপালন করাকে সে যুগের আরবগণ খুবই দূষণীয় মনে করত। তাদের কাছে নারীর কোন মূল্য ছিল না। সেই সমাজেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন, তোমাদের এসব চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। মানুষের এসব নিন্দা-কুৎসাকে উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি মেয়েদের লালন পালন করবে সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে এবং সে আমার পাশাপাশি থাকবে, যেমন দু'টি আংগুল পাশাপাশি থাকে। এই তো ছিল হাদীছটির পটভূমি। কিন্তু সেই জাহিলিয়াতের ছাপ কিছু না কিছু এই আধুনিক কালের মানুষের মধ্যেও

পাওয়া যায়। এখনও কিছু লোক এমন আছে, যারা পুত্রসন্তান হয়েছে খবর পেলে খুব খুশি হয়। কিন্তু যখন বলা হয়, তোমার একটি মেয়ে হয়েছে, অমনি মুখ কালো করে ফেলে এবং মুখে কিছু না কিছু বলে দেয়। না বললেও মনে মনে আক্ষেপ করে মেয়ে কেন জন্মাল, ছেলে হলে কতই না ভালো হত। অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত বড় সুসংবাদ কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করার ব্যাপারে আমাদের শুনিয়েছেন।

বস্তুত কন্যা সন্তান আল্লাহ তা'আলার এক মহা নি'আমত। কারও মেয়ে জন্মালে সেটা তার পক্ষে কতই না সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত সুসংবাদ এখন তার জন্যও প্রযোজ্য। কাজেই মেয়ের জন্মসংবাদে মন খারাপ করা কিছুতেই উচিত নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায় করা দরকার যে, তিনি মেহেরবানী করে ওই মহা সুসংবাদের আওতাভুক্ত করে দিয়েছেন। আমাদের সমাজে এখনও এমন লোক আছে, যারা কন্যা সন্তানকে খুশীর সাথে গ্রহণ করে না। বিশেষত যার পুত্র সন্তান নেই। কেবল মেয়েই আছে। সে যখন পুনরায় মেয়ে সন্তানের জন্মসংবাদ পায়, তার মনোকষ্টের সীমা থাকে না। সে নিজেকে খুব দুর্ভাগ্যবান মনে করে। আর আক্ষেপ করে, আহা আবারও মেয়েই জন্মাল। এসবই জাহিলী চিন্তা-ভাবনা।

সব কিছুর ফয়সালা আল্লাহ তা'আলাই করেন। তিনি জানেন কার পক্ষে কী ভালো, কার কিসে কল্যাণ। তিনি হয়ত জানেন ছেলে জন্মালে সে তোমার অবাধ্য হত এবং তোমাকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সেই কুপুত্র ভালো হত, না এই মেয়ে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মহা সৌভাগ্য দান করতে পারেন?

কাজেই তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা চাই। আল্লাহ তা'আলা আমার ভাগ্যে যা রেখেছেন আমার কল্যাণ তাতেই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন ক্ষমতা মানুষের নেই। আল্লাহ তা'আলা আলেমুল-গায়ব ওয়াশ-শাহাদাহ-দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা। যা কিছু ঘটেছে ও যা-কিছু ঘটবে সব কিছুর খবর রাখেন। বান্দার জন্য কিসে মঙ্গল তিনিই তা ভালো জানেন। তাই সর্বদা তার ফয়সালায় খুশি থাকা উচিত। আমি হয়ত একটা জিনিস কামনা করছি এবং ভাবছি তাতেই আমার কল্যাণ, কিন্তু আসলে তা আমার পক্ষে কতটুকু কল্যাণকর এবং কতটুকু ক্ষতিকর তা জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই আল্লাহর উপরই সব ন্যস্ত করা উচিত। অহেতুক অন্যের দিকে না তাকিয়ে আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তাতেই আমার কল্যাণ এই বিশ্বাস রাখা উচিত।

ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

আল্লাহ তোমাদের কতকের উপর কতককে যা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার আকাঙ্ক্ষা করো না। (নিসা : ৩২)

কেননা, এটা আল্লাহ তাআলার বন্টন।

তিনি ইরশাদ করেন।

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ

তারা কি তোমার মালিকের রহমত বন্টন করছে, আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি। (যুখরুফ : ৩২)

সুতরাং এসব বিষয়ে দুঃখ বোধ করা এক ধরনের জাহিলিয়াত। চিন্তা করতে হবে ইতিবাচকভাবে। ভাবতে হবে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার কত বড় মেহেরবানী, তিনি কন্যাসন্তান দিয়ে আমাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত জানা গেল, কন্যাসন্তান জন্ম নিলে তাকে লালন-পালন তো করতেই হয়। বাবা মুসলিম হোক বা কাফের, নেককার হোক বা ফাসেক তাকে লালন-পালন না করে তার উপায় নেই। কিন্তু ঈমানদার পিতা লালন-পালনকালে এ হাদীছকে যদি সামনে রাখে, তবে তার লালন-পালন করতে গিয়ে সে যা কিছু করবে সবই ইবাদতরূপে গণ্য হবে। এভাবে যত দিন তাকে লালন-পালন করতে থাকবে তার কামাই-রোজগার ইবাদতে পরিণত হবে, তাকে যা খাওয়াবে তা ইবাদত সাব্যস্ত হবে। তার জন্য পোশাক কিনলে তাও ইবাদতের মর্যাদা পাবে। তাকে যে কোনওভাবে খুশি করলে তা সবই ইবাদত হয়ে যাবে এবং তাকে লালন-পালন করতে গিয়ে যত সময় ব্যয় করবে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে তা ইবাদতেই ব্যয় হবে। কেবল এই নিয়ত থাকাই শর্ত যে, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছকে অনুসরণ করার লক্ষ্যেই এসব করছি।

এ নিয়ত হল পরশ পাথর। এটা মাটিকে সোনায় পরিণত করে. দায়িত্বপালন তো করতেই হবে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার নিয়তে করলে সারাটা জীবনের যাবতীয় কাজেই ছওয়াব লেখা হতে থাকবে।

এ ফযীলতের এক কারণ তো ছিল কন্যা সন্তানের প্রতি জাহিলী যুগের অন্যায় আচরণ ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয় কারণ এটাও হতে পারে (আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন) যে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদেরকে লালন-পালন করার বিষয়টা একটু নাজুক হয়ে থাকে। কেননা, ছেলে একটু বড় হয়ে যাওয়ার পর নিজেই নিজের দায়িত্বশীল হয়ে যায়, নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে যায়; কিন্তু মেয়েদের বিষয়টা সে রকম নয়। আল্লাহ তা'আলা স্থায়ীভাবেই তাদের দায়িত্ব পুরুষদের উপর রেখেছেন। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় ব্যয়ভার পিতার উপর। পিতা না থাকলে ভাইয়ের উপর। বিবাহের পর তার সব দায়িত্ব স্বামীকে নিতে হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ার সব ধান্দা থেকে মুক্ত রেখেছেন, যাতে সে বাইরে বের হয়ে, নষ্ট না হয়ে যায় এবং অন্যদের নষ্ট হওয়ার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যই তার সব দায়-দায়িত্ব পুরুষদের কাঁধে ফেলা হয়েছে। পিতা ভাই ও স্বামীর কাঁধে। তাই তার লালন-পালনে পিতার খরচও হয় বেশি। তার তত্ত্বাবধান করতে হয় বাড়তি সতর্কতার সাথে। তার বাইরে বের হওয়ার সময়ও অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সেই সংগে তার তা'লীম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষায়ও বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন থাকে। শিক্ষা-দীক্ষাকালে তার হেফাজতের বিষয়টা বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হয় এবং ছেলে অপেক্ষা একটু বেশিই রাখতে হয়। আর তা তুলনামুলক কঠিন ও কষ্টসাধ্যও। এ কারণেই তার লালন-পালনে ফযীলতও বেশি।

কাজেই আল্লাহ তা'আলা যাকে কন্যাসন্তানের নিআমত দান করেছেন, তার খুশি হওয়ার দরকার। আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায় করা দরকার। এটা মহামূল্যবান নিআমত। এর মূল্য বুঝে লালন-পালন করতে পারাটা অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুসরণ করার লক্ষে, প্রতিপালন করলে একজন মুমিনের জন্য কন্যাসন্তানতুল্য নি'আমত আর কি হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই চেতনা দান করুন।

এ হাদীছের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, দুটি গুনাহ এমন, আল্লাহ তা'আলা যার শাস্তি দুনিয়াতেই নগদ দিয়ে দেন।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের বহু গুনাহের শাস্তি আখিরাতের জন্য মুলতবি রেখেছেন। কিয়ামতে যখন হিসাব-নিকাশ হবে এবং জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখনই সেসব গুনাহের শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু এ দুটি গুনাহ ব্যতিক্রম। এর জন্য আখিরাতে যে শাস্তি হওয়ার তা তো হবেই। তার আগে ইহজগতেও কখনও না কখনও তার জন্য শাস্তিদান করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন।

এস্থলে কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। কিন্তু আবু দাউদ শরীফ ও হাদীছের অন্যান্য কিতাবে বিষয়টা খুলেই বলা হয়েছে। তাতে স্পষ্টই আছে যে, আখিরাতের স্থিরীকৃত শাস্তি তো রয়েছেই, সেসঙ্গে দুনিয়ায়ও এদুটি গুনাহের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়।

একটি গুনাহ হল بَغْيٌ জুলুম। যে-কোনও লোকের উপর জুলুম করলে আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের সাথে দুনিয়ায়ও তাকে শাস্তি দান করেন। কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ঢিল দেওয়া হয়, তাই মানুষ বুঝতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ ۝

আমি তাদের ক্রমান্বয়ে এমনভাবে ধরব যে, তারা জানতেও পারবে না। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি। আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

(কলাম : ৪৪-৪৫)

অর্থাৎ আমি কখনও ঢিল দেই, অবকাশ দেই। আমরা কখনও জালেমকে দেখি খুব সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাচ্ছে। সেটা মূলত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দেওয়া ঢিল ও অবকাশ। পরিশেষে দুনিয়াতেই তাকে একবার পাকড়াও করা হয়। কঠিনভাবে ধরা হয়। সে ধরার ব্যাপারটা মানুষ সব সময়ই যে বোঝে তা নয়। কখনও বুঝতে পারে, কখনও পারে না। কিন্তু ধরা অবশ্যই হয়। আর আল্লাহর ধরা বড়ই কঠিন। কোন জালেমকে বাড়-বাড়ন্ত দেখলে মনে করো না সে মহাসুখে আছে; বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে ঢিল দিয়ে রেখেছেন, তিনি ক্রমে রশি ছাড়ছেন। কিন্তু পরিশেষে যখন রশিতে টান দেবেন, পাকড়াও যখন করবেন, তখন খবর হয়ে যাবে। আগে-পিছের সব ভুলে যাবে।

ইরশাদ হয়েছে,

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝٢١

গুরুশাস্তির আগে আমি তাদেরকে অবশ্যই লঘুশাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে। (সাজদা :২১)

সুতরাং জুলুম অত্যন্ত কঠিন গুনাহ। আল্লাহ তা'আলার কাছে এর থেকে পানাহ চেয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে, যাতে আমার দ্বারা কারও প্রতি কোনও রকমের জুলুম না হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর থেকে হেফাজত করুন।

আর দ্বিতীয় গুনাহটি হল আত্মীয়তা ছিন্ন করা অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের হক নষ্ট করা, তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়-স্বজনের বিভিন্ন হক ধার্য করেছেন।

যেমন ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন ইনসাফ ও ইহসানের এবং আত্মীয়দেরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দেওয়ার। (নাহল : ৯০)

কেউ যদি কোন আত্মীয়ের অধিকার পদদলিত করে এবং যেভাবেই হোক না কেন তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে, তবে শরী'আতের দৃষ্টিতে সে এক মহাপাপী। শরীআত-যেমন পিতামাতার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তেমনি ভাই-বোন, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন সকলেরই বিভিন্ন-হক আমাদের উপর আরোপ করেছে। কেউ যদি সে সব হক আদায় না করে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, অর্থাৎ তাদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়, সালাম না দেয়, কথাবার্তা না বলে এবং তা শরীআত-নির্দেশিত কোনও কারণে না হয়, বরং সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয পন্থায় হয়, তবে এর জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা তো আছেই, সেই সঙ্গে ইহজগতেও তাকে সেজন্য কোনও না কোনও ভাবে শাস্তিদান করা হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছে বিশেষভাবে এ দুটি গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন, যেহেতু এর কারণে আখিরাত তো বরবাদ হয়ই সেই সংগে দুনিয়াতেও কোনও না কোনওভাবে খেসারত দিতে হয়। কাজেই এর থেকে বেঁচে থাকা অতীব জরুরি। সর্তক থাকতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, যাতে আমার দ্বারা কারও প্রতি কোনও জুলুম না হয় এবং

কোনও আত্মীয়ের কোনও রকম হক নষ্ট না হয়। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলিমকে এ দুই গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

গ্রন্থনা : মুহাম্মাদ জুনাইদ সারওয়ার
স্থান : জামিয়া আশরাফিয়া, লাহোর, পাকিস্তান
তারিখ : ২রা মার্চ ২০০৯ ঈসায়ী

ছোটর প্রতি বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে ক্ষমালাভের উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

হযরত থানভী (রহ.) তাঁর এক বক্তব্যে বলেন, অনেক সময় ধারণা হয়, আমরা (আমাদের ছোটদের কাছে) যদি সরাসরি বাক্যে ক্ষমা চাই, তাতে তারা বেআদব হয়ে যাবে এবং আরও বেশি অবাধ্যতা করবে। কখনও মনে হয়, ক্ষমা চাইলে সে লজ্জা পাবে। কিন্তু এই উযর তখনই চলবে, যখন তার সাথে সম্পর্ক রাখার ইচ্ছা থাকবে। আর এ অবস্থায় তাকে কেবল খুশি করে দিলেই আশা করা যায় ক্ষমার বিকল্প হয়ে যাবে। কখনও কখনও তার সাথে সম্পর্ক রাখারই ইচ্ছা থাকে না, যেমন কোন কর্মচারীকে ছাটাই করা হল বা সে নিজেই কাজ ছেড়ে দিল। এ ক্ষেত্রে তার সাথে কোন বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে স্পষ্ট ভাষায়ই তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরি। কেননা, এস্থলে ওই উযর দুটি পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও কেউ ক্ষমা চাইতে দ্বিধা বোধ করলে আমার দৃষ্টিতে এর কারণ কেবলই অহংকার। নিজেকে বড় মনে না করলেও অহংকারের চাহিদা মোতাবেক কাজ তো হল। এ ক্ষেত্রে বড় জোর এই বলা যাবে যে, এটা বিশ্বাসগত অহংকার নয়, কিন্তু কর্মগত অহংকার অবশ্যই। আর কেউ যদি অহংকারের এ শ্রেণীভেদ স্বীকার নাও করে তবুও এটা তো সত্য যে, তার উপর জুলুম করা হয়েছে। আর তা হয়ে থাকলে ক্ষমা চাওয়া অবশ্যকর্তব্য। তা সত্ত্বেও ক্ষমা না চাইলে অহংকারের গুনাহ হবে না বটে, কিন্তু জুলুমের গুনাহ অবশ্যই হবে। (আনফাসে 'ঈসা, পৃ. ১৫৮)

এরূপ ম্যামলার সম্মুখীন অধিকাংশেরই হতে হয়। উদাহরণত কেউ যদি কোন অফিসের কর্মকর্তা হয় আর তার অধীনে বিভিন্ন লোক কর্মরত থাকে, তবে এ জাতীয় ব্যাপার সেখানে ঘটে যায়। অনেক সময়ই তাদের প্রতি তার আচার-আচরণে সীমালংঘন হয়ে যায়। অনুরূপ বাবার দ্বারা সন্তানের প্রতি, শিক্ষক দ্বারা ছাত্রের প্রতি এবং শায়খ দ্বারা মুরিদের প্রতি মাঝে-মধ্যে এরকম

ব্যবহার হয়ে থাকে। হয়ত ছেলে, ছাত্র বা মুরীদকে তার কোন ভুলের জন্য সতর্ক করা হয় কিন্তু সতর্ক করার মাত্রা যে পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল, তাকে যতটুকু ধমকানো দরকার ছিল বা শাস্তিদানের প্রয়োজন হলে যতটুকু শাস্তি দিলে চলত, তার চেয়ে বেশি হয়ে যায় অথবা শাস্তিদানের দরকার ছিল না কেবল সতর্ক করলেই যথেষ্ট ছিল, তা সত্ত্বেও শাস্তি দেওয়া হয়ে যায়। এসবই সীমালংঘন ও জুলুম। আর এরূপ ঘটনা হর হামেশাই ঘটে।

এ ব্যাপারে সোজাসুজি কথা এটাই যে, যার সাথে এরূপ বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, সরাসরি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত যে, আমার দ্বারা এই ভুল হয়ে গেছে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু অনেক সময় মনে হয়, এভাবে তার কাছে সরাসরি ক্ষমা চাইলে সে উদ্ধত হয়ে ওঠবে।

পরিণামে আরও বেশি অন্যায়-অপরাধ করবে এবং বেয়াদবীর মাত্রা বেড়ে যাবে। এমনকি ভুল পথে চলা শুরু করে দেবে।

দেখুন, সব লোক এক রকম নয়। একের সাথে অন্যের স্বভাব চরিত্রে পার্থক্য থাকে। কোন লোক এমনও থাকে, যার সাথে তার বড় কেউ নরম হয়ে কথা বললে বা একটু অনুশোচনা প্রকাশ করলে সে গলে পানি হয়ে যায়। এর সুফল এমনই হয় যে, এরপর সে সম্পূর্ণরূপে বদলে যায় এবং স্থায়ীভাবে নিজেকে সংশোধন করে ফেলে। আবার কেউ এর বিপরীতও আছে। তার সাথে মুরুব্বীস্থানীয় কেউ ঝুঁকে কথা বললে সে আরও বেশি উদ্ধত হয়ে ওঠে। ফলে আরও বেশি বেআদবী শুরু করে দেয়। বিখ্যাত আরব কবি মুতানাব্বী মাঝে মধ্যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলে থাকেন–

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ

وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيْمَ تَمَرَّدَا

'তুমি কোন ভদ্র লোককে সম্মান করলে সে তোমার গোলাম হয়ে যাবে, এবং তুমি তার মালিক হয়ে যাবে পক্ষান্তরে তুমি কোন ইতরজনকে যদি সম্মান কর, সে উদ্ধত হয়ে যাবে। পরে বলেছেন–

وَضْعُ النَّدَى فِيْ مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعُلَى

مُضِرٌّ كَوَضْعِ السَّيْفِ فِيْ مَوْضِعِ النَّدَى

যেখানে তরবারি ব্যবহার সমীচীন, সেখানে উদার আচরণ করলে তা ঠিক সেরকমই ক্ষতিকর হয়, যেমন ক্ষতি হয় উদারতার স্থানে তরবারির ব্যবহারে।

মোটকথা, মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে। কারও প্রতি নম্র আচরণ করলে সে এমনই বিগলিত হবে যে, পরবর্তীতে আর কখনও অবাধ্যাচরণের চিন্তাও করবে না। আবার কেউ কেউ হয় দুর্বিনীত, যে নম্র আচরণের উপযুক্ত নয়। তা করতে গেলে আরও বেশি স্পর্ধিত হয়ে যাবে।

এ কারণেই কখনও কখনও মনে হয় ছোটর কাছে ক্ষমা চাইলে সে আদব-তমিয হারিয়ে ফেলতে পারে, তার মন-মাস্তিকে শয়তান চেপে বসতে পারে আর তখন সে আরও বেশি অবাধ্যতা শুরু করে দেবে। এ ক্ষেত্রে কী করণীয়?

আগে দুটি বিষয়ের যে কোনও একটির সিদ্ধান্ত নিন

এরূপ ক্ষেত্র সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.) বলেন, প্রথমে দু'টি বিষয়ের যে কোনও একটির ফয়সালা নিয়ে নিন। যেই ছোটর সাথে ঘটনা ঘটেছে ভবিষ্যতে তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন, না রাখবেন না? যেমন আপনার কোন কর্মচারী বা চাকরের সাথে আপনার দ্বারা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এবার আপনি সিদ্ধান্ত নিন তাকে আপনার কাজে আর রাখবেন, না কি রাখবেন না?

যদি রাখাই সিদ্ধান্ত হয়, তবে এ অবস্থায় পরিষ্কার তার কাছে ক্ষমা না চেয়ে বরং অন্য কোনভাবে তার মনোরঞ্জন করুন। তাকে কোন উপহার দিন, বা হাসি-খুশির কথা বলে তাকে সন্তুষ্ট করে ফেলুন বা এমন কিছু করুন, যাতে সে উপলব্ধি করে যে, তার সাথে ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে। এরূপ ভালো ব্যবহার দ্বারা পূর্বে কৃত বাড়াবাড়ির প্রতিকার করে নিতে পারেন। পক্ষান্তরে তাকে যদি ভবিষ্যতে আর কাজে রাখার ইচ্ছা না থাকে বরং তাকে ছাড়িয়ে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত হয়, তবে এ অবস্থায় তার উদ্ধত ও বেআদব হয়ে যাওয়ার আশংকা অর্থহীন। কাজেই স্পষ্ট ভাষাতেই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া কর্তব্য। বিদায়কালে তাকে পরিষ্কার বলুন, তোমার সাথে আমার যেসব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, তুমি তা ক্ষমা করে দাও। বিশেষভাবে যে দুর্ব্যবহার তার সাথে করা হয়েছে তাও উল্লেখ করুন যে, অমুক দিন আমার দ্বারা এই ভুল হয়ে গিয়েছিল, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

অহংকারের চিকিৎসা

অমুক দিন তোমার প্রতি আমি এই খারাপ ব্যবহার করেছিলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, নিজ কর্মচারীকে এ কথা বলতে পারলে এক দিকে মুখে এ বাক্য উচ্চারিত হবে, অন্য দিকে অহংকারী অন্তরের উপর করাত চলতে থাকবে। এটা অহংকারের এলাজ। চাকরকে বিদায়কালে এরূপ কথা

বলতে পারলে অহংকার রোগের চিকিৎসা হয়ে যায়। স্পষ্ট ভাষায় কথাটি বলতে হবে, ইশারা-ইঙ্গিতে নয়। এর বড় উপকারিতা হল, স্পষ্ট ভাষায় যখন তার কাছ থেকে এভাবে ক্ষমা করিয়ে নেওয়া হবে, তখন ইনশাআল্লাহ আখেরাতে এ ব্যাপারে আর জবাবদিহি করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা এই বলে পাকড়াও করবেন না যে, তুমি নিজ অধীনস্থের সাথে এরূপ অন্যায় আচরণ কেন করলে, কেন তাকে নাহক ধমকালে বা শাস্তি দিলে? আর দ্বিতীয় উপকারিতা হল অহংকারের চিকিৎসা হয়ে যাওয়া।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ক্ষমা চেয়ে নেওয়া

মহাবিশ্বে এমন কে আছে, যে আল্লাহ তা'আলার কাছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমান মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে? দুনিয়া ও আখেরাতে এমন কোন আসন ও পদমর্যাদা নেই, যা দুজাহানের বাদশাহ সাইয়্যেদুল-আম্বিয়া ওয়াল-মুরসালীন নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদমর্যাদার ধারে-কাছে পৌছতে পারে। অথচ তা সত্ত্বেও তিনি প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছেন, আচার আচরণকালে কারও প্রতি যদি আমার দ্বারা কোনও রকম বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়ে থাকে, কারো জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর ক্ষতি যদি আমি করে থাকি, তবে আজ আমি সকলের সামনে উপস্থিত আছি, চাইলে সে আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিক অথবা আমাকে ক্ষমা করে দিক।

এক সাহাবী কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণ

জনৈক সাহাবী একথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার থেকে আমি বদলা নিতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসের বদলা? সাহাবী বললেন, একদিন আপনি আমার কোমরে আঘাত করেছিলেন, তার বদলা নেব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার তো মনে পড়ছে না যে, কাউকে কোনও দিন মেরেছি। তবু তোমার যদি স্মরণ থাকে, আমি তোমাকে মেরেছিলাম, তবে বদলা নিয়ে নাও। সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যখন মেরেছিলেন, তখন আমার কোমরে কোন কাপড় ছিল না। আমার কোমর খোলা ছিল। সমান বদলা তো তখনই হতে পারে যখন আপনার কোমরেও কোন কাপড় থাকবে না। এখন তো আপনার কোমর চাদরে ঢাকা রয়েছে। দোজাহানের বাদশা নিজ কোমর থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। বললেন, এবার বদলা নাও। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র পৃষ্ঠদেশ থেকে কাপড় সরাতেই নবুওয়াতী মোহর ঝলমল করে উঠল। সাহাবী সেখানে হামলে পড়লেন এবং সেই মোহরে চুমো খেতে খেতে বললেন, এই তো আমার বদলা। এ-ই তো আমি চেয়েছিলাম। নবুওয়াতী মোহরে চুমো খাওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিশোধ নেওয়া-টেওয়া কিছু নয়।

ভাবুন একবার, দোজাহানের নেতা মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি প্রকাশ্য জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, আমি কারও প্রতি কোন বাড়াবাড়ি করে থাকলে সে বদলা নিয়ে নিক বা আমাকে ক্ষমা করুক, তবে তুমি আমি কোন হিসাবের ও কোন কাতারের লোক যে ক্ষমা চাইতে পারব না?

ভুল যদি হয়ে থাকে তবে ক্ষমা কেন চাওয়া যাবে না। 'আমাকে ক্ষমা করে দাও' বলতে কোন মানুষ কেন লজ্জাবোধ করবে? এ কারণেই হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, যখন কর্মচারী বা চাকরের সাথে সম্পর্ক রাখার ইচ্ছা থাকবে না, তখন পরিষ্কার ভাষায় তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন, এ ক্ষমা চাওয়ায় কোনরূপ লজ্জা শরম যেন বাধা না হয়।

ক্ষমার দরজা বন্ধ হওয়ার আগে ক্ষমা চেয়ে নিন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন, যার উপর অন্য কারও জান বা মালের কোন হক রয়ে গেছে, ক্ষমার দরজা যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন আসার আগেই যেন সেই হকদারের নিকট থেকে সে তা ক্ষমা করিয়ে নেয়।

আজ তো খোশামোদ করে বা কোন বিনিময় দিয়ে তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু এমন একদিন আসবে, যেদিন কোন টাকা-পয়সা দিয়ে তার কাছ থেকে ক্ষমা করাতে পারবে না। আখেরাতে তো সেখানকার মুদ্রাই কাজে আসবে আর সেখানকার মুদ্রা হল পুণ্য। সেদিন হকসমূহ মাফ করাতে হলে হয় তাকে নিজের পুণ্য দিয়ে দিতে হবে, নয়ত তার পাপরাশি নিজ কাঁধে নিয়ে নিতে হবে। তার হক আদায় করার বা অনাদায়ের দুর্ভোগ থেকে বাঁচার এ ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। সুতরাং সেইদিন আসার আগেই ক্ষমা করিয়ে নিন।

হযরত থানভী (রহ.)-কর্তৃক ক্ষমাপ্রার্থনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ক্ষমাপ্রার্থনার অনুসরণার্থে

ইন্তিকালের কয়েকদিন আগে একটি পুস্তিকা লেখেন। তার নাম দেন আল-উয্‌র ওয়ান-নুযর। তাতে লিখেছিলেন, জীবনভর যত লোকের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল, না জানি আমার দ্বারা কার কত হক নষ্ট হয়েছে। আজ আমি সেসব হক আদায়ের জন্য প্রস্তুত। কারও কোন অর্থ সংক্রান্ত হক আমার উপর থাকলে, যা আদায় করতে আমি ভুলে গেছি, সে যেন আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজ হক উসূল করে নেয়। আর কারও জানের হক থাকলে সে ইচ্ছা করলে আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিতে পারে এবং চাইলে ক্ষমা করতে পারে। আমি সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি পুস্তিকাখানি পত্রাকারে নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রেরণ করেন। তাদের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার।

হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) কর্তৃক ক্ষমাপ্রার্থনা

আমার মহান পিতা (রহ.)-ও ইন্তিকালের প্রায় দু'বছর আগে আমাকে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনামূলক একখানি পত্র লেখান। তারপর 'তালাফী মা ফাত' নামে মাসিক আল-বালাগ পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন। তা ছাড়া আলাদাভাবেও নিজ সম্পৃক্তজনদের কাছে পাঠান। এভাবে তিনি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

সুতরাং ক্ষমাপ্রার্থনার বিষয়টি অসম্মানজনক কোন ব্যাপার নয়। এর দ্বারা কারও মান-সম্মান নষ্ট হয় না। এর দ্বারা বরং আখিরাতের অসম্মান থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অন্যের যে দায় নিজের উপর থেকে যায় আখিরাতে তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সেই সংগে এর দ্বারা অহংকারও নির্মূল হয়।

চাকরকে হাদিয়া দ্বারা সন্তুষ্ট করে দিন

কর্মচারী বা ভৃত্যের সাথে আগামীতে সম্পর্ক রক্ষার সিদ্ধান্ত থাকলে এবং স্পষ্ট ভাষায় ক্ষমা চাইলে সে উদ্ধত হয়ে ওঠবে এই আশংকা থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করুন। যেমন কোন উপহার দিয়ে তার মনোবেদনা দূর করতে পারেন।

ভৃত্য ও অধীনস্থদের প্রতি সর্বাবস্থায় ইনসাফ রক্ষা কেবল আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও সাহায্য দ্বারাই সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ তার অধীনস্থদের সাথে আচার-আচরণে সীমালংঘন করে ফেলে, তাদের প্রতি জুলুম হয়ে যায়। কারণ, তারা অধীনস্থ হওয়ার কারণে নিজ থাবার নিচে থাকে, যখন ইচ্ছা তাদের ধমকানো যায়, যখন ইচ্ছা খবরদারি করা যায়। এভাবে তারা যেহেতু নিজ ক্ষমতা বলয়ের মধ্যে থাকে তাই তাদের প্রতি

আচরণে তেমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ে যায়। বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। এ কারণেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ গুরুত্বের সাথে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দাসদের প্রতিও ইনসাফের হুকুম

একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু[1] নিজের এক গোলামকে মারছিলেন। তাঁর মত লোক যখন গোলমকে মারছেন বোঝাই যাচ্ছে গোলামটি বাস্তবিক কোন দোষ করেছিল। বিনাদোষে তাকে শাস্তি দিচ্ছিলেন না। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন তিনি গোলামকে মারছেন, বলে উঠলেন,

اَللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ

এই গোলামের উপর তোমার যতটা ক্ষমতা, তোমার উপর আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা তারচে, অনেক বেশি।

(মুসলিম, হাদীছ নং ৩১৩৫ : তিরমিযী, হাদীছ নং ১৮৭১: আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৪৯২ : মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৪৬৭)

এ হাদীছে শেখানো হচ্ছে যে, তোমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা প্রয়োগকালে সতর্ক দৃষ্টি রেখ যেন তার ব্যবহার যথাস্থানে যথানিয়মে প্রয়োজন অনুপাতে হয়। কিছুতেই যেন সীমালংঘন ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না হয়। ভেবে দেখ আল্লাহ তাআলাও যদি তোমার উপর তার ক্ষমতা প্রদর্শন শুরু করে দেন তোমার পরিণতি কী দাঁড়াবে?

হযরত থানভী (রহ.)-এর রীতি

মোটকথ, অধীনস্থ ও ছোটদের প্রতি আচরণে অনেক সময়ই অহংকার অহমিকা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। হযরত থানবী (রহ.) তাঁর এক বক্তব্যে ইরশাদ করেন, আমার অধীন কাউকে পাকড়াও করা বা তিরস্কার করার প্রয়োজন দেখা দিলে, তখন একদিকে তো তাকে তিরস্কার করতে থাকি,

---

১. প্রকাশ থাকে যে, এসব হাদীছ গ্রন্থের বর্ণনায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) এর স্থানে হযরত আবূ মাসউদ আনসারী রাযি.-এর নাম পাওয়া যায়, যার প্রকৃত নাম উকবা ইবন আমর ইবন ছালাবা)।

অন্যদিকে মনে মনে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, হে আল্লাহ ! এর পাকড়াও আপনি যেন আমাকে না করেন, এর থেকে আমি আপনার কাছে রেহাই চাই। আল হামদুলিল্লাহ আমার কখনওই এর ব্যতিক্রম হয় না। চিন্তা করুন, যার অন্তরে সর্বক্ষণ আখিরাতের পাকড়াও সম্পর্কে ভয় থাকে, তার দ্বারা কি কখনও সীমালংঘন হওয়া সম্ভব ?

ভাই নিয়ায মরহূমের ঘটনা

হযরত থানভী (রহ.)-এর খলীফা বাবা নাজম আহসান (রহ.) ঘটনা শুনিয়েছেন যে, হযরত থানভী (রহ.) এর খাদেম ছিল। নাম ভাই 'নিয়ায' হযরতের খুব কাছাকাছি থাকত। একটু চড়া মেজাযের ছিল। মুখের উপর কথা বলে ফেলত। কেউ বড়দের মুখের উপর কথা বললে অন্যদের সামনে সে তা নিয়ে একটু বাহাদুরিও করে। কেউ বলেছেন-

بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا

বড়র সংগে যে থাকে সে অন্যদের সামনে গর্ব করে বেড়ায়। তো হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে যে সকল মেহমান আসা-যাওয়া করত খাদেম সাহেব তাদের সাথেও কখনও কখনও মুখঝামটা দিয়ে বসত। হযরতের কাছে নালিশ গেল যে, 'ভাই নিয়ায' অতিথিদের সাথে দুর্ব্যবহার করে হযরত (রহ.) তাকে ডাকলেন। তিরস্কার করে বললেন মিয়া নিয়ায! তুমি মেহমানদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ কর এবং তাদের সাথে অভদ্র আচরণ কর, ব্যাপার কী? উত্তরে সে বলল, হযরত! মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন। ভাবুন দেখি, একজন খাদেম ও ভৃত্য তার মনিবকে বলছে, মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন! তখন তো কঠিন ধমক দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হযরত থানভী (রহ.) কী করেছিলেন? তিনি আসতাগফিরুল্লাহ! আসতাগফিরুল্লাহ! বলতে বলতে অন্যদিকে চলে গেলেন।

পরে অন্যরা জিজ্ঞেস করলে হযরত বললেন, 'ভাই নিয়ায' যখন আমাকে বলল, মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন, তখন আমার হুশ হল যে, আমি তো এক দিককার কথা শুনেই তাকে ধমকাতে শুরু করেছি। আমি কেবল অভিযোগকারীর কথাই শুনেছিলাম যে, সে মেহমানদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমার তো তার কথাও শোনা উচিত ছিল। জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল যে, লোকে তোমার সম্পর্কে এই নালিশ করেছে, বলো তো এটা সত্য না মিথ্যা? উভয় পক্ষের কথা শোনার পরই আমার করণীয় স্থির করা উচিত ছিল। তা না করে আমি কেবল এক পক্ষের শুনলাম আর তাকে বকা

শুরু করে দিলাম। এটা আমার ভুল ছিল আর সে কারণেই আসতাগফিরুল্লাহ! বলতে বলতে চলে যাই।

হযরত বাবা নাজম আহসান (রহ.) এ ঘটনা শোনানোর পর বলেন, আমার ধারণা 'ভাই নিয়ায' আসলে হযরত মিথ্যা বলছেন এবং তাঁর আল্লাহকে ভয় করা উচিত একথা বোঝাতে চাচ্ছিল না। তার একথার লক্ষবস্তু ছিল অভিযোগকারীগণ। অর্থাৎ তারা মিথ্যা বলছে, তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মিথ্যা না বলা। কিন্তু তাড়াহুড়া করার কারণে সে তাদেরকে উদ্দেশ করে বলা কথাটি হযরতকে সম্বোধন করেই বলে দিয়েছে।

আল্লাহপ্রদত্ত সীমারেখায় যারা থেমে যান

ঘটনাটি আমাদের জন্য অনেক বড় শিক্ষণীয়। একজন খাদেমকে তিরস্কার করতে গেলে উল্টো সেই যখন মুখের উপর কথা ছুড়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠলেন যে, আমারই তো ভুল। আমি এক পক্ষের কথা শুনেই ধমকাতে শুরু করলাম! তখনই ইসতিগফার পড়লেন। একেই বলে,

كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللهِ

যিনি আল্লাহ তায়ালার দেওয়া সীমারেখায় থেমে যেতেন, সেখান থেকে এক পা'ও আগে বাড়তেন না।

এই ছিলেন হাকীমুল উম্মত। হাকীমুল উম্মত এমনিই বলা যায় না। বিশ্বব্যাপী তাঁর ফয়য ও কল্যাণধারা এমনিই ছড়িয়ে পড়েনি। আজ আমরা বাহ্যিক কিছু অনুষ্ঠানেরই নাম দিয়েছি দ্বীন। অথচ এসবও দ্বীনের অংশ। কখন কার সাথে কি রকম ব্যবহার করতে হবে, কোন সীমার ভেতর করতে হবে এই মাত্রাজ্ঞান জানা দরকার। নিজের ভেতর মানদণ্ড স্থাপিত করে নেওয়া চাই, যাতে পাল্লা কোন এক দিকে ঝুঁকে না যায়, সব আচার-আচরণে পাল্লার দু'দিকই যাতে সমান থাকে।

বদলা নেওয়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা সহজ নয়

বস্তুত ছোটদের সাথে সঠিক ব্যবহার খুব সহজ কাজ নয়। এর জন্য কঠিন প্রশিক্ষণ দরকার। কবি চমৎকার বলেছেন,

دو گونہ رنج و عذاب جان مجنون را

প্রেমিকজনকে দ্বিগুণ দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হয়। একদিকে লক্ষ রাখতে হয় আমার পক্ষ থেকে যাতে কোন বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়। কোন জুলুম-পীড়ন

হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে প্রতিকারও করে নিতে হয় অন্যদিকে সে যাতে উদ্ধত ও বেআদব না হয়ে যায় এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা বরবাদ করে না দেয় সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হয়। এই উভয় দিক রক্ষা করে চলাকেই আল্লাহর সীমানা রক্ষা বলে। এ গুণ সাধারণত কোন কামেল শায়খের সাহচর্য ও তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়া অর্জিত হয় না। নিজে নিজে চলতে গেলে পদস্খলন ঘটে। যথারীতি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেই বোঝা যায়, কোথায় কি কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হয়, কতটুকু অবলম্বন করতে হয়। ধমক দেওয়ার দরকার পড়লে তার মাত্রা কী হবে এবং কতটুকু বেশি হয়ে গেলে তা সীমালংঘনের মধ্যে পড়ে যাবে। অন্তরে এ মানদন্ড এমনিই স্থাপিত হয়ে যায় না। 'দু'য়ে-দু'য়ে চার' এর মত সরলভাবে এটা বোঝানোও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা একটা বোধ ও চেতনা, অনুভব ও আত্মিক ক্ষমতা। এই বোধ ও চেতনা অন্তরে জন্ম নিলে তাই বলে দেয় কোথায় কী মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে এবং সতর্ক করে দেয় যে, এর বেশি প্রয়োগ করা যাবে না। করলে তা সীমালংঘন হয়ে যাবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ,

فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ তোমার উপর যতটুকু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, তুমিও তার উপর ততটুকু বাড়াবাড়িই করতে পার। (বাকারা : ১৯৪)

এ আয়াতের অনুসরণ খুব সহজ নয়। কেননা, প্রতিপক্ষ যতটুকু করেছে মাপজোখ করে ঠিক সেই পরিমাণ বদলা নেওয়া কঠিন নয় কি?

আল্লাহওয়ালাদের বিভিন্ন রং হয়ে থাকে

'আরওয়াহে ছালাছা' গ্রন্থে হযরত থানভী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন, এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গকে বলল, হযরত! শুনেছি বযুর্গদের বিভিন্ন রং হয়ে থাকে, তাদের একেকজনের একেক ধারা, একেক শান। তো তাদের সেই বিভিন্ন ধরন–ধারন আসলে কেমন তা আমি দেখতে চাই। বুযুর্গ বললেন, তুমি এই চক্করে পড়ো না। নিজ কাজে লেগে থাক। কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা, সে তা দেখবেই।

শেষে বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা তুমি এক কাজ কর। অমুক গ্রামে একটি মসজিদ আছে। সেখানে যাও। মসজিদে তিনজন বুযুর্গ আছেন। তাদেরকে আল্লাহর যিকরে মশগুল পাবে। তুমি গিয়ে তাদের প্রত্যেককে পেছন থেকে একটি করে ঘুষি মারবে। এতে তাদের কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখবে। তারপর এসে আমাকে জানাবে।

তাঁর কথামত লোকটি সেই গ্রামে চলে গেল। দেখল, ঠিকই তিনজন বুযুর্গ মসজিদে আল্লাহ তা'আলার যিকরে মশগুল। সে প্রথমে এক বুযুর্গকে পেছন থেকে ঘুষি লাগাল। বুযুর্গও পেছনে ঘুরে একই জোরে তাকে একটি ঘুষি লাগালেন। তারপর আবার যিকিরে লেগে গেলেন। তারপর দ্বিতীয়জনকে ঘুসি লাগাল। কিন্তু তিনি ফিরেও তাকালেন না। তিনি আপন মনে যিকিরেই রত থাকলেন। শেষে তৃতীয়জনকে মারল। ইনি ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু প্রথমজনের মত যে উল্টো ঘুষি লাগালেন তা নয়; বরং তার হাত ধরে টিপতে শুরু করলেন এবং বললেন, ভাই ব্যথা পাওনি তো?

লোকটি ফিরে আসলে সেই বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন খবর কী? সে যা- কিছু ঘটেছে সবিস্তারে বর্ণনা করল এবং জানাল যে, তিনজন তিন রকম আচরণ করেছে। বুযুর্গ বললেন, তুমি বুযুর্গদের রংয়ের বৈচিত্র্য জানতে চেয়েছিলে। তো এটাই তাই। তাদের তিনজনের তিন রং ছিল। প্রথম বুযুর্গ, যিনি তোমার ঘুষির বদলা নিয়েছেন, বল তো তুমি যেই ওজনের ঘুষি মেরেছিলে তার ঘুষিও সেই ওজনের ছিল কিনা ? নাকি আরও জোরে মেরেছে? সে বলল, না, সমান ওজনের ঘুষিই মেরেছে। তিনি বললেন, ওই বুযুর্গ চিন্তা করেছেন, সে আমার উপর যে জুলুম করেছে আমি কুরআন মাজীদের নির্দেশনা মোতাবেক তার থেকে সমান বদলা নিয়ে নেব। সুতরাং তাই করেছে।

বিষয়টা অনেকেরই বুঝে আসে না। তাদের প্রশ্ন হলো, ওলী-বুযুর্গ প্রতিশোধ নেবে কেন? আসলে তারা প্রতিশোধ নেন আঘাতকারীর প্রতি কল্যাণকামিতায়। চিন্তা করেন, প্রতিশোধ নিয়ে ফেললে সে আখিরাতের ধরা থেকে বেঁচে যাবে। সে কেন আমাকে কষ্ট দিল, আমি প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব–এই মানসিকতা তাদের থাকে না। বরং তাকে আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচানোই থাকে লক্ষ। সেজন্যই নগদ তার থেকে বদলা নিয়ে নেন। কিন্তু সতর্ক থেকেছেন যাতে বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়। তাই ঘুষির বদলে সমওজনের ঘুষিই মেরেছেন, তার বেশি নয়।

দ্বিতীয় বুযুর্গ চিন্তা করেছেন বদলা নেওয়ার ঝামেলায় কে জড়ায়? এক রত্তিও যদি বেশি বদলা নেওয়া হয়, উল্টো ধরা খেতে হবে। শুধু-শুধু সেই চক্করে কেন পড়ব। তারচে' যে কাজে লেগে আছি সেটাই করি। আল্লাহর যিক্র করছি। সময় অনেক মূল্যবান। তা নষ্ট করি কেন? যে মারছে মারুক।

তৃতীয় বুযুর্গ ছিলেন ভিন্ন রঙের। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাই নিজে ব্যথা পেয়েছেন সে ভাবনা তার ছিল না : বরং তার চিন্তা দেখা দিয়েছে আঘাতকারীকে নিয়ে। না জানি আমাকে মারতে গিয়ে সে নিজে কতটা ব্যথা পেয়েছে। তাই উঠে তার হাত টিপতে শুরু করেছেন।

যা হোক বুযুর্গগণের ধরন-ধারন বড় বিচিত্র! তিনজনের তিন তরিকা। সবটাই জায়েয ছিল। প্রথমটা জায়েয ছিল এ কারণে যে, তাতে সমমাত্রায় বদলা নেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ,

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

'মন্দের প্রতিশোধ অনুরূপ মন্দ'। (শূরা : ৪০)

দ্বিতীয়টি ছিল ক্ষমার পন্থা। এটাও জায়েয। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

'অবশ্য যে সবর করে ও ক্ষমা করে দেয়, তা তো দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ। (শূরা : ৪৩)

বস্তুত ক্ষমা করাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। ব্যক্তিগত বিষয়ে তিনি কখনও কার থেকে বদলা নেননি আর তৃতীয় পন্থা আরও উৎকৃষ্ট ও উন্নত। যেহেতু এ বুযুর্গ নিজের বদলে আঘাতকারীর কষ্ট চিন্তা করছিলেন।

বস্তুত বান্দার হক একটা নাজুক বিষয়। এ বিষয়ে প্রত্যেকের সর্বদা ভীত-তটস্থ থাকা উচিত। পাছে আমার দ্বারা কারও উপর কোন বাড়াবাড়ি হয়ে যায় এবং কেউ আমার দ্বারা কোন কষ্ট পেয়ে বসে। আজকাল মানুষ কত নির্মমভাবে অন্যের হক নষ্ট করছে। মানুষের জানমাল ও ইজ্জত আবরু লুটছে। অথচ মানুষের জানমাল ও ইজ্জত এত বেশি মর্যাদাপূর্ণ যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কাবারও উপরে এর স্থান দিয়েছেন। কেউ কোন মুসলিমের জানমালের উপর হামলা করলে সে যেন পবিত্র কাবার উপর হামলা করল। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

জনৈক ব্যক্তির ঘটনা

এক ব্যক্তি নিজ ঘটনা শোনাচ্ছিল। সে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিল, হাতে টাকার থলি। পথে দু'জন লোক তার গতিরোধ করল। প্রথমে পিস্তল দেখাল, তারপর একটি থাপ্পর মারল। তারপর দু'বার গালি দিল। শেষে বলল, যা-কিছু আছে দিয়ে দে। অর্থাৎ কেবল টাকা নিয়েই ক্ষান্ত হতে চাইল না, বরং জান-মাল ও ইজ্জত তিনওটাতে আঘাত করল। তারা একবার চিন্তা করে না যে, কি কাজ করছে। ভাবে না, একদিন মরতে হবেই, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতেও হবে, আর এই যে জগতে বাস করছি, এটা কত দিনের তা

জানা নেই। একদিনেরও হতে পারে, কিছুদিন বেশিও হতে পারে। এই যে পিস্তল দেখিয়ে বেড়াচ্ছি, এ বেড়ানো কতদিন স্থায়ী হবে। ভবিষ্যত তো সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই ভোর শেষ ভোর হতে পারে। এই সন্ধ্যার পর আর সকাল নাও পাওয়া যেতে পারে। এ দুনিয়া থেকে যেতে একদিন হবেই। তা সত্ত্বেও এসব দুষ্কর্ম করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে হিদায়াত করুন। মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা দান করুন। আমাদের হুকূকুল-'ইবাদের ফিকির করা উচিত। নিজের দ্বারা কেউ যেন কোনও ভাবে কষ্ট না পায়। কারও দৈহিক, আর্থিক ও মর্যাদাগত কোন ক্ষতি যেন আমার দ্বারা না হয়ে যায়। অসতর্কতাবশত সে রকম কিছু হয়ে গেলে অবিলম্বে যেন ক্ষমা করিয়ে নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ইসলাহী মাজালিস: ২য় খণ্ড, ৭৪-৯৩ পৃষ্ঠা

পরিবার ব্যবস্থা

পরিবার ব্যবস্থা মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যতা-সংস্কৃতির সুবিশাল স্থাপনার পক্ষে এটা ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। পরিবার ব্যবস্থার অবকাঠামো যদি ভেঙে পড়ে এবং এটা বিপর্যয়ের শিকার হয়, তবে ভূমি থেকে স্বর্ণের নির্ঝর ছুটুক আর কল-কারখানায় মনি-মুক্তা উৎপন্ন হোক, জীবন থেকে শান্তি-স্বস্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। ইউরোপ-আমেরিকার যে উন্নত বিশ্বকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ঈর্ষণীয় ভাবা হয়, পরিবার ব্যবস্থার ভাংচুরের কারণে আজ তা কঠিন সমস্যায় জর্জরিত। সম্পদের প্রাচুর্য ও ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক উন্নতি সত্ত্বেও সেখানকার মানুষ এক অজ্ঞাত অস্থিরতায় ভুগছে। সে অস্থিরতা ঘোচানোর জন্য কেউ যোগ-সাধনার আশ্রয় নিচ্ছে, কেউ মাদক বা ঘুমের ওষুধ সেবনের মাধ্যমে শান্তি খুঁজছে। যখন এ সবই ব্যর্থ যায়, কোনওটির মাধ্যমেই অস্থিরতার উপশম হয় না, তখন সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। ফলে সেসব দেশে আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে।

এই কিছুদিন আগে আমি সুইজারল্যান্ডে ছিলাম। মেজবানেরা আমার চলাফেরার জন্য যে গাড়ির ব্যবস্থা করেছিল, তার চালক ছিল ইটালিয়ান বংশোদ্ভূত একজন শিক্ষিত লোক। সাবলীল ইংরেজি বলত। কিছুদিন আমার সাথে ছিল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু এতদিনেও বিবাহ করেনি। কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমাদের সমাজে অধিকাংশ বিবাহই লক্ষভ্রষ্ট হয়ে যায়। কেননা, বিবাহের পর স্থায়ী দাম্পত্য বাসের ভাবনা কদাচিত থাকে। বরং বিবাহ এখন কেবলই প্রথাগত নামমাত্র রয়ে গেছে। প্রধানত যার উদ্দেশ্য হল একে অন্যের থেকে আর্থিক সুবিধা হাসিল করা। বিবাহের পর বহু নারী খুব শীঘ্রই বিচ্ছেদ নিয়ে নেয়। আর এখানকার আইন অনুযায়ী স্বামীর অর্থ-সম্পদ থেকে একটা বড় অংশ হাতিয়ে নিয়ে তাকে দেউলিয়া বানিয়ে দেয়। বোঝা মুশকিল, কোন মহিলার উদ্দেশ্য স্বামীর অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করা আর কে সত্যিকারের দাম্পত্য জীবন যাপনে ইচ্ছুক। সে বড়

আক্ষেপের সাথে এসব কথা বলছিল। তারপর এই মন্তব্যও করল যে, সার্থক বিবাহ আপনাদের এশীয় দেশগুলোতেই হয়। তা দ্বারা এমন স্থিতিশীল পরিবার-খান্দান গড়ে ওঠে, যার সদস্যবর্গ পরস্পর সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা দিন দিন এমন মজবুত পারিবারিক অবকাঠামো থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার পিতামাতা ও ভাই বোনেরা কি উপযুক্ত স্ত্রীর সন্ধানে তোমাকে সহযোগিতা করছে না ? প্রশ্নটি সে খুব তাজ্জুবের সাথে শুনল। তারপর বলল, আমার বাবা-মা তো গত হয়ে গেছেন। ভাই-বোন আছে বটে, কিন্তু আমার বিবাহের সাথে তাদের কী সম্পর্ক? প্রত্যেকে নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করে। তাদের সাথে আমার সর্বশেষ দেখাও তো হয়েছে কয়েক বছর হয়ে গেল।

এটা একজন ড্রাইভারের অনুভূতি। (প্রকাশ থাকে যে, ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভারদের অধিকাংশই শিক্ষিত হয়, কোনও কোনও ড্রাইভার তো বেশ উচ্চ শিক্ষিতই। আমি যে ড্রাইভারের কথা বললাম, তার নাম অবলেভো। গ্রাজুয়েট ছিল এবং ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তার ব্যাপক পড়াশোনা ছিল)। ব্যক্তিগত সমস্যাসংকুলতার কারণে তার বক্তব্যে কিছুটা অতিশয়োক্তিও থাকতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্যে পরিবার ব্যবস্থার বিপর্যয় এমনই এক বাস্তবতা, যে সম্পর্কে বেশি দলীল-প্রমাণ পেশ করার দরকার পড়ে না। এটা সারা বিশ্বে সুবিদিত। পশ্চিমের চিন্তাবিদগণ এ নিয়ে যথারীতি মাতম করছে। তারা যতই এর প্রতিকারের চেষ্টা করছে তত দ্রুতগতিতেই পরিবার-কাঠামো ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভ এখন বিশ্ব-রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে বলতে গেলে আড়াল হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর রচিত গ্রন্থ perestroika, যা তিনি ক্ষমতাসীন থাকাকালে লিখেছিলেন, কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নই নয়, বরং সমগ্র পাশ্চাত্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর এক সাহসী পর্যালোচনার মর্যাদা রাখে। তার কোনও কোনও অংশে আজও চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট খোরাক আছে। এ গ্রন্থে তিনি 'নারী ও পরিবার' (women and family) শিরোনামে পরিবার ব্যবস্থার ফাটল-ভাঙন সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। শুরুতে লেখেন, 'নারীস্বাধীনতা' আন্দোলনের এই দিকটি তো অবশ্যই প্রশংসনীয় যে, এর মাধ্যমে নারীগণ পুরুষদের সমান অধিকার লাভ করেছে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং এর ফলে আমাদের অর্থনৈতিক উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

কিন্তু সামনে গিয়ে তিনি লেখেন,

"But over the years of difficult and heroic history, we failed to pay attention to women's specific rights and needs arising from their role as mother and home-maker, and hier in dispensable educational function as regards children. Engaged in scientific research, working on construction sites, in production and in the services, and involved in creative activities, women on longer have enough time to perform their everyday duties at home housework, the upbringing of children and the creation of a good family atmosphere. We have discovered that many of our problems in childrin's and young peoples's behavior, in our morals, culture and in production are partially caused by the weakening of family tyes and slack attitude to family reponsibilites. This is a paradoxical result of our sincere and politically justified desire to make women equal with man in every thing. Now' in the course of perestroika,we have begun to overcome this shortcoming.That is why we are now holding heated dibates in the press, on public organizations at work and at home, about the question of what we should do to make it possible for women to retrun their purely womanly mission.")

"কিন্তু আমরা আমাদের জটিল ও দুঃসাহসিক ইতিহাসের বিগত বছরগুলোতে নারীর সেইসব অধিকার ও প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছি, যা একজন মা ও গৃহিণীরূপে এবং শিশুদের শিক্ষা দীক্ষায় তার অনুপেক্ষণীয় ভূমিকাপালন থেকে জন্ম নেয়। নারীরা যেহেতু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত হয়ে গেছে, তাছাড়া নির্মাণাধীন স্থাপনার তদারকিতে, উৎপাদমূলক কর্মকাণ্ড: অন্যান্য সৃজনশীল কর্মব্যস্ততা ও সেবামূলক তৎপরতায় লেগে রয়েছে, তাই সাংসারিক দৈনন্দিন কাজকর্ম আনজাম দেওয়া, শিশুদের প্রতিপালন করা ও একটি আদর্শ পরিবার গঠনে ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন আমাদের সামনে এই সত্য উন্মোচিত হয়ে গেছে যে, শিশু-কিশোরদের চালচলন এবং আমাদের নীতি-নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উৎপাদন

সংক্রান্ত বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব এখান থেকেই হয়েছে। অর্থাৎ পারিবারিক বন্ধনজনিত বাধ্যবাধকতা শিথিল হয়ে যাওয়া ও পারিবারিক দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি ঔদাসিন্যের প্রবণতা চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়া থেকেই এসব সমস্যার সৃষ্টি। সকল ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষদের সমান সাব্যস্ত করার যে নিষ্ঠাপূর্ণ অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলাম, যা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকও ছিল, বর্তমান পরিস্থিতি মূলত তারই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। বিনির্মাণের এ নতুন আয়োজনে আমরা এই ত্রুটির প্রতিবিধানকল্পে কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছি। প্রেস ও বিভিন্ন পাবলিক প্রতিষ্ঠানে এ নিয়ে কাজ চলছে। তাতে বিশেষভাবে এই প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা হচ্ছে যে, নারীকে তার একান্ত নারীধার্মিক মিশনে ফিরিয়ে আনা'র লক্ষে আমরা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি"।

(perestrocia,পৃ. ১১৭, মুদ্রণ ১৯৮৭)

'টা এমন এক রাজনৈতিক নেতার বিশ্লেষণ, যার সমাজে পরিবার ও নর-নারীর অধিকার এবং তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কোনও রকম ধর্মীয় মূল্যবোধের ধারণা নেই কিংবা থাকলেও তার বিশেষ গুরুত্ব নেই। স্বভাবিকভাবেই পরিবার ব্যবস্থা ভেঙেচুরে যাওয়ায় তার এমন আক্ষেপ প্রকাশ কোন আসমানী নির্দেশনার প্রভাবপ্রসূত নয়। বরং নিরেট বৈষয়িক জীবনে যে বহুমাত্রিক ক্ষতি তিনি নিজ চোখে দেখতে পেয়েছিলেন, এ আক্ষেপ তারই উপলব্ধিজাত। কিন্তু আমরা তো মুসলিম। আমরা কেবল বাহ্যিক ও বৈষয়িক কিংবা পার্থিব লাভ-ক্ষতির হিসাব কষতে পারি না। আমাদের রয়েছে আসমানী নির্দেশনা। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে সে নির্দেশনা আমাদের দেওয়া হয়েছে। তার অনুসরণ আমাদের অবশ্যকর্তব্য। সুতরাং পরিবার-ব্যবস্থার অবক্ষয় কেবল আমাদের সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষতিই নয় বরং আমাদের বিশ্বাস, আমাদের জীবনদৃষ্টি আমাদের দ্বীন-ধর্মের দিক থেকেও এটা অনেক বড় বিপর্যয়। একটি মুসলিম সমাজে এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

আমাদের সমাজে যখন থেকে পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার ঢেউ লেগেছে। বিশেষত যখন থেকে টিভি, ভিডিও ও ইংলিশ চলচ্চিত্রের ছড়াছড়ি আমাদের সমাজে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো শুরু করেছে, তখন থেকে আমরা সচেতন বা অচেতনভাবে পাশ্চাত্যের সূচিত সমাজভাবনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আল-হাম্‌দুলিল্লাহ, এখনও পর্যন্ত আমাদের পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি, কিন্তু যেই ক্ষীপ্রতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে বিস্তার লাভ করছে, ইংলিশ চলচ্চিত্রের সয়লাব পাশ্চাত্য জীবনধারাকে যেভাবে গ্রামে-গ্রামে ও ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে দিচ্ছে, কোনও রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়া

যেভাবে নারীদের ঘর থেকে বের করা ও তাদেরকে উৎপাদনের উপকরণ (Factor of production) বানানোর প্রতি জোর দেওয়া হচ্ছে এবং গৃহ ও পরিবার সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা থেকে যে গতিতে দূরে সরা হচ্ছে, আগামী দিনে তা আমাদের পরিবারব্যবস্থার জন্য যে এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দেবে তার আলামত তো পরিষ্কার। কাজেই একে থামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা এখনই নেওয়া জরুরি। আর সে ব্যবস্থা হতে পারে কেবল একটাই—ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা আমাদেরকে দান করেছে, তার যথাযথ অনুসরণ। এ শিক্ষা পাশ্চাত্যেরও নয়, প্রাচ্যেরও নয়। ওহীই এর একমাত্র উৎস। এমন এক সত্তাই আমাদের জন্য তা স্থির করে দিয়েছেন, যিনি মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, যিনি মানবমনের সেই চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিত, যা প্রাণঘাতী হলাহলের উপর চিনির প্রলেপ লাগাতে বেশ ওস্তাদ। সুতরাং সময়ের যে-কোনও স্লোগানের পেছনে ছুটে চলা নয়, বরং আমাদের কাজ হবে কুরআন-সুন্নাহ্‌র কষ্টিতে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া, কোন্‌টা আমাদের দ্বীনী মেযাজ ও রুচিবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং কোন্‌টা নয়। এই সাহস ও বিচক্ষণতা যতদিন আমাদের মধ্যে সৃষ্টি না হবে, ততদিন আমরা বহিরাগত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের টাটকা গ্রাসেই পরিণত হয়ে থাকব আর ক্রমশ আমাদের সমাজ-জীবনের এক-একটি পেরেক আলগা হতে থাকবে।

যিক্‌র ও ফিক্‌র; পৃষ্ঠা : ৩০৮

১৯ জুলহিজ্জাঃ ১৪১৬ হি/ ৮ মে, ১৯৯৬ খৃ.

আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ نَعَمْ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلٰى قَالَ: فَذٰلِكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ ○

'হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ তা'আলা মাখলূক সৃষ্টি করলেন এবং সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করলেন, তখন আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে গেল। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তা'আলার আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে গেল। (প্রশ্ন হতে পারে, আত্মীয়তা কিভাবে দাঁড়িয়ে গেল? এর প্রকৃত উত্তর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই জানেন। আমাদের পক্ষে এর স্বরূপ বলা সম্ভব নয়। কেননা, আত্মীয়তা শরীরধারী কোন বস্তু নয়। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা অনেক সময় অশরীরী জিনিসকেও ঊর্ধ্ব জগতে শরীর দিয়ে দেন। ইহজগতে তা বোঝা আমাদের বুদ্ধির অতীত। যাহোক আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে গেল) এবং আরয করল, হে আল্লাহ! এটা এমন এক জায়গা যেখানে (আমি আমার অধিকার পদদলিত হওয়া থেকে) আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। (অর্থাৎ দুনিয়ায় মানুষ আমার অধিকার খর্ব করবে, তা পদপিষ্ট করাবে, তারা তা আদায় করবে না।

আমি তা থেকে আপনার পানাহ চাচ্ছি)। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কি এতে রাজি নও যে, আমি ঘোষণা দিচ্ছি, যে-কেউ তোমার অধিকার নষ্ট করবে, আমি তাকে শাস্তি দেব, আমিও তাকে তার অধিকার দেব না. আত্মীয়তা বলল, হে আল্লাহ! আমি এতে রাজি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাকে এই মর্যাদা দিলাম। ঘোষণা করছি, যে-কেউ আত্মীয়তার অধিকারকে মর্যাদা দেবে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, আমিও তার সাথে ভালো ব্যবহার করব। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়দের হক নষ্ট করবে, আমি তাদের হকসমূহের প্রতি লক্ষ রাখব না।

এতটুকু বলার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চাইলে তোমরা কুরআন মাজীদের এ আয়াত পড়তে পার, যাতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্বোধন করে বলছেন ....فَهَلْ عَسَيْتُمْ ' ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তোমরা কি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? আল্লাহ তাদেরকে করেন অভিশপ্ত আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন'। (মুহাম্মদ : ২২-২৩)

আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তা ছিন্নকারীদের সম্পর্কে এমনই কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা রক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে

যে সকল আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বারবার মানুষকে আত্মীয়দের হক আদায়ের জোর নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি সদাচরণের তাগিদ দিয়েছেন, এ হাদীছ তার ব্যাখ্যাস্বরূপ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহের খুত্‌বায় আয়াত পাঠ করতেন,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ'

'আল্লাহকে ভয় কর, যার নামের ওছিলা দিয়ে তোমরা অন্যদের কাছে নিজেদের হক দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তাকেও ভয় কর (যাতে তার হকসমূহ পদদলিত না কর। (নিসা:১)

কেউ যখন অন্যের কাছে নিজের হক চায় তখন বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার এই হক দিয়ে দাও। সে কথাই বলা হয়েছে, যেই আল্লাহর নাম দ্বারা তোমরা একে অন্যের কাছে নিজ পাওনা চাও, তাকে ভয় কর, আর সতর্ক থেক, যাতে আত্মীয়তার হক নষ্ট না কর, কেননা, তা করলে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দান করবেন। কুরআন মাজীদে এজাতীয় আয়াত

প্রচুর, যাতে আত্মীয়দের হক যথাযথভাবে আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত হাদীছের সংখ্যাও অনেক।

শরী'আত মূলত হক আদায়েরই নাম

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকারের হক আদায়েরই নাম শরী'আত। গোটা শরী'আত দুই ভাগে বিভক্ত। হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) ও হক্কুল-ইবাদ (বান্দার হক)। বান্দার হক বিভিন্ন রকমের। পিতামাতার হক, সন্তানের হক, স্ত্রীর হক, স্বামীর হক, আত্মীয়-স্বজনের হক, প্রতিবেশীর হক, সহযাত্রীর হক, ইত্যাদি। এভাবে পূর্ণ শরী'আতই বিভিন্ন রকম হকেরই সমষ্টি। এসব হকের কোনও একটিও অনাদায় থাকলে শরী'আতের অনুসরণ অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তির দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হয় না। এক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার হক তো পুরোপুরি আদায় করল, কিন্তু বান্দার হক আদায় করল না, তার দ্বীন কামেল হল না। দ্বীনের অনুসরণ অসম্পূর্ণ থেকে গেল। এসব হকের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের হকও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্ত মানুষ পরস্পর আত্মীয়

এমনিতে তো সমস্ত মানুষই পরস্পরে আত্মীয়-স্বজন। সকলেই আদম-সন্তান। সেই সূত্রে আত্মীয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীছেও বিষয়টা উল্লেখ করেছেন। সমস্ত মানুষেরই আদি পিতা একজন, অর্থাৎ হযরত আদম 'আলাইহিস-সালাম। আমরা সকলে তাঁরই বংশধর। পরবর্তীকালে বংশ বিস্তারের সাথে-সাথে বিভিন্ন গোত্র-বংশের উদ্ভব হয়েছে। একেক গোত্র একেক জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। আর এভাবে আত্মীয়তা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বপুরুষের মিলন অনেক-অনেক পেছনের হওয়ায় একে অন্যকে আত্মীয় মনে করছে না। না হয় প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানুষই একে অন্যের আত্মীয়। হ্যাঁ কারও আত্মীয় কাছাকাছির এবং কারও দূরের। কেউ নিকটাত্মীয়, কেউ দূর-আত্মীয়। কিন্তু আত্মীয় বটে।

হক আদায় শান্তি প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপায়

পরিভাষায় নিকটাত্মীয়দেরকেই আত্মীয় বলা হয়ে থাকে, যেমন- ভাই বোন, চাচা, স্ত্রী, স্বামী, মামা, খালা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা এসব

আত্মীয়ের বিশেষ-বিশেষ হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব হক নির্ধারণের একটা বড় কারণ হল মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ আত্মীয়দের হক যথাযথভাবে আদায় করা হলে জীবন নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ হয়ে যায়। সমাজের যত ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মুকদ্দমা, হিংসা-বিদ্বেষ, তার অন্যতম প্রধান কারণই হল পারস্পরিক হকসমূহকে পদদলিত করা। প্রত্যেকে নিজ-নিজ আত্মীয়ের হক আদায় করলে নিজেদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-কলহ থাকত না। মামলা-মুকদ্দমার প্রশ্ন আসত না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়দের হক আদায়ের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দান করেছেন। তোমরা এ নির্দেশ পালন করলে জীবন শান্তিময় হয়ে উঠবে। যে-কোন সমাজের ভিত্তিই স্থাপিত হয় পরিবার ও খান্দানের উপর। খান্দানের মধ্যে যদি সম্প্রীতি না থাকে, তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ না থাকে, এবং তাদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক না থাকে, তার কুফল গোটা সমাজকে ভুগতে হয়। সারাটা সমাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং সর্বত্র অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে একটা জাতিই ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মীয় স্বজনের হক আদায় ও তাদের পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর জন্যই সদ্ব্যবহার কর

এমনিতে তো প্রতিটি ধর্ম ও প্রতিটি নীতিদর্শনে আত্মীয়দের অধিকারকে সম্মান জানানোর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই বলে, আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে এমনই এক কালজয়ী মূলনীতি দান করেছেন, যা সকল ধর্ম ও দর্শন থেকে আলাদা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মূলনীতিটি আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হতে পারলে কখনও কারও দ্বারা কোনও আত্মীয়ের অধিকার খর্ব হবে না, কোনও আত্মীয়ের সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে না।

মূলনীতিটি হচ্ছে, যখনই কোন আত্মীয়ের প্রতি সদাচরণ করা হবে, তখন তা দ্বারা তাকে খুশি করা অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার দিকেই নজর বেশি থাকবে। অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করার সময় এই নিয়ত থাকবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার হুকুম, এ হুকুম পালনের মাধ্যমে আমি আল্লাহ তা'আলাকে রাজি-খুশি করতে চাই। তাঁর সন্তুষ্টিলাভই এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য।

মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার লক্ষ্যে সদ্ব্যবহার করবে, তখন তার অপরিহার্য ফল হবে স্বার্থহীনতা। অর্থাৎ সেই সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে

আত্মীয়দের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা তার থাকবে না। বরং তার মাথায় এই চেতনাই সক্রিয় থাকবে যে, আমি কেবল আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার লক্ষ্যেই তার প্রতি সদাচরণ করছি, আর এ সদ্ব্যবহারের কারণে যদি আত্মীয় খুশি হয়, সে জন্য আমার শুক্র আদায় করে কিংবা কোনও বদলাও দেয়, তবে সেটা নি'আমত বটে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সেটা নয়। কাজেই সে যদি খুশি নাও হয় এবং কোন বদলা না দেয়, তবু তার সাথে ভালো ব্যবহার আমাকে করতেই হবে, যেহেতু এটা আমার আল্লাহ আমার উপর ন্যস্ত করেছেন।

কৃতজ্ঞতা ও প্রতিদানের আশায় থেক না

আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ের প্রসঙ্গে প্রত্যেকই বলে, এসব হক আদায় করা ভালো, আদায় করা উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে অধিকাংশেরই নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে না এবং সমস্ত ঝগড়া-ফাসাদ তার থেকেই জন্ম নেয়। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কোনও রকমের সদ্ব্যবহার করল তো এখন অপেক্ষার প্রহর গুণতে শুরু করে যে, এর কী কৃতজ্ঞতা জানানো হয় এবং কী প্রতিদান দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে আশায় থাকে, আত্মীয়কে যে উপকারটুকু করা হল সে সারা গোষ্ঠীর মধ্যে তা প্রচার করে দেবে ও আমার গুণগান করে বেড়াবে। পরিশেষে যখন দেখে সে আশা পূরণ হয়নি, প্রতিদান তো দিলই না, কোন কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত জানালো না, অমনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে আর এই খেদ প্রকাশ করে যে, আমি তার এত বড় উপকার করলাম, অথচ সে একবার ফিরেও তাকালো না। মুখে কৃতজ্ঞতার একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করল না। আর প্রতিদান দেওয়া তো দূরের কথা। এর পরিণাম হল এই যে, আপনি তার যে উপকার করেছিলেন তার সবটা ছওয়াব বরবাদ করে দিলেন। আপনি তার প্রতি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বসে আছেন। পরে যখন কোন উপকার করার প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন চিন্তা করবেন, তার উপকার করে লাভ কী? তার মুখে কৃতজ্ঞতার একটি শব্দও আসে না। তার সাথে কী ভালো ব্যবহার করব? সুতরাং ভবিষ্যতে তার প্রতি সদ্ব্যবহারের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর এ পর্যন্ত যা-কিছু সদ্ব্যবহার করেছিলেন তার ছওয়াবও বরবাদ করে দিলেন। কেননা, তার কোনওটি আল্লাহ তা'আলার জন্য করেননি; বরং কৃতজ্ঞতালাভ ও প্রতিদানের আশায় করেছিলেন। এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কারও প্রতি সদ্ব্যবহার করবে আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার নিয়তে করবে। এই চিন্তা মাথায়ই আনবে না যে, সে এর প্রতিদানে আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী কে ?

একটি হাদীছ চির স্মরণীয়। তাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

'সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে তার আত্মীয়কে শুধু বদলা দিয়েই ক্ষান্ত হয় (অর্থাৎ তার নীতি হল অপর আত্মীয় তার সাথে যতটুকু ভালো ব্যবহার করবে সেও ততটুকুই করবে। সে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে এ-ও রক্ষা করবে আর সে রক্ষা না করলে এ-ও করবে না। বস্তুত এরূপ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়। আত্মীয়তার যে ছওয়াব তা সে পাবে না)। বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী হল সেই ব্যক্তি, যার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করা হলে সে তা রক্ষা করে, (অর্থাৎ অপর আত্মীয় তার সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করলেও কিংবা তার প্রতি দুর্ব্যবাহার করলেও সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে এবং তার প্রতি সদাচরণ করে। এই ব্যক্তিই প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী এবং আত্মীয়তা রক্ষার ছওয়াব লাভের সে-ই হকদার)।

আমরা রসম-রেওয়াজের পাকচক্রে জড়িয়ে গেছি

আজকাল কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আত্মীয়-স্বজনের কোন হক আছে কি? প্রত্যেকে উত্তরে বলবে, অবশ্যই আত্মীয়-স্বজনের অনেক হক আছে! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সে সব হক কে ঠিক কতটুকু আদায় করছে? জরিপ করা হলে দেখা যাবে, আমাদের গোটা সমাজকে রসম-রেওয়াজ ঘিরে রেখেছে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রসম-রেওয়াজের ফ্রেমে বন্দী হয়ে আছে। এর বাইরে কোন সম্পর্ক নেই, উদাহরণত কোন আত্মীয়ের বাড়িতে বিবাহানুষ্ঠান চলছে। এ উপলক্ষে কোন উপহার দিতে আগ্রহ লাগছে না বা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। কিন্তু তবু তা দিতে হবে। কেননা, চিন্তা করা হয়, উপহার ছাড়া গেলে খারাপ দেখা যাবে, নাক কান কাটা যাবে। লোকেই বা বলবে কি? তাছাড়া তারা আমার বাড়ির বিবাহে উপহার নিয়ে এসেছিল, আমি না নিলে বলবে, আমরা তো তার বাড়ির বিবাহে উপহার দিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাদের কিছুই দিল না। এতসব চিন্তা করে হাজারও অনিচ্ছা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও উপহার নিয়ে যাওয়া হয়। আর এটা কোনও রকম আন্তরিকতার সাথে দেওয়া হয় না; বরং কেবলই প্রথা পালন ও সুনাম-সুখ্যাতি কুড়ানোর লক্ষে দেওয়া হয়, কাজেই এতে কোন ছওয়াবও পাওয়া যায় না। উল্টা নাম-ডাকের উদ্দেশ্য থাকায় গুনাহের বোঝাই ভারী হয়।

অনুষ্ঠানাদিতে 'নিওতা'-(অর্থ লেনদেন'-এর প্রথা) হারাম

কোনও কোনও অঞ্চলে এ রকম একটা প্রথা চালু আছে যে, অনুষ্ঠানাদিতে নগদ টাকার লেনদেন হয়ে থাকে। এর নাম ' নিওতা'। প্রত্যেকের স্মরণ থাকে, আমার অনুষ্ঠানে অমুকে এত টাকা দিয়েছিল, কাজেই আমাকেও এত টাকা দিতে হবে। অনেক এলাকায় তো রীতিমত এর তালিকাই তৈরি করা হয়। ধারাবাহিক লেখা হয় 'অমুকে এত দিয়েছিল, অমুক এত টাকা। তারপর সে তালিকাটি সংরক্ষণ করা হয়। পরে সেই দাতাদের কারও বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে সে যত টাকা দিয়েছিল সমপরিমাণ টাকা তার অনুষ্ঠানেও দিতে হবে। তা ঋণ করেই দেওয়া হোক বা নিজের ও বাচ্চাদের পেট কেটে কিংবা চুরি-ডাকাতি করে দেওয়া হোক। দিতে অবশ্যই হবে। না দিলে তাকে সেই সমাজের নিকৃষ্টতম অপরাধী গণ্য করা হবে।

এই টাকা-পয়সা কেবল এই জন্যও দেওয়া হয় যে, আমার বাড়িতে যখন অনুষ্ঠান হবে তখন আমি যেমন দিলাম আমাকেও তেমনি দেওয়া হবে। এটা নিঃসন্দেহে হারাম। কুরআন মাজীদ একে 'ربا' (সুদ) নামে অভিহিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ

وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

'তোমরা মানুষকে যা কিছু রিবা দাও (এই আশায় যে, সে আমার অনুষ্ঠানে এই পরিমাণ বা আরও বেশি দেবে), যাতে এর দ্বারা মানুষের অর্থ-সম্পদে প্রবৃদ্ধি ঘটে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে তাতে কোন প্রবৃদ্ধি ঘটে না। আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছায় যে যাকাত দাও, তো এরূপ লোকদের অর্থসম্পদ আল্লাহর কাছে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।' (রূম : ৩৯)

উপহার দানে উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত

কারও কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে যদি আনন্দপূর্ণ কোন অনুষ্ঠান থাকে আর তার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে তাতে কোন উপহার দেওয়া এবং তাদের আনন্দে নিজেও শরীক থাকা, তবে উপহার সে দিতে পারে, কিন্তু শর্ত হল নিয়ত খালেস থাকা। অর্থাৎ কোন প্রতিদান পাওয়া বা মানুষকে দেখিয়ে সুনাম সুখ্যাতি কুড়ানো উদ্দেশ্য থাকবে না। বরং কেবল আত্মীয়ের হক আদায় ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনই লক্ষ্য থাকবে। এরূপ নিয়তে টাকা-পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করা বা কোন উপহার দেওয়া একটি ছওয়াবের কাজ। এটা তার আত্মীয়তা রক্ষার প্রচেষ্টা রূপেই লিখিত হবে।

উদ্দেশ্য পরখ করার উপায়

উপহার দানের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিবিধান না প্রতিদান লাভের ইচ্ছা তা যাচাই করার উপায় কী? এর জন্য লক্ষ করতে হবে উপহার দানের পরবর্তী গতিবিধি। আপনি কি এই অপেক্ষায় আছেন যে, উপহার গ্রহীতা আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক, বলুক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কিংবা আপনার বাড়িতে যখন কোন অনুষ্ঠান হবে প্রতিদানস্বরূপ সেও উপহার পেশ করুক? অথবা এমন হয় কি না যে, আপনার বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হলে তাতে সেই উপহার গ্রহীতা যদি প্রতিদানে কোন উপহার নিয়ে না আসে, তবে আপনার অন্তরে মলিনতা দেখা দেয় এবং অভিযোগ জন্মায় যে, আমি তো এতটা দিয়েছিলাম, অথচ সে কিছুই দিল না বা আমি তো আরও বেশি দিয়েছিলাম আর সে এত কম দিল? এ সবই আপনার প্রদত্ত উপহার আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে না হওয়ার পরিচয় বহন করে। ফলে এর জন্য কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ কেবল অর্থের অপচয়ই হল।

পক্ষান্তরে উপহার দেওয়ার পর যদি মন-মস্তিষ্ককে তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে ফেলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক বা নাই করুক, সে দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই না থাকে, প্রতিদানে সে কিছু দিল কি না সে দিকে দৃষ্টিই না যায়, বরং আপনার ভাবনা হল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাওফীক দিয়েছিলেন বলেই আমি তাকে খুশি করার লক্ষ্যে আত্মীয়দের আনন্দের মুহূর্তে তাদের খেদমতে উপহার পেশ করেছি, তাতে কোন কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদানের কোন আশা আমার ছিল না। কাজেই আমার অনুষ্ঠানকালে সে কোন উপহার না দিলে তাতে আমার কোন দুঃখ থাকবে না এবং সেজন্য মনে কোন অভিযোগও জাগবে না। তবে এটা নিয়ত খালেস থাকার আলামত। এর দ্বারা বোঝা যাবে, উপহার কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই দেওয়া হয়েছে। এটা উপহার দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের পক্ষেই বরকতপূর্ণ।

হাদিয়া বা উপহারের মাল পবিত্র ও হালাল

হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে, কারও ব্যাপারে আপনার মনে যদি এই আশা ও অপেক্ষা থাকে যে, সে আমার কাছে আসবে এবং আমাকে হাদিয়া দেবে, তবে তার দেওয়া হাদিয়ায় বরকত থাকবে না। পক্ষান্তরে যে হাদিয়া কোন আশা ও অপেক্ষা ছাড়াই পাওয়া যায়, তা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকেই আসে, আল্লাহ তা'আলাই দাতার অন্তরে আপনাকে হাদিয়া দেওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন; তাই সে আন্তরিকভাবে তা এনে আপনার সামনে পেশ

করেছে। এরূপ হাদিয়া খুবই বরকতপূর্ণ হয়। অর্থাৎ আশা ও অপেক্ষা দ্বারা হাদিয়ার বরকত নষ্ট হয়। যেহেতু আগে থেকেই সে হাদিয়ার সাথে প্রবৃত্তির চাহিদা যুক্ত হয়ে গেছে, তাই তা বরকতপূর্ণ হয় না।

এক বুযুর্গের ঘটনা

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা। দরবেশ প্রকৃতির লোক ছিলেন। আর আল্লাহওয়ালাদেরকে কঠিন-কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। একবার তাকে অনাহারে ভুগতে হচ্ছিল। কয়েকদিন যাবৎ কোন খাবার মিলছিল না। মুরীদ ও ভক্তদের মজলিসে ওয়াজ করে সময় কাটছিল। ক্রমে শক্তি কমে আসছিল। কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বয়ান করতে লাগলেন। উপস্থিত এক মুরীদ বিষয়টা লক্ষ করল। সে আঁচ করতে পারল, ক্ষুধার তীব্রতায়ই আওয়াজ ছোট হয়ে গেছে। হয়ত কয়েকদিন যাবতই কিছু খাওয়া হচ্ছে না।

কাজেই শায়খের জন্য খানার ব্যবস্থা করার দরকার। তাড়াতাড়ি মজলিস থেকে উঠে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই খানা নিয়ে ফিরে আসল। তারপর একটা থালায় তা শায়খের সামনে পরিবেশন করল। শায়খ ক্ষণিক চিন্তা করে বললেন, না, এ খাবার তুলে নাও। আমি এটা গ্রহণ করব না। অগত্যা মুরীদ সে খাবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আজকালকার মুরীদ হলে তো পীড়াপীড়ি করত যে, না হযরত, এ খানা আপনাকে অবশ্যই খেতে হবে। নইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে যে! কিন্তু সে মুরীদ জানত, শায়খ অত্যন্ত কামেল-সিদ্ধপুরুষ। কামেল শায়খের হুকুম বিনাবাক্যে মেনে নিতে হয়। কেননা তার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। লোক দেখানোর জন্য প্রত্যাখ্যান করেছেন তা নয়। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, যেজন্য তিনি খেতে অস্বীকার করছেন। তাই সে খানা ফিরিয়ে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর মুরীদ সেই খাবার পুনরায় নিয়ে আসল এবং শায়খের সামনে পেশ করে বলল, হযরত! এবার গ্রহণ করুন। শায়খ বললেন, হ্যাঁ; এবার গ্রহণ করতে পারি।

পরে মুরীদ জানাল, প্রথমবার খাবার আনার পর শায়খ যখন তা প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন আমার মনে একটা ধারণা জাগল। আমি ভাবলাম, আমি যখন মজলিস থেকে উঠে আসছিলাম, তখন হয়ত হযরত বিষয়টা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তার কল্পনায় জেগে থাকবে যে, মুরীদ আমার দুর্বলতা উপলব্ধি করে বুঝে ফেলেছে, আমি ক'দিন যাবত আনাহারে আছি। তাই আমার জন্য খানার ব্যবস্থা করতে গিয়েছে। ফলে তাঁর অন্তরে খানার প্রতি আগ্রহ দেখা

দিয়েছিল, তার অন্তর খানার প্রতীক্ষায় ছিল। তাঁর সেই আগ্রহ ও প্রতীক্ষার অবস্থাতেই খাবার আনা হয়েছে। তার নজরে হাদীছ ছিল যে, যেই হাদিয়া আগ্রহ ও অপেক্ষার সাথে লাভ হয়, তাতে বরকত থাকে না। তাই তিনি সে খাবার গ্রহণ করতে রাজি হননি। অগত্যা আমি তা ফেরত নিয়ে গেলাম। ফেরত নিয়ে যাওয়ায় তার আগ্রহ ও অপেক্ষাও খতম হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর যখন আবার সেই খাবারই নিয়ে আসি, তখন তার মনে সেই অবস্থা ছিল না। অর্থাৎ হাদিয়া গ্রহণের পক্ষে প্রথমবার যে বাধা ছিল এবার তা নেই, খতম হয়ে গেছে। তাই শায়খ তা কবুল করেছেন।

যা হোক হাদিয়া ও উপহারের সাথে যদি আশা ও প্রতীক্ষা যুক্ত হয়ে যায় বা দাতার নিয়ত সহীহ না থাকে সে নাম-ডাক কুড়ানো ও লোক দেখানোর উদ্দেশেই তা দেয় কিংবা তার প্রতিদান পাওয়ার লালসা দেখা দেয়, তবে তা হাদিয়ার মর্যাদা নষ্ট করে দেয়। এর ফলে হাদিয়ার বরকত ও নূর খতম হয়ে যায়।

হাদিয়া বিনিময় কর; মহব্বত বৃদ্ধি পাবে

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, تَهَادَوْا تَحَابُّوْا তোমরা একে অন্যকে হাদিয়া দাওঃ তাতে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। (মুআত্তা মালিক, হাদীছ নং ১৪১৩)

কিন্তু সে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে তখনই, যখন হাদিয়া দেওয়া হবে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আদায়, আখিরাতের সফলতা অর্জন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্যাদা লাভই উদ্দেশ্য থাকবে। কিন্তু আজকাল আমাদের হাদিয়া ও উপহার বিনিময়ের উদ্দেশ্য এ রকম হয় না। বিবাহাদিতে লক্ষ করে দেখুন তাতে উপহার দেওয়া হয় কী উদ্দেশে? তাতে কেবল প্রথা পালনই থাকে লক্ষবস্তু। রসম-রেওয়াজ ছাড়া কখনও কোন আত্মীয়কে হাদিয়া দেওয়ার তাওফীক হয় না। এমনও ঘটে যে, পুরুষ হয়ত তার কোন প্রিয়জনকে উপহার দিতে চাচ্ছে, কিন্তু স্ত্রী তাকে এই বলে থামিয়ে দেয় যে, এখন নয়। অমুক অনুষ্ঠানে দিলে বেশ সুনাম হবে। এখন দিলে লাভ কী? অহেতুক বোঝা বাড়ানো! অথচ প্রকৃত লাভ এখন দিলেই। কেননা, যখন অন্তরে কোন কৃত্রিমতা থাকে না, কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিলাভের জন্য নিজের কোন আত্মীয় বা প্রিয়জনকে হাদিয়া-তোহ্ফা দেওয়ার আগ্রহ জন্মায়, প্রকৃত দেওয়ার সময় তো সেটাই। তখন হাদিয়া দিলেই সে দেওয়া হয় অমলিন এবং তা হয় বরকতপূর্ণ।

পুণ্যের আগ্রহ জাগা মাত্রই তা করে ফেলা চাই

বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, অন্তরে যখন কোন নেক কাজ করার আগ্রহ দেখা দেয়, তখন যতটা শীঘ্র সম্ভব তা করে ফেলা চাই। বিলম্ব করা ও পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দেওয়া উচিত নয়। কেননা, যেই নেক কাজটি করার আগ্রহ এখন মনে দেখা দিয়েছে এবং যেই ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে দেখা দিয়েছে, কে জানে আগামীকাল পর্যন্ত তা স্থায়ী থাকবে কি না এবং পরিস্থিতিও তখন অনুকূলে থাকবে কি না। তা ছাড়া সব সময় সব কাজ করার সুযোগও তো থাকে না। কাজেই আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া মাত্রই তা করে ফেলা উচিত।

নেক কাজের আগ্রহ আল্লাহর মেহমান

আমাদের হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব (রহ.) বলতেন, সৎকাজের আগ্রহ আল্লাহ তা'আলার মেহমান। সুফী-সাধকদের পরিভাষায় একে 'ওয়ারিদ' বলা হয়। এই 'ওয়ারিদ' বা অনুপ্রেরণা আল্লাহ তা'আলার মেহমান। তুমি এ মেহমানকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিলে সে আবারও আসবে এবং বারবার আসবে। পক্ষান্তরে তুমি তার অসম্মান করলে সে আর আসবে না। অর্থাৎ মনে যখন নেক কাজের ইচ্ছা জাগল, আর তুমি এই বলে তাকে ঝাপটা দিলে যে, রাখ মিয়া, পরে দেখা যাবে, তখন তুমি সে মেহমানের অমর্যাদা করলে, ফলে মেহমান নারাজ হয়ে যাবে। আর কখনও আসবে না। আর যদি তাকে স্বাগত জানাও, সে আগ্রহ মোতাবেক কাজটি করে ফেল, তবে মেহমানকে সম্মানিত করা হবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আবারও তোমার কাছে পাঠাবেন। তখন সেই অনুপ্রেরণা তোমাকে দিয়ে আরও কোন নেক কাজ করিয়ে নেবে। কাজেই যখনই কোন আত্মীয় বা প্রিয়জনকে কোন হাদিয়া ও উপহার দেওয়ার আগ্রহ দেখা দেয়, তখন আর দেরি না করে যথাসম্ভব শীঘ্র তা দিয়ে ফেলুন।

উপহারের মূল্য নয় আবেগই বিবেচ্য

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা হল হাদিয়া-তোহ্ফা হিসেবে কী জিনিস দেওয়া হচ্ছে সে দিকে লক্ষ করো না; বরং কী আবেগের সাথে দেওয়া হচ্ছে তাই দেখ। মহব্বতের সাথে ক্ষুদ্র কোন জিনিসও যদি দেওয়া হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা নাম-ডাকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বহুমূল্যের কোন বস্তু অপেক্ষা হাজার গুণ শ্রেয়।

এক হাদীছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর পাঠানো হাদিয়াকে তুচ্ছ মনে না করে, তা ছাগলের একটা পায়াই হোক না কেন।

(বুখারী, হাদীছ নং ৫৫৫৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৭২৭৪)

অর্থাৎ কী দিল সে দিকে তাকিও না। বরং যেই আবেগ-অনুভূতির সাথে দিয়েছে তা উপলব্ধি কর। যদি মহব্বতের তাগিদে দিয়ে থাকে তবে তার মূল্য বোঝার চেষ্টা কর। কেননা, তা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। পক্ষান্তরে অত্যন্ত মূল্যবান কোন উপহারও যদি কেবল মানুষকে দেখানোর জন্য তোমাকে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে মনে রাখবে তাতে কোন বরকত নেই। সুতরাং আল্লাহর কোন বান্দা তোমাকে ছোট্ট কোন জিনিসও হাদিয়া দিলে তাকে বরকতপূর্ণ মনে করবে এবং সানন্দে গ্রহণ করে নেবে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সাধারণত অল্পদামের জিনিস হাদিয়া দিলে তাতে লোক দেখানো উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্তু দামী জিনিস হাদিয়া দিলে তাতে দেখানোর একটা ব্যাপার থেকে যায়। তাই হাদিয়া হিসেবে ছোট জিনিস দিলে তাকে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়; বরং কদর করা চাই।

হালাল দাওয়াতের বরকত

আমার মহান পিতা হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) ঘটনা শোনাতেন যে, দেওবন্দের এক বুযুর্গ ঘাস কেটে বাজারে বিক্রি করত এবং তার উপার্জন দ্বারা জীবন নির্বাহ করতেন। রোজ আয় হত ছয় পয়সা। তা তিন ভাগে ভাগ করে খরচ করতেন। দু'পয়সা নিজের প্রয়োজনে খরচ করতেন। দু'পয়সা দান-খয়রাত করতেন এবং বাকি দু'পয়সা দারুল-'উলূম দেওবন্দের বড়-বড় বুযুর্গদেরকে দাওয়াত করতেন। তাদের মধ্যে শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান (রহ.) ও হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগূহী (রহ.)-এর মত ব্যক্তিবর্গও থাকতেন। তাঁরা বলতেন, আমরা সারা মাস এই দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকি। অথচ বড়-বড় নবাব রইসের দাওয়াতকেও তারা এভাবে নিতেন না। কারণ, এটা ছিল আল্লাহর এক বান্দার হালাল উপার্জনের আয়োজন। কেবল আল্লাহ তা'আলার মহব্বতেই এ দাওয়াত দেওয়া হত। এতে যে নূরানিয়াত অনুভব করা যেত তা অন্য কোন দাওয়াতে করা যেত না। তারা বলতেন এই আল্লাহর বান্দা দাওয়াত খাওয়ালে কয়েকদিন পর্যন্ত অন্তরে নূর অনুভব হতে থাকে এবং এর ফলে ইবাদত-বন্দেগী ও যিক্‌র-

অধিকারে আগ্রহ বোধ হয়। মোটকথা, ছোট ও মামুলি জিনিস হাদিয়া দেওয়া হলে তাতে সহীহ নিয়ত ও ইখলাস থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সে সম্ভাবনা দামী জিনিসের ক্ষেত্রে অতটা থাকে না। এ জন্যই মামুলি জিনিসের হাদিয়াকে বেশি কদর করা উচিত।

হাদিয়া হিসেবে প্রথাগত জিনিস দিওনা

হাদিয়া দেওয়ার সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল যাতে তা উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। হাদিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য হল তার গ্রহীতাকে খুশি করা এবং এর মাধ্যমে তার আরামের ব্যবস্থা করা। প্রথা পালনের জন্য যে হাদিয়া দেওয়া হয়, তাতে সাধারণত এ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখা হয় না; প্রথা পালনই থাকে মুখ্য বিষয়। গ্রহীতার কোন কাজে আসুক বা না আসুক। যেমন কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মিষ্টি নিয়ে গেল বা এক জোড়া কাপড় দিয়ে দিল ইত্যাদি। প্রথাগত বস্তু ছাড়া কাজে আসে এমন কোন জিনিস দিলে তা নিয়মবিরোধী হয়ে যায়। সে রকম জিনিস দিলে লজ্জা হয়। যেন তা কোন হাদিয়া হল না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে কেবল আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য কোন হাদিয়া দেবে সে প্রথমে সেই ব্যক্তির প্রয়োজন চিন্তা করবে। সে এমন কোন জিনিস দেওয়ার কথাই ভাববে, যা তার কাজে আসে, যা দ্বারা সে আরাম পাবে।

জনৈক বুযুর্গের আশ্চর্য হাদিয়া

হযরত শাহ 'আব্দুল 'আযীয (রহ.) নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। তাবলীগ জামাতের একজন প্রসিদ্ধ লোক। আমার মহান পিতা (রহ.) কে খুব মহব্বত করতেন। মাঝে মধ্যেই দেখা করতে আসতেন। মনে আছে, তিনি যখন আব্বাজীর সাথে দেখা করতে আসতেন আশ্চর্য-আশ্চর্য জিনিস হাদিয়া নিয়ে আসতেন। কাউকে এরকম হাদিয়া দিতে দেখিনি। কখনও কাগজের দিস্তাও নিয়ে আসতেন এবং আব্বাজীকে হাদিয়া দিতেন। এমন হাদিয়া তাঁকে কেউ কখনও দিত না। কিন্তু তিনি জানতেন, হযরত মুফতী ছাহেব (রহ.)-এর কাগজ খুব দরকার হয়। সর্বক্ষণ লেখেন। এটা তার কাজে আসবে। তিনি লেখার যে নেক কাজ করবেন তাতে আমারও একটা অংশীদারিত্ব থেকে যাবে এবং আমিও ছওয়াব পাব। কখনও কালির দোয়াত এনে হাদিয়া দিত। ভাবুন তো যে ব্যক্তি দেখানোর উদ্দেশ্য হাদিয়া দেবে সে কি কখনও কালির দোয়াত হাদিয়া দেবে? কিন্তু হাদিয়া দ্বারা যার লক্ষবস্তু আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করা, যার দৃষ্টি থাকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির খেদমত করা, তার অন্তর কিন্তু এরূপ জিনিসের

দিকেও যাবে। এর পরিবর্তে যদি মিষ্টি দেওয়া হত, তবে আব্বাজীর তা কোন কাজে আসত না। তিনি মিষ্টি খেতেন না। কাজেই তা অন্যকে দিয়ে দিতে হত। মোটকথা, হাদিয়া দেওয়ার জন্য বুদ্ধিরও দরকার আছে।

হাদিয়া দেওয়ার জন্য বুদ্ধিও দরকার

এটা ছিল উপহার ও হাদিয়া-তোহ্ফার কথা। এ ছাড়াও আত্মীয়-স্বজনের বহু হক আছে, যেমন কারও দুঃখ-বেদনায় সহমর্মী হওয়া, কারও কোনও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা দান করা ইত্যাদি। এতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা হল, আত্মীয়-স্বজনের জন্য যে কাজই কর না কেন তা কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিবিধান কল্পেই করবে। আমার গুণগান করবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে বা প্রতিদান দেবে এ জাতীয় চিন্তা একদম করবে না। তা যদি কর, তবে কাজ করলে, কষ্টও করলে অথচ ছওয়াব তো পেলেই না। দুনিয়ার কোন আনন্দও লাভ হবে না।

আত্মীয়-স্বজন কি বিচ্ছুতুল্য?

আমাদের সমাজে দৃষ্টিভঙ্গিগত ত্রুটির কারণে একটা ভ্রান্ত আরবী প্রবচন চালু আছে। বলা হয়ে থাকে,

اَلْاَقَارِبُ كَالْعَقَارِبِ

'আত্মীয়-স্বজন হল বিচ্ছুতুল্য'। অর্থাৎ বিচ্ছু যেমন সর্বক্ষণ দংশন করে বেড়ায় আত্মীয়-স্বজনও তেমনি সুযোগ পেলেই হুল ফোটানোর চেষ্টা করে। কখনও খুশি হতে চায় না। এ প্রবচন চালু হয়েছে মূলত নিয়ত সহীহ না থাকার কারণে। যারাই আত্মীয়-স্বজনের কোন উপকার করে, তাতে বদলা পাওয়ার একটা আশা থাকে। নিয়ত যদি ভালো থাকত, অর্থাৎ এই উদ্দেশ্যে উপকার করা হত যে, এটা আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত, তবে মানুষ চিন্তা করত, আত্মীয়-স্বজন প্রতিদান দিক বা না দিক আসল প্রতিদানদাতা আল্লাহ তা'আলা তো আছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে করলে তিনি অবশ্যই ছওয়াব ও প্রতিদান দেবেন। আসল মজা তো এতেই যে, তুমি আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, আর তাদের দিক থেকে কোন সাড়া পাবে না; বরং বিপরীত আচরণ পাবে। কিন্তু তারপরও তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে যাবে, যেহেতু যার জন্য করছ সেই মহাদাতা তো রয়েছেন। তিনি ঠিকই প্রতিদান দেবেন। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'আত্মীয়তা রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি নয়, যে প্রতিদানের অপেক্ষায় থাকে; বরং প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে, যার আত্মীয় তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেও সে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।

আত্মীয়দের সাথে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যবহার

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখুন। তিনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? জনা কয়েক ছাড়া সকল আত্মীয় ছিল তাঁর প্রাণের শত্রু, তাঁর রক্তপিপাসু। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার কোন পন্থাই তারা বাকি রাখেনি। এমনকি উৎপীড়কদের মধ্যে যারা অগ্রণী ভূমিকা রাখছিল, তাদের মধ্যে তাঁর চাচা ও চাচাতো ভাই পর্যন্ত ছিল। কিন্তু আত্মীয়তার হক আদায়ে তাঁর দ্বারা কখনও কোন ত্রুটি হয়নি। পরিশেষে মক্কাবিজয়কালে যখন প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ আসে, তখনও তিনি সকলকে ক্ষমা করে দেন এবং ঘোষণা করে দেন, যে ব্যক্তি পবিত্র হারামে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি আবূ সুফয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ। তিনি কারও থেকে কোন প্রতিশোধ নেননি এবং কারও থেকে তাঁর সদ্ব্যবহারের কোন প্রতিদান পাওয়ারও আশা রাখেননি। সুতরাং আত্মীয়দের দুর্ব্যবহারের জবাবে ভালো ব্যবহার করাও সুন্নত এবং ভালো ব্যবহারের বদলা দেওয়াও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত।

মাখলূক থেকে প্রাপ্তির আশা খতম করে দিন

এ কারণেই হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহ.) তাঁর 'মাওয়া'য়েয'-এ অভিজ্ঞতালব্ধ অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন, তিনি বলেন, 'দুনিয়ায় আরামে থাকার কেবল একটাই ব্যবস্থা। তা হল মাখলূক থেকে প্রাপ্তির আশা খতম করে দেওয়া'।

অমুক আমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, অমুক আমার কোন উপকার করবে, অমুক আমার দুঃখ-বেদনায় শরীক থাকবে-এবংবিধ আরও যত আশা আছে, মন থেকে তা চিরতরে মুছে ফেলুন। আশা রাখুন কেবল একই সত্তা আল্লাহ তা'আলার কাছে। মাখলূক থেকে সব রকম প্রাপ্তির আশা মন থেকে মুছে ফেলার পর, তাদের থেকে ভালো কিছু লাভ হলে তা অপ্রত্যাশীতভাবে লাভ হবে। তাতে আনন্দও বেশি হবে। পক্ষান্তরে মাখলূকের পক্ষ হতে কোন আঘাত পেলে তাতে কষ্টও কম হবে। যেহেতু তাদের দিক থেকে সুখের

আশায় বুক বাঁধা ছিল না। বরং কষ্ট পাওয়ার আশাই ছিল। কাজেই কষ্ট যা পাওয়া গেছে তা আশানুরূপই হয়েছে। তাই সে কষ্ট অসহ্যবোধ হবে না। ভালো ব্যবহারের আশা যেখানে থাকে, সেখান থেকে দুর্ব্যবহার পেলে বেদনা খুব বেশিই বোধ হয়। কারণ, আশা ছিল এক, পাওয়া গেছে আরেক। তাই আশা ছাড়া যা কিছুই ভালো পাওয়া যাবে সব বোনাস মনে হবে।

দুনিয়া কেবল দুঃখই দেয়

দুনিয়ার কাজই হল কেবল দুঃখ দেওয়া। কখনও কোন সুখ ও আনন্দ লাভ হলে বুঝতে হবে তা আল্লাহর বিশেষ দান। আর দুঃখ পাওয়া গেলে বুঝতে হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই তাতে ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই, মনের মাঝে এ বিষয়টা গেঁথে নিলে এবং এ অনুযায়ী কাজ করলে অভিযোগ-আপত্তি সব খতম হয়ে যাবে। অভিযোগ-অনুযোগ তো আশা থেকেই জন্ম নেয়। আশাই যদি রাখতে হয়, তবে আল্লাহর কাছেই রাখা চাই এবং তা রাখতেই হবে। মাখলূক থেকে নিরাশ হতে পারলে ইনশাআল্লাহ জীবন আনন্দময় হয়ে যাবে।

আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা

আমাদের গুরুজন এই ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। আমি তা আপনাদের জানিয়ে দিলাম, আপনারাও শুনে নিলেন। কিন্তু কেবল বলা ও শোনার দ্বারাই কিছু হয়ে যায় না। অন্তরে এ কথা বসিয়ে নিতে হবে। বারবার চর্চা করতে হবে। বারবার নিজের হিসাব নিতে হবে। কার কাছে আশা করে বসে আছি, কেন আশা করছি, সে আশা কেন আল্লাহ তা'আলার কাছে করলাম না এসব কিছু খতিয়ে দেখতে হবে।

আপনি আল্লাহরওয়ালাদের দেখে থাকবেন, তারা সর্বদা খুশি থাকেন, আনন্দের ভেতর দিন কাটান। বড়-বড় মসিবত আসে, তাতে কষ্ট পান, দুঃখ বোধও করেন, কিন্তু সে দুঃখ তাদের উপর চেপে বসে না। সে দুঃখ তাদেরকে অস্থির-উতলা করে তোলে না। কারণ, তারা নিজ মালিকের সাথে নিজেদের জুড়ে রেখেছেন। দৃষ্টি তাদের মাখলূকের দিকে নয়। মাখলূকের কাছে কোন আশা নেই, তাদের কাছে কোন চাওয়া নেই। যা-কিছু আশা করেন, যা-কিছু চান সবই আল্লাহ তা'আলার কাছে। এরই ফলে তারা সর্বক্ষণ স্বস্তি বোধ করেন, প্রশান্তিতে থাকেন।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) লিখেছেন, জনৈক বুযুর্গকে কেউ জিজ্ঞেস করল, হযরত কেমন আছেন? উত্তর দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো। তারপর বললেন, মিয়া! যার মরজির বাইরে জগতের কোনও কিছুই ঘটে না, তার অবস্থা কী জিজ্ঞেস করছ? অর্থাৎ আমি এমনই এক ব্যক্তি যে, জগতের কোনও কাজ আমার ইচ্ছার বিপরীত হয় না। যা-কিছু হয় আমার ইচ্ছা মোতাবেক হয়। আর জগতের সব কিছুই যার মরজি মোতাবেক হয় তারচে' বেশি সুখে আর কে থাকতে পারে?

প্রশ্নকর্তা তো তাজ্জব। সে বলল, এত বড় মর্যাদা তো নবীগণেরও লাভ হয়নি যে, তাদের ইচ্ছামত জগতের সব কিছু ঘটবে। বরং তাদের ইচ্ছা-মরজির বিপরীতও অনেক কিছুই ঘটত। তা আপনার এই শান কি করে হল যে, সব কিছুই আপনার ইচ্ছামত হয়?

বুযুর্গ জবাব দিলেন, ভাই আমি আমার মরজিকে আল্লাহ তা'আলার মরজির অধীন করে দিয়েছি। ব্যস আমার আল্লাহর যা ইচ্ছা হয়, আমারও তাই ইচ্ছা। তিনি যা চান, আমিও তাই-ই চাই। জগতের প্রতিটি বিষয় আল্লাহ তা'আলার মরজি মত হয়, আমি যেহেতু আমার আমিত্বকে মিটিয়ে দিয়েছি তাই প্রতিটি কাজ আমারও মরজি মত হচ্ছে, যেহেতু তা আল্লাহর মরজি মত হচ্ছে। তাই আমি বড় সুখে আছি, বড় আরামে দিন কাটাচ্ছি।

বুযুর্গদের স্বস্তি ও শান্তির রহস্য

মোটকথা, বুযুর্গানে দ্বীন বড় আরাম ও স্বস্তির জীবন যাপন করেন। সুফ্য়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, দুনিয়ার রাজাবাদশাগণ যদি আমাদের আরাম-আয়েশের খোঁজ পেত, তবে তারা তরবারি নিয়ে আমাদের উপর হামলে পড়ত ও দাবি জানাত, এই আরাম-আয়েশ আমাদেরকে দিয়ে দাও। বস্তুত মাখলূক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে দৃষ্টি আল্লাহতে নিবদ্ধ করার দ্বারাই এ স্বস্তি ও শান্তি অর্জিত হয়। পরীক্ষা করেই দেখুন না! কিন্তু বলাবাহুল্য, এটা কেবল শোনার দ্বারাই হাসিল হয়ে যায় না। এর জন্য আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য চাই। তাদের সাহচর্য হল পরশ পাথর। তার ঘর্ষণে মানুষের জীবনদৃষ্টিতে বিপ্লব ঘটে। ক্রমে তার কাজ-কর্ম বদলে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তার দুনিয়া ও আখিরাত সম্পূর্ণরূপে শুধরে যায়।

সারকথা, আত্মীয়-স্বজনের যাবতীয় হক আদায়ে সচেষ্ট থাকা দ্বীনের অপরিহার্য অংগ। সে হক আদায় ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহারে নিয়ত খালেস

থাকা শর্ত। মানুষকে দেখানোর জন্য বা প্রথা পালনের জন্য করলে দ্বীনরূপে গণ্য হবে না, ছওয়াবও পাওয়া যাবে না। করতে হবে কেবল আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার লক্ষ্যে। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাকে ও এবং আপনাদের সকলকেও যথাযথভাবে বোঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ইসলাহী খুতুবাত; ৮ খণ্ড, ১৭২-১৯৫ পৃষ্ঠা

সম্পর্ক রক্ষার শিক্ষা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوْزٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ اَنْتُمْ كَيْفَ حَالُكُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ بَعْدَنَا؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! فَلَمَّا خَرَجَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُقْبِلُ هٰذِهِ الْعَجُوْزَ هٰذَا الْاِقْبَالَ؟ فَقَالَ: يَاعَائِشَةُ! اِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِيْنَا زَمَانَ خَدِيْجَةَ وَاِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْاِيْمَانِ

হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা বলেন, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক বৃদ্ধা আসলে তিনি বললেন, তোমরা কেমন আছ? তোমাদের অবস্থা কী? আমাদের পরে তোমরা কেমন ছিলে? (এভাবে তিনি তাকে খুব সম্মান করলেন, আন্তরিক সংবর্ধনা জানালেন এবং প্রাণভরে আদর-যত্ন করলেন)। বৃদ্ধা চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই বৃদ্ধাকে এতটা সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন ? (তা কে এই ভদ্রমহিলা?) তিনি বললেন, হে 'আয়েশা! খাদীজার জীবদ্দশায় আমাদের বাড়িতে এর যাতায়াত ছিল (হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে তার সম্পর্ক ছিল ঠিক সখীমত। এ জন্যই আমি তাকে এরূপ সম্মান দেখিয়েছি। তারপর বললেন) সম্পর্কের প্রতি যত্নবান থাকাও ঈমানের অংশ।

(কানযুল-'উম্মাল, ১৩খ, ৬৬৭,হাদীছ নং ৩৭৭৬৮; বায়হাকী, শু'আবুল-ঈমান, ৬ খ, ৫১৭ পৃ; হাদীছ নং ৯১২২)

সম্পর্ক রক্ষায় যত্নবান থাকা বাঞ্ছনীয়

অর্থাৎ কারও সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হলে তা যথাসম্ভব ভাঙতে না দেওয়া এবং তা রক্ষায় যত্নবান থাকা মু'মিনের কর্তব্য, তা রক্ষা করতে গিয়ে নিজ মন-মানসিকতায় চাপ পড়লেও। কোনওক্রমেই প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে তিক্ত

করা চলবে না। কারও সাথে মন-মানসিকতার মিল না থাকতে পারে। তাই বলে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। বড় জোর তার সাথে মেলামেশার মাত্রা কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এমনভাবে ভেঙে ফেলার অবকাশ নেই যে, সালাম-কালাম, দেখা-সাক্ষাত, কথাবার্তা সব বন্ধ। কেননা, একজন মু'মিনের পক্ষে এটা কিছুতেই সমীচীন নয়।

গত হয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের বন্ধু-বান্ধবকেও মূল্যায়ন করা কর্তব্য

এ হাদীছে আমাদের জন্য দু'টি শিক্ষা আছে। প্রথম শিক্ষা হল মরহুম প্রিয়জনদের বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কিত। অর্থাৎ যাদের সাথে সরাসরি নিজের সম্পর্ক আছে, কেবল তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং নিজের যে সকল প্রিয়জন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সম্পৃক্তজনদের সাথেও যোগাযোগ রাখতে হবে। কারও হয়ত বাবা বা মা কিংবা স্ত্রী মারা গেছেন, কিন্তু তাদের সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল এমন অনেকেই বেঁচে আছে। আপনার কর্তব্য তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলা।

হাদীছ শরীফে আছে, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতার ইন্তিকাল হয়ে গেছে, তিনি জীবিত থাকতে আমি তার বিশেষ খেদমত করতে পারিনি, তাঁর হক যথাযথভাবে আদায় করিনি (সেজন্য আমার মনে আক্ষেপ রয়ে গেছে)। এখন আমি কী করতে পারি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার পিতার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন যারা জীবিত আছে, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। (আবু দাউদ, হাদীছ নং ৫১৪২)

যারা পিতামাতার জীবদ্দশায় তাদের খেদমত করে না, তাদের অন্তরে এ ধরনের আক্ষেপ ও অনুশোচনা দেখা দেয়, যেমন ওই সাহাবীর দেখা দিয়েছিল। এ হাদীছ দ্বারা তাদের সে আক্ষেপ দূর করা ও ত্রুটির প্রতিকার করার একটা ব্যবস্থা জানা গেল। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দান করলেন যে, তোমার পিতার বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ নাও, তাদের যতটুকু পার খেদমত কর। এর ফলে তোমার পিতার আত্মা খুশি হবে। তুমি তোমার পিতার সম্মান ও সেবায় যে ত্রুটি করেছিলে ইনশাআল্লাহ তার কিছু না কিছু প্রতিকার হয়ে যাবে। সুতরাং পিতামাতা ও নিজ সংশ্লিষ্টজনদের মৃত্যুর পর তাদের সংশ্লিষ্টজনদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও তাদের প্রতি

সদ্ব্যবহার করাও ঈমানের দাবি। এমন তো নয় যে, যিনি মারা গেছেন সংশ্লিষ্টজনদেরও সাথে নিয়ে গেছেন। তারা তো দুনিয়াতেই রয়ে গেছেন। আপনি তাদের যতটুকু সম্ভব খেদমত করুন। এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল কতকাল আগে। তা সত্ত্বেও তার একজন সখীকে তিনি এতটা সম্মান দেখিয়েছেন। কোন কোন হাদীছে আছে, তিনি হযরত খাদীজাতুল-কুবরা (রাযি.)-এর সখীদের কাছে হাদিয়া-তোহফাও পাঠাতেন। এর কারণ তো কেবল এতটুকু ছিল যে, নিজ প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। তারা তাঁর সখী ও বান্ধবী ছিলেন।

সুসম্পর্ক রক্ষায় যত্নবান থাকা সুন্নত

এ হাদীছের দ্বিতীয় শিক্ষা হল حُسْنُ الْعَهْدِ অর্থাৎ একবার যখন কারও সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তখন যতদূর সম্ভব এ সম্পর্ককে রক্ষা করে চলা, নিজের পক্ষ থেকে তা ছিন্ন না করা। অপর পক্ষ থেকে তোমার সাথে যদি দুর্ব্যবহারও করা হয় এবং তোমাকে কষ্টও দেওয়া হয়, তবুও নিজের পক্ষ হতে ভালো ব্যবাহারের মাধ্যমে সে সম্পর্ক অটুট রাখা। এর জন্যে দরকার দৃষ্টিভঙ্গির নির্মাণ। অর্থাৎ চিন্তা করতে হবে এভাবে যে, প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে অটুট রাখার চেষ্টা করা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত এবং সে হিসেবে এ চেষ্টা দ্বারা 'ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যাবে।

সুসম্পর্ক রক্ষার এক বিরল ঘটনা

আমার মহান পিতা হযরত মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-এর সাথে বহু লোকেরই সম্পর্ক ছিল। তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও ছিলেন, যিনি এমনিতে তো বড় ভালো লোক ছিলেন, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক থাকে, যাদের সব কিছুতেই আপত্তি তোলার অভ্যাস। কারও সাথে সাক্ষাত হলে তারা তার সম্পর্কে কোনও না কোনও আপত্তি তুলবেই। হয় তার কোন আচরণের নিন্দা করবে, নয় তো কোন কথায় প্রশ্ন তুলবে। মোটকথা, একটা না একটা সমালোচনা তাকে করতেই হবে। এই ব্যক্তির মধ্যেও সেই প্রবণতা ছিল। এ কারণে তার দ্বারা মানুষকে খুব বিব্রত হতে হত। একবার অভ্যাসমত তিনি আমার সাথেও এমন একটা কথা বললেন, যা সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তখনকার মত তো আমি হজম করে নিলাম, কিন্তু তার সম্পর্কে

আমার এই মনোভাব তৈরি হয়ে গেল যে, সম্ভবত এই ব্যক্তির নিজ অর্থবিত্তের অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। তাই কাউকে চোখে লাগে না। আমার প্রতি এ আচরণ তার সে কারণেই। সুতরাং একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ফিরে এসে একটা চিঠি লিখলাম। খুব তীব্র ভাষায়। লিখলাম, আপনার স্বভাবের ভেতর এই বিষয়টা আছে, যে কারণে আপনার সম্পর্কে মানুষের অভিযোগ থাকে। আজ আমার সাথেও আপনি এ রকম একটা আচরণ করলেন, যা আমার পক্ষে অসহনীয় বোধ হয়েছে। সুতরাং এখন থেকে আপনার সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না।

তবে আলহামদুলিল্লাহ, আমার সর্বদা নিয়ম ছিল-এ জাতীয় কোন ব্যাপার দেখা দিলে প্রথমে আব্বাজীর সামনে তা অবশ্যই পেশ করতাম। সুতরাং চিঠিটি লেখার পর প্রথমে সেটি আব্বাজীকে দেখালাম এবং পূর্ণ বৃত্তান্ত তাকে জানালাম। বললাম, সে সর্বদা সকলের সাথেই এ রকম আচরণ করে। আজ আমার সাথেও করল, ব্যাপারটা আমার সহ্যের বাইরে চলে গেছে।

তখন যেহেতু আমি উত্তেজিত অবস্থায় ছিলাম, তাই তিনি তখন এ নিয়ে কোন মন্তব্য করলেন না। চিঠিটি রেখে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, পরে এ নিয়ে কথা বলব। একদিন পর তিনি আমাকে ডাকালেন। বললেন, তোমার চিঠিটি আমি পড়েছি। তা এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? উত্তর দিলাম, আমার উদ্দেশ্য এ চিঠি পাঠিয়ে তার সাথে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেওয়া। আব্বাজী বললেন, দেখ, কারও সাথে সম্পর্ক ঘুচানো খুব সহজ। যখনই ইচ্ছা ঘুচাতে পারবে। এর জন্য কোন সময় লাগে না। কোন দীর্ঘসূত্রিতা নেই। লম্বা-চওড়া কোন কাজ নেই। কিন্তু সম্পর্ক গড়া অত সহজ নয়। চাইলেই তা হয়ে যায় না। কাজেই তাড়াহুড়ার কি আছে। এ চিঠি এখনই পাঠাতে হবে এমন কোন কথা নেই। আরও কিছুদিন দেখ। হ্যাঁ মিশতে মনে না চাইলে তার কাছে যেও না। কিন্তু এভাবে চিঠি লিখে, ঘোষণা দিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করার কী দরকার। এটা তো নিজের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানো হল।

একবার কখনও কারও সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যথাসম্ভব তা রক্ষা করে চল। সম্পর্ক ভাঙা সহজ। কিন্তু গড়া বড় কঠিন। তার সাথে তোমার মন-মানসিকতায় না বনলে সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে যাতায়াত করার দরকার নেই। না মিললে যেও না। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ছিন্নও করো না। তারপর আরেকটা চিঠি বের করে দেখালেন, যেটি তার নিজের লেখা। বললেন, এটি আমি লিখেছি পড়ে দেখ এবং তোমার চিঠির সাথে এটি মেলাও। তোমারটি ছিল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য। আর তাতে তুমি যে সব

অভিযোগ করেছিলে, দেখ এ চিঠিতে আমিও তা উল্লেখ করেছি। এটাও লিখেছি যে, তার আচরণ তোমাকে ক্ষুব্ধ করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সবকথাই এসে গেছে। কিন্তু এ চিঠি সম্পর্ক ছিন্ন করেনি।

আমি আব্বাজীর চিঠিখানি নিয়ে পড়লাম, সত্যিই তাঁর ও আমার চিঠিতে আসমান-যমীনের প্রভেদ ছিল। আমি আবেগ ও উত্তেজনা বশে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করেছিলেন। তিনি চিঠি লিখেছিলেন সুসম্পর্ক রক্ষার তাগিদে। তাতে যে অভিযোগ করার ছিল তাও করা হয়েছিল, তার যে আচরণ পসন্দনীয় ছিল না জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সম্পর্কচ্ছেদের যে ব্যাপারটা ছিল তা তিনি কেটে দিলেন।

তিনি বললেন, দেখ, এটা পুরানো সম্পর্ক। তার সাথে যে সম্পর্ক, তা আমার নিজের গড়া নয়; আমার পিতার সময় থেকে চলে আসছে, তার পিতার সাথে আমার পিতার সম্পর্ক ছিল। এমন পুরানো সম্পর্কে মুহূর্তের মধ্যে কেটে শেষ করে দেওয়া কোন ভালো কথা নয়।

ধ্বংস সহজ, কিন্তু নির্মাণ বড় কঠিন

যা হোক আব্বাজী (রহ.) বড় মূল্যবান কথা বলেছিলেন। 'সম্পর্ক ভাঙ্গা খুব সহজ, কিন্তু গড়া বড় কঠিন। তাঁর এ বাক্যটি আজও আমার অন্তরে অঙ্কিত হয়ে আছে। একটি স্থাপনা দাঁড়িয়ে আছে। আপনি যদি সেটি ধ্বংস করে দিতে চান, দু'দিনের মধ্যেই তা করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু যখন নির্মাণ শুরু করবেন, কয়েক বছর লেগে যাবে। যে-কোনও নির্মাণই এরকম। একটা সম্পর্ক নির্মাণ করতে অনেক দিন লাগে। খুব কঠিন কাজ। কিন্তু তা ভেঙে ফেলা খুব সহজ। মুহূর্তের কাজ। কাজেই সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে তার আগে হাজার বার ভেবে নাও। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছে–

وَاِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْاِيْمَانِ

'সুম্পর্ক রক্ষা করা ঈমানের দাবি'।

কোন সম্পর্ক কষ্টের কারণ হলে

কোনও কোনও সম্পর্কের কারণে কষ্ট পাওয়াও অসম্ভব নয়। আপনি যদি সে রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, তবে বিষয়টাকে এভাবে নিতে পারেন যে, অপর পক্ষ দ্বারা আপনার যত কষ্ট হবে, সেই পরিমাণে আপনার গুনাহ মাফ

হবে, সেই সঙ্গে মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ রয়েছে,

'কোন মু'মিনের পায়ে একটা কাঁটা ফুটলেও তাতে তার জন্য ছওয়াব লেখা হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়'।

(বুখারী হাদীছ নং ৫২০৯; মুসলিম হাদীছ নং ৪৬৬৪)

সুতরাং কারও দ্বারা যদি দুঃখ-কষ্ট পান আর তাতে আপনি সবর করেন, তাতে আপনার অনেক লাভ। প্রভূত ছওয়াব আপনার আমলনামায় লেখা হয়। সেই সাথে যদি وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ -এই হাদীছের উপর আমল করারও নিয়ত থাকে, তবে তো সুন্নাতের অনুসরণ করার কারণে ছওয়াব আরও বেড়ে যায়।

দুঃখ কষ্টে সবরের প্রতিদান

ইহজগতে যত দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, তা এখানেই থেকে যাবে। মাত্র ক'দিনেরই ব্যাপার। কিন্তু এ কারণে যে ছওয়াব অর্জিত হয়, আপনি তা সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা যে ছওয়াব ও প্রতিদান দেবেন তা দু'দিনের এ দুঃখ-কষ্টের তুলনায় কত যে বেশি তা তো অনুমান করাও সম্ভব নয়। সে প্রতিদানের বিপরীতে এসব দুঃখ-কষ্ট কোন হিসাবেই আসে না। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা যখন সবরকারীদেরকে তাদের সবরের প্রতিদান দেবেন, তখন দুনিয়ায় যারা আরাম-আয়েশে ছিল তারা আক্ষেপ করে বলবে, আহা, দুনিয়ায় যদি আমাদের শরীরের চামড়া কাঁচি দ্বারা কেটে নেওয়া হত আর আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করতাম, তবে আমরাও তো ওই ধৈর্যধারণকারীদের মত পুরস্কার লাভ করতে পারতাম।

(আল-মু'জামুল-কাবীর, ৮ খ, ৬৬ পৃ, হাদীছ নং ৮৬৮৯;
কানযুল-'উম্মাল, ৩খ, ৩০৩ পৃ. হাদীছ নং ৬৬৬০)

সুসম্পর্ক রক্ষার অর্থ

সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলার অর্থও বুঝে নেওয়া দরকার। সহজ কথায় এর অর্থ হল, সম্পৃক্ত ব্যক্তির হক আদায় করা এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা। এর জন্য মন-মানসিকতার মিল থাকা জরুরি নয়। এমন কোন কথাও নেই যে, তাকে মনে ধরতে হবে, তার ব্যাপারে মনে কোন খটকা থাকতে পারবে না, দিনরাত তার সাথে ওঠাবসা করতে হবে এবং সর্বদা মেলামেশা,

কথাবার্তা, হাসি-তামাশা বজায় রাখতে হবে। সম্পর্ক রক্ষার জন্য এর কোনওটি শর্ত নয়। বরং শরী'আতসম্মত হকসমূহ আদায় করাই এর জন্য যথেষ্ট। কাজেই কারও সাথে মনের মিল না থাকলেও জবরদস্তি গিয়ে তার সাথে মুলাকাত করতে হবে-এরকম কোন বাধ্যবাধকতা আপনার নেই। কেউ আপনাকে জোর করছে না যে, মহব্বত না থাকা সত্ত্বেও মনের বিরুদ্ধে গিয়ে তার সাথে বসে থাকতে হবে। কেবল তার হক আদায় করুন এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে বিরত থাকুন। ব্যস হাদীছ,

وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ -এর অর্থ এতটুকুই।

সুন্নত পরিত্যাগের পরিণাম

বর্তমানে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ বড় ক্ষত-বিক্ষত। দিনরাত পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে। মূলত এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত তরকের পরিণাম। তাঁর শিক্ষা পরিত্যাগেরই কুফল আমরা ভোগ করছি। এর আগের বয়ানে বিবৃত হাদীছ এবং আজকের পঠিত হাদীছ এ দু'টি হাদীছই যদি আমরা বুঝতে পারি এবং এর অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে যাই, তবে এর দ্বারাই সামাজিক হাজারও দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান হতে পারে। এর সারকথা হল, ভালোবাস তো মাত্রাজ্ঞানের সাথে ভালবাস এবং মনোমালিন্য দেখা দেয় তো তাতেও মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দাও। সমগ্র শরী'আতেরই প্রাণবস্তু হল এই পরিমিতিবোধ। কোথাও সীমালংঘন করো না। সব কিছুতে মাত্রা রক্ষা করে চলো। আর যখন কারও সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেই সম্পর্ককে সুন্দরভাবে রক্ষা করে চলো। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এর উপর 'আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ইসলাহী খুতুবাত: ১০ খণ্ড, ৯৮-১০৬ পৃষ্ঠা

পারিবারিক কলহ ও তার সমাধানের উপায়

পারিবারিক কলহের প্রথম সমাধান
পারস্পরিক মিল-মহব্বত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ . اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ : اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

'হযরত আবুদ-দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেব না, যা রোযা, নামায ও সদাকা অপেক্ষাও উত্তম? তারা বললেন, অবশ্যই বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন, আপসের মধ্যে মিল-মীমাংসা করা। আর আপসের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদই হল ধ্বংসাত্মক।

(আবূ-দাঊদ, হাদীছ নং ৪২৭৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৬২৩৬; মু'আত্তা মালিক, ১৪০৫)

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবুদ-দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অত্যন্ত উঁচু স্তরের আল্লাহওয়ালা ছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপাধি দিয়েছিলেন,

حَكِيْمُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ এই উম্মতের হাকীম-প্রাজ্ঞজন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে গভীর জ্ঞানবত্তা দান করেছিলেন।

(ইবন বাত্তা:, আল-ইবানা:, ১খ, ১০৩ পৃ. ক্রমিক নং ৯৮)

প্রশ্নের মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি

তো এই আবূদ-দারদা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি

কি তোমাদেরকে এমন এক আমলের কথা বলে দিব না, যা রোযা, নামায ও সদাকা অপেক্ষাও উত্তম?

এটা ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বাকশৈলী। কোন বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরার ইচ্ছা থাকলে তিনি নিজেই সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করতেন, যাতে তাদের অন্তরে সেই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ জন্ম নেয়। অন্তরে যখন আগ্রহ থাকে, তখন যে কথা বলা হয় তার আছর ভালো হয়। আর মনে যদি আগ্রহ না থাকে, তবে যত ভালো কথাই বলা হোক, যত উত্তম ব্যবস্থাই দেওয়া হোক আর যত কল্যাণকর শিক্ষাই দেওয়া হোক তা কোন কাজে আসে না। কাজেই আগ্রহ ও চাহিদা বড় মূল্যবান জিনিস একেই তলব বলে।

দ্বীনের তলব ও চাহিদা সৃষ্টি করুন

এ কারণেই বুযুর্গগণ বলেন, অন্তরে দ্বীনের তলব ও দ্বীনী বিষয়ে আমল করার আগ্রহ সৃষ্টির মধ্যেই মানুষের সফলতা নিহিত। এ আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবারিত সাহায্য লাভ হতে থাকে। এটাই আল্লাহ তা'আলার নীতি। মাওলানা রূমী বলেন,

آب کم جو تشنگی آور بدست
تا بجوشد آب از بالا و پست

'অর্থাৎ পানি কম খোঁজ, বরং যত পার তৃষ্ণা জন্মাও, তৃষ্ণা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন উপর-নীচ সব দিক থেকে পানির বান ছোটে। এটাই আল্লাহ তা'আলার নিয়ম। কাজেই তলব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের অন্তরে তা সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

তলব থেকেই অস্থিরতা জন্মায়

একবার মানুষের অন্তরে যখন এ তলব সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন আর তা তাকে শান্তিতে বসতে দেয় না। তাকে সর্বক্ষণ অস্থির করে রাখে। যতক্ষণ না উদ্দেশ্য পূরণ হয়, ততক্ষণ সে অস্থিরতার জ্বালায় জ্বলতে থাকে। ক্ষুধা দ্বারাই উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ক্ষুধা হচ্ছে খাদ্যের তলব – খাওয়ার আগ্রহ ও চাহিদা। কারও যখন ক্ষুধা পায়, তখন কি সে আরামে বসে থাকে? তখন কি কোন কাজের ইচ্ছা হয়? যখন খাদ্যের তলব দেখা দেয়, তখন যতক্ষণ না খাদ্য পাওয়া যায়, ততক্ষণ কেউ স্থির হতে পারে না। তেমনি কারও পিপাসা

লাগলে সেও পানি না পাওয়া পর্যন্ত স্থির হতে পারে না। পিপাসা হল পানির তলব। এই তলবে মানুষ পানির জন্য ছটফট করতে থাকে। যখন সে পানি পায় ও পিপাসা নিবারণে সক্ষম হয়, কেবল তখনই সে শান্ত হতে পারে।

অনুরূপ কারও অন্তরে যখন দ্বীনের তলব দেখা দেয়, সেও দ্বীন অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ছটফট করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে দ্বীনের সেই তলব সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

সাহাবায়ে কিরাম ও দ্বীনের তলব

সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা এরকমই ছিল। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই দ্বীনের প্রচন্ড তলব ছিল। মৃত্যুর পর আমার কি অবস্থা হবে? আল্লাহ তা'আলার সামনে তো হাজির হতে হবে। তারপর হয় জান্নাত, নয়ত জাহান্নাম। আমি তো জানি না আমার পরিণতি কী? এসব চিন্তা তাদেরকে সর্বক্ষণ অস্থির করে রাখত। সেই অস্থিরতার কারণেই তারা মামুলি কাজেও দ্বীনের নির্দেশনা খুঁজতেন। কেননা, জানা তো নেই সে কাজ আল্লাহ তা'আলার মরজি মোতাবেক হচ্ছে কি না? এমন ও তো হতে পারে যে, কেবল সেই এক কাজের পরিণতিতেই জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে।

হযরত হানজালা (রাযি.)-এর আখিরাত-চিন্তা

একদিন হযরত হানজালা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাজির হলেন। বেজায় পেরেশান! আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! نَافَقَ حَنْظَلَةُ 'হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে'। অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে বললেন,আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে মুনাফিক হলে? তিনি বললেন, আমি যখন আপনার মজলিসে বসা থাকি তখন তো আখিরাতের চিন্তা থাকে। মনে হয় জান্নাত ও জাহান্নাম নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। ফলে মন খুব নরম থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত-আনুগত্যের স্পৃহা প্রবল থাকে। কিন্তু যখন আপনার মজলিস থেকে চলে যাই এবং পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হই, তখন দিলের সে অবস্থা বাকি থাকে না। তাই মনে হয়, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি, যেহেতু আপনার সামনে এক অবস্থা এবং পেছনে অন্য অবস্থা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিলেন যে, হানজালা! এটা সময়ভেদের ব্যাপার।

(সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪৯৩৭; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪৩৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৮২৬৮)

অর্থাৎ সময়ভেদে মানুষের অবস্থায়ও প্রভেদ ঘটে। এক সময় মনে এক অবস্থা প্রবল থাকে এবং অন্য সময় অন্য অবস্থা। তাই পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। বরং আল্লাহ যেসব বিধান দিয়েছেন তা পালনে যত্নবান থাক, ইনশাআল্লাহ ঘাটি পার হতে পারবে। বস্তুত 'আমি মুনাফিক হয়ে গেছি' এই যে চিন্তা, এটা ছিল তার আখিরাতের তলব, যা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল।

হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.)-এর আখিরাত-চিন্তা

হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.)-এর মত ব্যক্তি, যিনি দ্বিতীয় খলীফা এবং যার সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল্যায়ন হল 'আমার পরে কেউ নবী হলে 'উমরই হত'।

(তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৬১৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৭৬৪)

অপর এক হাদীছে বলেন, যেই পথে 'উমর হাটে, সে পথে শয়তান চলে না। সে অন্য পথে চলে যায়। (বুখারী, হাদীছ নং ৩৪০০; মুসলিম, হাদীছ নং ৪৪১০)

আরেক হাদীছে বলেন, হে 'উমর! আমাকে জান্নাতে তোমার অট্টালিকা দেখানো হয়েছে। (বুখারী, ৩৪০৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৩৩৬৯)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত কিছু সুসংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা কেমন ছিল দেখুন। একবার তিনি হযরত হুযায়ফা (রাযি.)-কে ধরে বললেন, হে হুযায়ফা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, একটু বল তো, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের যে তালিকা তোমাকে জানিয়েছেন, তার মধ্যে আমার নামও আছে না কি? এই ছিল তার আখিরাতের ফিকির ও দ্বীনের তলব।

তলবের পরই মদদ আসে

তলব দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতও বিস্তার করে দেন। এ কারণেই মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন,

آب کم جو تشنگی آور بدست

تا بجوشد آب از بالا و پست

'পানির খোঁজ কম কর। অন্তরে পিপাসা জাগাও। অন্তরে যখন অস্থিরতা দেখা দেবে, সঠিক কথা জানার জন্য যখন ছটফটানি শুরু হয়ে যাবে এবং সত্যিকারের তলব দেখা দেবে, তখন আল্লাহ তা'আলাই পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করে দেবেন। এটাই আল্লাহর নীতি। তিনি কোন খাঁটি তালিবকে কখনও ফিরিয়ে দেন না। আজতক ফিরিয়ে দেননি।

তো এই ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাদানের ধরন। প্রথমে সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে তলব সৃষ্টি করতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং ছওয়াব ও পুণ্যের সেই স্তর কি তোমাদেরকে বলে দেব, যা নামায-রোযা ও সদাকা-যাকাত অপেক্ষাও উত্তম? এই প্রশ্ন করে তিনি তাদের মনে তলব ও আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়

সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলে দিন। সাহাবায়ে কিরাম তো এরই অপেক্ষায় থাকতেন। কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয়? কিসের দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়? এ যাবত তো নামায-রোযা ও সদাকা-যাকাতের অনেক-অনেক ফযীলত তারা শুনেছেন। তার চেয়েও বেশি ফযীলতের জিনিস কী হতে পারে?

নামাযকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের স্তম্ভ বলেছেন।

(কানযুল-উম্মাল, হাদীছ নং ১৮৮৮৯)

অপর এক হাদীছে আছে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে। যত বেশি নফল পড়ে ততটাই আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এভাবে একটা পর্যায় আসে, যখন আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে এবং তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে। (বুখারী, হাদীছ নং ৬০২১)

অর্থাৎ নফলের আধিক্য দ্বারা বান্দা আল্লাহর এত বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে যার ফলে সে আপাদমস্তক আলাহ তাআলার মূর্তিমান সন্তুষ্টি হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম নামাযের এ ফযীলত শুনেছিলেন। তাই তাদের দৃষ্টিতে নামাযই ছিল সর্বোত্তম আমল। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আমল আর কী হতে পারে?

রোযার ফযীলত

তারা রোযার ফযীলত সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি সব ইবাদতের প্রতিদান নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। অমুক ইবাদতের ছওয়াব দশগুণ, অমুক ইবাদতের ছওয়াব শতগুণ, অমুক ইবাদাতের সাতশ গুণ ইত্যাদি। কিন্তু রোযা ব্যতিক্রম। এ সম্পর্কে তার ঘোষণা,

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

রোযা আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব।

(বুখারী, হাদীছ নং ৬৯৩৮; মুসলিম হাদীছ নং ১৯৪৬; তিরমিযী হাদীছ নং ৬৯৫; নাসাঈ হাদীছ নং ২১৮১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৪০৩৬)

অর্থাৎ রোযার যে প্রতিদান আমি দেব, তোমাদের পরিমাপ ও তোমাদের হিসাব-নিকাশ দ্বারা তার কোন কিনারা পাবে না। রোযা যেহেতু কেবল আমারই জন্যে তাই এর প্রতিদানও আমি আমার শান মোতাবেক দেব সাহাবায়ে কিরাম রোযার এ ফযীলত শুনেছিলেন। তাই এর চেয়ে বেশি ফযীলতের জিনিস কী হতে পারে তা তাদের ভাবনায় ছিল না।

দান-সদাকার ফযীলত

তারা সদাকার ফযীলত সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। তাদেরকে শোনানো হয়েছিল আল্লাহর পথে দান করলে তার নিশ্চিত প্রতিদান তো সাতশ গুণ এবং তাও আমাদের হিসাব নয় বরং জান্নাতের হিসাব অনুযায়ী দেওয়া হবে। কাজেই দান-সদাকা যে অনেক বড় ফযীলতের কাজ তাও তারা জানতেন

সর্বোত্তম আমল হল বিবাদ-নিষ্পত্তি

তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, তোমাদেরকে কি এমন কোন জিনিসের কথা বলে দিব না, যা নামায, রোযা ও সদাকা অপেক্ষাও উত্তম যেগুলোর ফযীলতের কথা তোমরা শুনেছ? এ কথা শুনতেই সাহাবাগণের অন্তরে তা জানার আগ্রহ সৃষ্টি হল। তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। সে জিনিসের কথা আমাদেরকে অবশ্যই বলে দিন, যাতে তা আমরা পালন করতে পারি এবং তার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইবাদত অপেক্ষাও বেশি ছওয়াব দান করেন। তখন তিনি বললেন,

إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

তা হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করা। অর্থাৎ দুজন মুসলিমের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব-কলহ হয়, তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে এবং তাদের পরস্পরে দেখা-সাক্ষাত বন্ধ হয়ে যায়, তবে এমন কোন ব্যবস্থা নাও, যা দ্বারা তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে যায়, তারা পরস্পরে আবার আগের মত এক হয়ে যায়। এরূপ প্রচেষ্টা নামায, রোযা ও সদাকা অপেক্ষাও উত্তম।

প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীছে নামায-রোযা দ্বারা নফল ইবাদত বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাতভর নফল পড়া, দিনভর নফল রোযা রাখা এবং প্রচুর পরিমাণে নফল দান-খায়রাত করা এমনিতে অনেক বড় ফযীলতের কাজ, কিন্তু তুমি যদি দুজন মুসলিমের পারস্পরিক বিরোধ ও মনোমালিন্য দূর করার জন্য চেষ্টা কর এবং তাদের মধ্যে মিল-মহব্বত পয়দা করে দাও আর এ কাজে তোমার সবটা সময় ব্যয় হয়ে যায়, তবে এতে যে ছওয়াব পাওয়া যায় তা তুমি রাতভর নফল নামায পড়লে দিনভর নফল রোজা রাখলে ও বিপুল

টাকা পয়সা আল্লাহর পথে খরচ করলে যে সওয়াব পেতে তা অপেক্ষা ঢের বেশি। এবার চিন্তা করুন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সাহাবায়ে কিরামকে দান করেছেন।

পারস্পরিক বিরোধ ধ্বংসাত্মক কাজ

একদিকে তো বলে দিলেন মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সবরকম নফল ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়, অন্য দিকে এর বিপরীত বিষয়টি সম্পর্কেও সাবধান করে দিলেন, বললেন,

وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

পরস্পরে ঝগড়া-ফাসাদই মুণ্ডনকারী কাজ।

অপর এক হাদীছে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, আমি বলছি না যে, পারস্পরিক ঝগড়-বিবাদ তোমাদের মাথা কামিয়ে দেয়। বরং তা দ্বীনকে মুড়িয়ে দেয়। কেননা, পরস্পরে ঝগড়া-ফাসাদ দেখা দিলে তার কুফল হয় সুদূরপ্রসারী। এর ফলে মানুষ হাজারও গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। একে অন্যের গীবত করে অপবাদ দেয়, মিথ্যা কথা বলে, গালাগালি করে, কুৎসা রটনা করে এবং একে অন্যকে সর্বতোপ্রকারে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং ঝগড়া-ফাসাদ বহুমাত্রিক গুনাহের সমষ্টি।

ঝগড়ার কুফল

ঝগড়ার একটা বড় কুফল হল, এর পরিণামে মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়। দ্বীনের নূর চলে যায় এবং দিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে সাবধান করেছেন, তোমরা পরস্পরে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হয়ো না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন ভর মসজিদে নববীতে ইমামতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর বর্তমানে আর কেই বা এ দায়িত্ব পালন করতে পারে?

তাছাড়া জামাতের ব্যাপারেও তাঁর চেয়ে বেশি নিয়মিতই বা আর কে হতে পারে? কিন্তু তা সত্ত্বেও একবার তিনি নামাযের সময় মসজিদে নববীতে হাজির হতে পারেননি। তাঁর দেরি হওয়ায় হযরত আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রাযি.) নামাযে ইমামত করেন। তা কেন তিনি হাজির হতে পারেননি? কারণ এই বিরোধ-নিষ্পত্তি। তিনি জানতে পারেন এক এলাকায় দুটি দলের মধ্যে কলহ দেখা দিয়েছে। তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি সেখানে চলে যান। এ কাজে তাঁর বেশ সময় লেগে যায়। এদিকে নামাযেরও

সময় হয়ে যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপস্থিত না পেয়ে সাহাবায়ে কিরাম হযরত আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রাযি.)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করে নেন।

(মুসলিম, হাদীছ নং ৪১০: নাসাঈ, হাদীছ নং ৮১: আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১২৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৭৪৩২ : দারিমী, হাদীছ নং ১৩০১)

সমগ্র জীবনে এই একটা ঘটনাই পাওয়া যায়, যাতে সুস্থাবস্থায় তিনি মসজিদে নববীতে উপস্থিত হতে পারেননি। এর কারণ ছিল কেবল মানুষের মধ্যে বিরোধ-নিষ্পত্তি করে দেওয়া। মীমাংসাকার্যে সময় লেগে যাওয়ায় তিনি জামাত ধরতে পারেননি।

কুরআন হাদীছে এর অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে, যাতে মুসলিমগণ আপসে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত না হয় এবং এরূপ কিছু ঘটে গেলে যেন যে-কোন মূল্যে তার নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়।

মধ্যজান্নাতে স্থান লাভের নিশ্চয়তা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন,

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ

যে ব্যক্তি ন্যায়ের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া ছেড়ে দেয়, আমি তার জন্য মধ্যজান্নাতে একটি মহলের দায়িত্ব নিচ্ছি। (আবূ দাউদ হাদীছ নং ৪১৬৭)

অর্থাৎ যে ব্যাক্তির দাবি ন্যায্য এবং সে কারণে চাইলে লড়াই করতে পারে মামলা-মকদ্দমায় যেতে পারে কিংবা নিজ হক আদায়ের জন্য অন্য যে-কোনও পন্থা অবলম্বন করতে পারে, কিন্তু তাতে দ্বন্দ্ব-বাড়বে, ফাসাদ দেখা দেবে, পরিণামে দ্বীনের ক্ষতি হবে, এই চিন্তা করে সে ঝগড়া ও মামলা-মকদ্দমার দিকে গেল না; বরং হকই ছেড়ে দিল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরূপ ব্যক্তি যাতে মধ্যজান্নাতে একটি মহল পায়, আমি তার দায়িত্ব নিলাম। চিন্তা করুন কত বড় সুসংবাদ। এটা কি কোন মামুলি ব্যাপার?

অন্য কোন কাজে এ রকম জামিনদারি নেই

দাবি ন্যায্য হওয়া সত্ত্বেও বিবাদে না গেলে তার পুরস্কারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জামিনদারি নিয়েছেন, অন্য কোন কাজের বেলায় তা নেননি। এর দ্বারা তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, তোমরা আত্মকলহে লিপ্ত থেক না। সে রকম কিছু দেখা দিলে তা শীঘ্র মিটমাট করে ফেল। আল্লাহর বান্দা বনে যাও। পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে থাক। কলহের যত কারণ হতে

পারে সব খতম করে ফেল। কেননা, ঐক্য ও সম্প্রীতির ভেতর আল্লাহ তা'আলা যে নূর রেখেছেন, তা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত আলোকিত হয়। অন্যদিকে আত্মকলহ হচ্ছে অন্ধকার। দুনিয়ায়ও অন্ধকার এবং আখিরাতেও অন্ধকার, তাতে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষের দ্বীন ও ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়।

ঘাতক ও নিহত দু'জনই জাহান্নামী

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ

দুই মুসলিম যখন আপন-আপন তরবারি নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত দুজনই জাহান্নামী হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হত্যাকারী জাহান্নামে যাবে, এটা তো স্পষ্ট, যেহেতু সে অন্যায়ভাবে একজন মুসলিমকে হত্যা করেছে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামে যাবে? নবীজি বললেন,

إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

যেহেতু সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে লালায়িত ছিল (অর্থাৎ তারও চেষ্টা ছিল সুযোগ পেলে প্রতিপক্ষকে হত্যা করবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে পেরে ওঠেনি। প্রতিপক্ষ পেরে গেছে। ফলে সে হয়েছে ঘাতক আর এ নিহত। নয়ত ঘাতক এ-ও হতে পারত এবং সেই পাঁয়তারায়ই তো সেও ছিল। তাই তাকেও জাহান্নামে যেতে হবে। এ কারণেই কোন মুসলিমের সাথে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হতে বারণ করা হয়েছে। (বুখারী, হাদীছ নং ৩০; নাসাঈ, ৪০৫১)

শাসক যদি হাবশী গোলাম হয়

অপর এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন হাবশী গোলামও যদি তোমাদের শাসক হয়ে যায়, তবুও তার বিরুদ্ধে তরবারি ধরো না যাবৎ না সে প্রকাশ্য কুফুরে লিপ্ত হয়। কেননা, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে কেউ তোমাকে সমর্থন করবে কেউ তাকে সমর্থন করবে। ফলে মুসলিম উম্মাহ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের ঐক্য-সংহতি নষ্ট হবে আপসে ঘৃণা-বিদ্বেষ দেখা দেবে এবং নিজেরা-নিজেরা মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস করবে। একারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনক্রমেই মুসলিমদের আত্মকলহকে বরদাশত করেননি।

তিনি ইরশাদ করেন,

كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও।

(বুখারী, হাদীছ নং ৫৬০৪, মুসলিম, হাদীছ নং ৪৬৪১; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৮৫৮; আবু দাঊদ, হাদীছ নং ৪২৬৪; ইবনে মাজাহ, হাদীছ নং ৩৮৩৯; মুসনাদে আহমাদ হাদীছ নং ১৭)

মানুষের জীবন আজ জাহান্নামে পরিণত

আমার যখন ইবাদত শব্দ বলি, তখন কেবল নামায রোযা, যাকাত, তাসবীহ, যিকর, তিলাওয়াত ইত্যাদির দিকেই দৃষ্টি যায়। সন্দেহ নেই এসবই উচ্চস্তরের ইবাদত এবং এসবের ফরয স্তর তো দ্বীনের আসল খুটি আর নফল স্তরও অনেক মূল্যবান। কিন্তু নবীজি বলেছেন, তার চেয়েও উচ্চস্তরের কাজ হল মুসলিমদের আত্মকলহের মীমাংসা করা। আজ আমাদের সমাজ তাঁর এ শিক্ষা থেকে যোজন-যোজন দূরে সরে গেছে। ফলে চারদিকে কেবল হিংসা-বিদ্বেষ ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি, হানাহানি এবং অনৈক্য ও অসদ্ভাব। জীবন যেন জাহান্নামের কুণ্ড। অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মকলহকে ধংসাত্মক কাজ বলেছেন। আত্মকলহ আজ আমাদের দ্বীনকে মুড়িয়ে ফেলছে। দ্বীনী চেতনা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই আত্মকলহের অভিশাপ আমরা অনুভব করতে পারছি না।

চেতনার অবক্ষয়

আজ আমাদের সমাজে কেউ যদি নামায না পড়ে, মদ পান করে কিংবা অন্য কোন গুনাহ করে তবে সে যে মন্দ কাজ করছে এ বোধ আল-হামদুলিল্লাহ অনেকের আছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে সব কাজে মনোমালিন্য দেখা দেয় বা ঝগড়া-ফাসাদ শুরু হয়ে যায় তা যদি কেউ করে তবে তাকে বিশেষ অপরাধী মনে করা হয় না, অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বড় অপরাধীই না তাকে সাব্যস্ত করেছেন। এমনিভাবে তিনি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কত তাগিদই না দিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য কারও বিশেষ গরজ বোধ হয় না। নিঃসন্দেহে এটা বোধ-চেতনার ভয়াবহ অবক্ষয়। এ অবক্ষয় থেকে আমাদের উঠে আসতে হবে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুণ্যার্জনের এই যে বিশাল দ্বার উন্মোচন করেছেন। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে দেওয়া, যা নফল নামায-রোযা অপেক্ষাও শ্রেয়, সে দ্বারকে গুরুত্বের সাথে আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

অবাস্তব কথা বলেও যে ব্যক্তি মিথ্যুক নয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا

যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে এবং তা করতে গিয়ে (এমন) কোন ভালো কথা বলে বা ভালো কথা লাগায়, (যা বাস্তবে বলা হয়নি) সে মিথ্যুক নয়। যেহেতু তার উদ্দেশ্য পারস্পরিক ঘৃণা দূর করে মিল-মহব্বত সৃষ্টি করা (মুসলিম, হাদীছ নং ৪৭১৭: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৬০১১)

কেউ জানতে পারল, অমুক দুই মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে, এখন তারা একে অন্যকে ঘৃণা করে। একথা জানার পর সে তাদের একজনের কাছে গেল। তাকে বলল, ভাই আপনি তাকে এমন ঘৃণা করেন, অথচ সে আপনাকে কতই না ভালোবাসে। সে আপনার অনেক প্রশংসা করে আপনার জন্য দুআও করে। আমি তাকে আপনার জন্য দুআ করতে দেখেছি। এক্ষেত্রে বাস্তবে সে তাকে তার জন্য দুআ করতে দেখেনি। কিন্তু এই দু'আ করতে শুনেছে যে,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রদান কর দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রেহাই দাও।
(বাকারা : ২০১)

তো এ দুআয় আমাদের কথাটি ব্যাপক। এর মধ্যে তো এই ব্যক্তিও পড়ে যায়, যার কাছে গিয়ে নিষ্পত্তিকারী এসব কথা বলছে। সেই হিসেবে সে জানাচ্ছে যে, আপনার জন্য দু'আ করতে শুনেছি। যেহেতু তার উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করা, তাই এ দূর সম্ভাবনাকে নিশ্চিতরূপে ব্যক্ত করাতে তার কোন গুনাহ হবে না এবং সে মিথ্যুক সাব্যস্ত হবে না।

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দু'আ

এমনিভাবে সে যদি মনে মনে এই কল্পণা কর যে, ওই ব্যক্তি তো নামাযে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে। তাতে আছে,

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি।

তা ছাড়া নামাযের শেষে সালাম দেয় যে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ। তোমাদের প্রতি সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। ফকীহগণ বলেন, মুসল্লী যখন

ডানদিকে ফিরে সালাম বলে, তখন নিয়ত করবে ডানদিকে যত ফিরিশতা, জিন্ন ও মুসলিম আছে, সকলের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দু'আ করছি আর যখন বাম দিকে সালাম ফেরাবে তখন নিয়ত করবে এদিকে যত ফিরিশতা জিন্ন ও মুসলিম আছে সকলের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দু'আ করছি।

এর ভিত্তিতে যদি বলে, অমুক ব্যক্তি তোমার জন্য দু'আ করে, আমি নিজে দু'আ করতে শুনেছি, তবে তা মিথ্যা হবে না; অথচ তা দ্বারা সেই ব্যক্তির অন্তরে তার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হবে। সে ভাববে আমি তাকে খারাপ জানি, অথচ সে আমার জন্য দু'আ করে। কাজেই তার সাথে আমার শত্রুতা করা উচিত নয়।

কোন কোন ফকীহ এ হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মুসলিমদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য সরাসরি মিথ্যা বলার দরকার পড়লে তা বলাও জায়েয তার নিষ্পত্তি কল্পে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজনে এমন অবাস্তব কথা বলাকে জায়েয বলেছেন যা দ্বারা একজন সম্পর্কে অন্যজনের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি হয়।

সুতরাং যেখানেই সুযোগ হয় পরস্পরের মধ্যে আপস-রফার চেষ্টা চালিয়ে হাদীছে বর্ণিত মহাপুরস্কার অবশ্যই হাসিল করে নেওয়া উচিত। কতজনের পক্ষে রাতভর তাহাজ্জুদ পড়া, দিনভর রোযা রাখা ও আল্লাহর পথে অবিরত দান খয়রাত করতে থাকা সম্ভব? অথচ মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে দিলে আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও বেশি ছওয়াব দান করে থাকেন।

এক শ্রেণীর লোক সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের হয়ে থাকে। তাদের কাছে দুই হৃদয়ের একাত্মতা সহ্য হয় না। যখনই দেখে দু'জন লোকের মধ্যে বেশ মিলমিশ, তার অন্তরে জ্বালা ধরে যায়। সে তাদের মধ্যে এমন কোন গুটি চেলে দেয় যদ্দরুন তাদের অন্তরে বিষ ছড়িয়ে যায়। এখন আর কেউ কাউকে দেখতে পারে না। এরচে' ঘৃণ্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। এটা এক গুরুতর পাপ।

ইবলীসের আসল চেলা

ইবলীসের একটি বাহিনী আছে। সারা দুনিয়ায় তাদের নেটওয়ার্ক। মানুষকে বিপথগামী করাই তাদের কাজ। হাদীছে আছে ইবলীস সাগরে তার সিংহাসন স্থাপিত করে এবং সেখানে অধিবেসনে বসে । পৃথিবীর সব যায়গা থেকে প্রতিনিধিরা তাতে যোগ দেয় এবং নিজ নিজ কাজের রিপোর্ট পেশ করে । কোন শয়তান জানায়, এক ব্যক্তি নামাযে যাচ্ছিল, আমি তাকে এমন এক ঝামেলায় লাগিয়ে দেই, যদ্দরুন সে আর নামাযে যেতে পারেনি। তার

নামায কাযা হয়ে গেছে। একথা শুনে ইবলীস তাকে বাহবা দেয় । বলে, তুমি বেশ কাজটি করেছ। দ্বিতীয় শয়তান বলে, এক ব্যক্তি রোযা রাখতে চাচ্ছিল। আমি তার মন ঘুরিয়ে দেই ফলে সে, আর রোযা রাখেনি। ইবলীস তাকেও ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, তুমি বেশ কাজ করেছ। তৃতীয় শয়তান বলে, অমুক ব্যক্তি দান খয়রাত করতে চাচ্ছিল, আমি এমন এক পরিস্থিতি পাকিয়ে দেই, যদ্দরুন সে তা করা হতে বিরত থাকে । ইবলীস তাকেও ধন্যবাদ দেয় এবং বলে, বেশ কাজটি করেছ। শেষে এক শয়তান দাঁড়িয়ে বলে, এক দম্পত্তি বেশ সুখে জীবন যাপন করছিল। আমি তাদের মধ্যে এমন এক চাল চালি, যদ্দরুন তাদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং তা বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তাদের একজন অন্যজনকে মুখ দেখাতেও নারাজ, সবশেষে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ইবলীস তা শুনে খুশিতে লাফিয়ে উঠে। সে তার এই চেলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং বলে, তুমিই আমার আসল চেলা। তুমি অনেক বড় কাজ করেছ এবং আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছ ।

মানুষে মানুষে ঘৃণা সৃষ্টিকারী অতি বড় অপরাধী

মোটকথা, শয়তানের সবচেয়ে বড় সাফল্য মানুষের ঐক্য নষ্ট করতে পারা। পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টির পেছনেই সে সবচেয়ে বেশি মেহনত করে। সুতরাং যে সব লোক মানুষের সম্প্রীতি নষ্ট করে, যেখানেই দেখে দু'জন লোক মিলেমিশে বাস করছে তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করে দেয় এবং এর কথা ওর কাছে লাগিয়ে পরিস্থিতি বিষাক্ত করে ফেলে, এ হাদীছের দৃষ্টিতে সে অত্যন্ত কঠিন অপরাধে লিপ্ত। নামায-রোযা থেকে ফেরানোও শয়তানী কাজ। কিন্তু এটা এমনই এক শয়তানী, ইবলীস যাকে সর্বাপেক্ষা বড় সাফল্য মনে করে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলিমকে এর থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচার উপায়

প্রশ্ন হচ্ছে, ঝগড়া–ফাসাদ থেকে বাচাঁর উপায় কী ? কিভাবে পরস্পরে মিল মহব্বত সৃষ্টি করা যাবে ? এর উত্তর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছে বর্তমান। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে এ বিষয়ে নির্দেশনা ও বিভিন্ন কর্মসূচী দিয়েছেন। তার এক–একটি কাজই বিরোধ-নির্মূলের জন্য যথেষ্ট। সেগুলো জানার আগে একটা মূলনীতি বুঝে নিন।

আত্মকলহ নির্মূলের শর্ত

আত্মকলহ নির্মূল ও পরস্পরে সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য একটা বিশেষ শর্ত আছে। সে শর্ত পূরণ না হলে এ প্রসংগে কোনও চেষ্টাই ফলপ্রসূ হতে পারে না। আজ তো চারদিক থেকেই রব উঠছে। মুসলিমদের আপসের বিভেদ ঘুচিয়ে ফেলা উচিত। তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবি। এমন কি যারা কলহের বীজ বপন করে তারা পর্যন্ত ঐক্যের আওয়াজ তুলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। কী এর রহস্য? এ ব্যাপারে এক দরবেশ পুরুষের কথা শুনুন। তিনি নাড়িতে হাত রেখে রোগের উৎস ধরে ফেলতেন। সব যুগেই প্রকৃত রোগ নির্ণয় আল্লাহওয়ালাগণই করে থাকেন। আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা দান করেন এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও তিনি তাদের অন্তরে ঢেলে দেন।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ (রহ.) প্রদত্ত ব্যবস্থা

আমাদের সাইয়্যেদুত-তায়েফা (উলামায়ে দেওবন্দের দলপতি) আমাদের তরীকত-সিলসিলার উর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ। বিস্ময়কর তাঁর অবস্থা। এমনিতে তো তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত কোন আলেম ছিলেন না। কাফিয়া-কুদুরী পর্যন্তই ছিল তার সর্বোচ্চ পড়াশোনা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন বান্দার সামনে যখন ম্যারিফাত ও তত্ত্বজ্ঞানের দরজা খুলে দেন, তখন জ্ঞান-বিদ্যার বড়-বড় দিকপালও তাঁর সামনে কুরবান হয়ে যায়। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী (রহ.)-এর মত জ্ঞানের সাগর এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহ.)-এর মত জ্ঞানের পাহাড়ও নিজ তারবিয়াতের জন্য, নিজ আখলাক-চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য তাঁর শিষ্য হয়ে যান।

এই বুযুর্গ এক কথায় ঐক্যের গ্রন্থিমোচন করে দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে যে প্রাজ্ঞোচিত সমাধান দিয়েছেন, আমি দাবি করে বলতে পারি, আমরা তার অনুসরণে বদ্ধপরিকর হলে সমাজের দ্বন্দ্ব-কলহের চির অবসান হতে পারে।

তিনি বলেন, "ঐক্য সংহতির প্রকৃত উপায় নিজের ভেতর দুটি গুণ অর্জন করা, এ দু'টি গুণ অর্জিত হয়ে গেলে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত। তার একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে তবে ঐক্য অসম্ভব। এ গুণ দু'টি হল বিনয় ও ত্যাগ"।

বিনয় ও তাওয়াযূ-এর অর্থ নিজের আমিত্বকে ঘুচিয়ে ফেলা। অন্তরে এই চেতনা জাগ্রত করা যে, আমি আল্লাহর বান্দা। বান্দা হিসেবে আমি আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীর অধীন। ব্যক্তিসত্তা হিসেবে আমার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন হক নেই। কাজেই কেউ আমার কোন অধিকার ক্ষুণ্ন করলে সেটা কোন ধর্তব্য বিষয় নয়। বরং আমি তো তারই উপযুক্ত।

অহংকারই ঐক্যের অন্তরায়

হযরত হাজী ছাহেব (রহ.) বলেন, প্রত্যেকের অন্তরে অহংকার বাসা বেঁধে আছে বলেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। প্রত্যেকে মনে করে আমি বড়। আমার অনেক অধিকার, অমুকে আমার সম্পর্কে এই অমর্যাদাকর উক্তি করেছে, অমুকে আমার সম্মান মোতাবেক কাজ করেনি। আমার অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে। আমাকে সম্মান দেখানো উচিত ছিল। সেটা আমার অধিকার। কিন্তু সে আমাকে সম্মান দেখায়নি। আমি তার বাড়িতে গেলাম; কিন্তু সে আমার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। এই অহংকার ও তাকাব্বুরই সব ঝগড়ার মূল।

তাকাব্বুরের কারণে নিজেকে বড় মনে করে আর বড় মনে করার কারণে নিজের জন্য কিছু অধিকার কল্পনা করে নেয় আর ভাবে আমার মর্যাদা অনুযায়ী অমুকের উচিত আমার সাথে এই-এই ব্যবহার করা। সেই মত আচরণ না হলেই অন্তরে অভিযোগ দাঁড়িয়ে যায়, মনে মলিনতা দেখা দেয়, ঘৃণা সৃষ্টি হয়। তারপর ব্যবহার খারাপ হতে থাকে এবং সবশেষে একে অন্যের শত্রু হয়ে যায়। কাজেই তাকাব্বুরই কলহের মূল।

শান্তিপূর্ণ জীবনের কার্যকর ব্যবস্থা

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আমি তোমাদেরকে মধুর ও শান্তিপূর্ণ জীবনের একটা ব্যবস্থা বলে দিচ্ছি। তোমরা এটা অবলম্বন করলে ইনশাআল্লাহ জীবনে কখনও কারও সম্পর্কে মনে কোনও অভিযোগ আসবে না। তা হল মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে ফেলবে যে, এই দুনিয়া খুবই খারাপ জিনিস। এর প্রকৃতিই কষ্ট দেওয়া। কাজেই কোন মানুষ বা জীবজন্তুর পক্ষ হতে কখনও কষ্ট পেলে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়, যেহেতু কষ্টদানই দুনিয়ার প্রকৃতি। বরং কারও পক্ষ হতে কখনও কোন উপকার লাভ হলে তাতেই বিস্ময় বোধ করা উচিত, যেহেতু তা দুনিয়ার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আর সে জন্য তোমার কর্তব্য কৃতজ্ঞতা জানানো।

কারও পক্ষ হতে কোন উপকারের আশা রাখবে না

কাজেই দুনিয়ার কারও পক্ষ হতেই ভালো কিছু লাভের আশা করবে না। আত্মীয় হোক, বন্ধু হোক বা অন্য কোন প্রিয়জন হোক সে তোমার কোন উপকার করবে বা তোমাকে কিছু দেবে কিংবা সম্মান ও সাহায্য করবে এ রকম কোন আশা বিলকুল করবে না। অন্তর থেকে যখন এই আশা মুছে ফেলবে, তখন পরে কারও দ্বারা তোমার কোন উপকার লাভ হলে তাতে

তোমার খুব আনন্দ বোধ হবে, অপ্রত্যাশীত প্রাপ্তিতে যেমনটা হয়ে থাকে। কাজেই তখন তুমি প্রাণভরে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পাববে যে হে আল্লাহ! আপনি নিজ অনুগ্রহে তার অন্তরে এই অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, যদ্দরুন সে আমার এই উপকার করেছে বা আমার সাথে এই ভালো ব্যবহার করেছে।

অপরদিকে মনের এই অবস্থাকালে যদি কেউ তোমার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করে তাতে তোমার বিশেষ কষ্ট বোধ হবে না যেহেতু আগে থেকেই তোমার অন্তরে ভালো ব্যবহারের আশা ছিল না। দেখুন কোন শত্রু যদি আপনাকে কষ্ট দেয়, তাতে আপনার কোন অভিযোগ থাকে না, যেহেতু তার কাজই হল কষ্ট দেওয়া। তাই তার কষ্টদানে অন্তরে বেশি আঘাত লাগে না ফলে অভিযোগ জন্মায় না। অভিযোগ জন্মায় তখনই যখন কারও পক্ষ হতে ভালো ব্যবহারের আশা থাকে আর এ অবস্থায় সে দুর্ব্যবহার করে। সুতরাং হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কোন মাখলূক থেকে কোনরূপ প্রাপ্তির আশা অন্তর থেকে মুছে ফেল।

আশা রাখতে হবে কেবল একই সত্তার কাছে। চাবে তো তারই কাছে, আশা রাখবে তো তারই কাছে এবং নির্ভর করবে তো কেবল তাঁরই উপর। এ ছাড়া সমগ্র দুনিয়া থেকে আশা ছিন্ন করে ফেল, নিজ আশাকে কেবল আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাথেই জুড়ে রাখ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ رَجَاءَكَ وَاقْطَعْ رَجَائِيْ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তোমার আশাবাদ স্থাপিত করে দাও আর তুমি ছাড়া অন্য সকল হতে আমার আশাকে ছিন্ন করে দাও।

ঐক্যের প্রথম বুনিয়াদ বিনয়

যার অন্তরে তাওয়াযূ ও বিনয় থাকবে সে অন্যের কাছে নিজেকে কোনও কিছুর হকদার মনে করবে না। কারও কাছে তার কোন দাবি থাকবে না। সে মনে করবে, আমি তো আল্লাহর একজন বান্দা। আমার কিসের দাবি-দাওয়া? আল্লাহ তা'আলা আমার সংগে যখন যে, আচরণ করবেন আমি তাতেই খুশি। অন্তরে এই তাযয়াযূ পয়দা হয়ে গেলে অন্যের কাছ থেকে প্রাপ্তির আশাও নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আশা না থাকলে অভিযোগও জন্ম নেবে না। যখন কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। তখন আর ঝগড়া-ফাসাদও সৃষ্টি হবে না। সকলের সাথে ঐক্য ও সদ্ভাব বজায় থাকবে। সুতরাং তাওয়াযূ-ই ঐক্যের প্রথম ভিত্তি।

ঐক্যের দ্বিতীয় বুনিয়াদ ত্যাগ

অন্যের খাতিরে নিজ স্বার্থ ত্যাগ-এর নীতি অবলম্বন করুন। এই ত্যাগই ঐক্যের দ্বিতীয় ভিত্তি। একে ঈছার বলে। অর্থাৎ অন্তরের চেতনা হবে এ রকম যে, আমি অন্যের সুবিধার্থে নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ করব। আমার মুসলিম ভাইয়ের সুখ-শান্তির দিকে লক্ষ রাখব। সে জন্য নিজে কষ্ট করব কিন্তু তাকে কষ্ট থেকে রক্ষা করব। নিজে ক্ষতি স্বীকার করে অন্যকে লাভবান করব। ঈছার-এর এই চেতনা অন্তরে সৃষ্টি করুন,

اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں
اپنا تو زیاں تسلیم مگر اوروں کا زیاں منظور نہیں

লাভ-লোকসানের এই জগতে নিয়েছি পাগলামির পাঠ। নিজ ক্ষতি মেনে নেব হাসিমুখে, কিন্তু পরের ক্ষতিতে নই খুশি মোটে। প্রকৃতপক্ষে এটাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা।

সাহাবায়ে কিরামের ত্যাগ

সাহাবাগণের ঈছার বা ত্যাগের প্রশংসায় কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

তারা নিজেদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদের নিজেদের অভাব অনটন থাকে। (হাশর : ৯)

একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়েকজন গরিব মুসাফির আসল। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সাধারণত সাহাবায়ে কিরামকে বলতেন যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন নিজেদের সাথে দু-একজন করে মেহমান নিয়ে যায় এবং তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। এদিনও তিনি তাই বললেন। সুতরাং জনৈক আনসারী সাহাবী নিজের সাথে একজন মেহমান নিয়ে গেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, মেহমান এসেছে খাবার ব্যবস্থা আছে কি? স্ত্রী বলল, মেহমানকে খাওয়ানোর মত বাড়তি খাবার নেই। যা আছে আমরা খেলে মেহমান খেতে পারবে না। মেহমান খেলে আমাদের অভুক্ত থাকতে হবে। সাহাবী বললেন, ঠিক আছে যা খাবার আছে মেহমানের সামনে রাখ এবং বাতি নিভিয়ে দাও। স্ত্রী তাই করলেন। মেহমানের সামনে খাবার রেখে বাতি নিভিয়ে দিলেন।

সাহাবী মেহমানকে বললেন, জী খেয়ে নিন। মেহমান খেতে শুরু করল। সাহাবীও সাথে বসলেন। কিন্তু নিজে কিছুই খেলেন না। কেবল খাওয়ার ভান করছিলেন। খাবারের দিকে হাত বাড়াতেন আবার সেই হাত মুখের কাছে আনতেন, যাতে মেহমান মনে করে তিনিও খাচ্ছেন। সে রাত স্বামী–স্ত্রী ও বাচ্চারা না খেয়েই কাটালেন। যা খাবার ছিল তা মেহমানকেই খাওয়ালেন। তাদের এ কীর্তি আল্লাহ তাআলার বড় পসন্দ হল। সুতরাং আয়াত নাযিল করলেন,

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

তারা এমনই লোক যে, নিজেদের অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। নিজেরা অভুক্ত থেকে অন্যকে খাওয়ায়।

এই ছিল সাহাবায়ে কিরামের ঈছার। ঈছার হচ্ছে নিজের কিছুটা কষ্ট হলেও মুসলিম ভাইকে আরামে রাখার চেষ্টা। আল্লাহ তাআলা যাকে এ গুণ দিয়েছেন, ঈমানের প্রকৃত মজা সেই উপভোগ করতে পারে। তাদের কাছে সে মজার সামনে দুনিয়ার যাবতীয় আস্বাদ-আনন্দ তুচ্ছ মনে হয়। মানুষ নিজে নিজে কষ্ট-ক্লেশ সয়ে অন্যকে আনন্দ দিতে পারে, অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে পারে, তখন সেই হাসিতে যে শিহরণ নিজের সর্বসত্তায় বোধ করে, তার সামনে বিশ্বজাহানের কোন আনন্দ দাঁড়াতেই পারে না। জানা নেই এই জীবন কত দিনের। যে কোন সময় ডাক এসে যেতে পারে। দেখতে না দেখতে মানুষ বিদায় নিয়ে যায়। কাজেই অন্তরে 'ঈছার'-এর চেতনা সৃষ্টি করুন। এ গুণ অর্জন হয়ে গেলে এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা অন্তরে-অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। যারা নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের সুখ চিন্তা করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা প্লাবিত করে দেন।

এক ব্যক্তির মাগফিরাত লাভের ঘটনা

হাদীস শরীফে পূর্ববর্তী উম্মতের জনৈক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুর পরে তাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির করা হল। দেখা গেল, তার আমলনামায় উল্লেখযোগ্য ইবাদত নেই। আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তার আমলনামায় কোন পুণ্যই কি নেই? ফিরিশতারা বললেন, বিশেষ কোন পুণ্য নেই। তবে একটা পুণ্যের উল্লেখ আছে যে, সে কারও কাছ থেকে কিছু কেনার সময় বিক্রেতার সাথে ঝগড়া করত না। যে মূল্য চাওয়া হত সহজ কথায়, তাতে কিছু কম বেশি দিয়ে তা কিনে নিত।

অনুরূপ বিক্রিকালেও নম্রতা অবলম্বন করত। বিশেষ কোন দাম নিয়ে জিদ করত না যে, তার কমে কিছুতেই বিক্রি করবে না। ক্রেতা গরীব হলে বরং তার কাছে কম দামেই ছেড়ে দিত। অনুরূপ কারও কাছে কিছু পাওনা থাকলে তার সাথেও সহজ আচরণ করত। সে যদি গরীব হত, সময় বাড়িয়ে দিত বা ক্ষমাই করে দিত। ব্যস তার আমলনামায় কেবল এতটুকু পূণ্যই আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার একজন বান্দা হয়ে যখন সে এরকম ছাড় দিত, তখন আমি কেন ছাড় দেব না। তা দেওয়ার হক তো আমারই বেশি। সুতরাং যাও, একে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

(তিরমিযী, হাদীস নং ১২৪১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৪১৩১)

তো যে কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করলেন, তা তো এই ঈছার ও ত্যাগপরায়ণতাই ছিল।

স্বার্থপরতা পরিহার কর

মোটকথা, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) ঐক্যের জন্য এ দু'টি শর্ত পূরণ করতে বলেছেন। 'তাকাব্বুর' নির্মূল করে ফেলা এবং 'ঈছার' অর্জন করা। ঈছার বা ত্যাগপরায়ণতার বিপরীত হল স্বার্থপরতা। মানুষ সর্বক্ষণ নিজ স্বার্থ নিয়ে পেরেশান থাকে। আপনার বৃত্তে আপনি বিরাজ করে। তাতে অন্যের প্রবেশাধিকার নেই। কিভাবে আমার পকেটে অর্থকড়ি বেশি আসবে। ইজ্জত-সম্মান কিভাবে সবার উপরে থাকবে, চারদিকে আমার খ্যাতি কিভাবে ছড়াবে, আমার দিকে কিভাবে অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, ব্যস রাত দিনের যত দৌড়ঝাপ সবই নিজ স্বার্থকে কেন্দ্র করে। এটাই হল ঈছারের বিপরীত চরিত্র। আর তাওয়াযুর বিপরীত হল তাকাব্বুর। মানুষ যদি তাকাব্বুর ও স্বার্থপরতা ছেড়ে দিয়ে তাওয়াযু ও ঈছার অবলম্বন করে, তবে ঐক্য ও সম্প্রীতি আপনা-আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। এর জন্য পৃথক কোন মেহনত করতে হবে না।

পসন্দের মাপকাঠি হোক অভিন্ন

হাদীছটির পরবর্তী অংশ হল,

أَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَاكْرَهْ لِأَخِيكَ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ

তুমি নিজের জন্য যা পসন্দ করে থাক, তোমার ভাইয়ের জন্যও তাই পসন্দ করো আর তোমার নিজের জন্য যা অপসন্দ কর তোমার ভাইয়ের

জন্যও তাই অপসন্দ করো। (কানযুল উম্মাল, ১খ, ২৭৯ পৃ. হাদীছ নং ১৩৭৫: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২২৭৮৪)

এটি মুলত সমস্ত উত্তম চরিত্রের ভিত্তি। আমরা এ চরিত্র নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারলে পারস্পরিক সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে। সুতরাং অন্যের সঙ্গে যে কোনও আচরণ ও দ্বিপাক্ষিক যে কোন মামলায় নিজেকে অপরজনের স্থানে রেখে ভাবুন আমি তার স্থানে এবং সে আমার স্থানে থাকলে কিরূপ আচরণ আশা করতাম। তখন আমি কী পসন্দ করতাম এবং কী অপসন্দ করতাম। আমি যা পসন্দ করতাম, এখন আমার কর্তব্য তার সাথে সেরকম আচরণই করা এবং যা আমি অপসন্দ করতাম তার সাথে সেই রকম আচরণ থেকে বিরত থাকা। এক চমৎকার মাপকাঠি। অন্যের সাথে কৃত প্রতিটি বিষয়কেই আপানি এর দ্বারা যাচাই করে নিতে পরেন।

দ্বিমুখী নীতি পরিহার করুন

আমাদের সমাজের একটি কঠিন ব্যাধি হল নিজের ও অন্যের প্রতি আচরণে দ্বিমুখী নীতির চর্চা। নিজের জন্য একরকম নীতি আর অন্যের জন্য অন্যরকম। নিজের জন্য যা পসন্দ করি অন্যের জন্য তা পসন্দ করি না আর নিজের জন্য যা অপসন্দ করি অন্যের ক্ষেত্রে সেটাই পসন্দ করছি। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কী শিক্ষা দিয়েছেন? আমরা যদি তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী অন্যের জন্যও তাই পসন্দ করতাম যা নিজের জন্য পসন্দ করি, তবে সমাজে কোন দ্বন্দ- কলহ থাকত কি? তখন তো অন্যের জন্য পীড়াদায়ক যে-কোন আচরণ থেকেই সকলে বিরত থাকত। ফলে দ্বন্দ্ব-কলহের কোন অবকাশই থাকত না। এই হচ্ছে আপসের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কয়েকটি মুলনীতি, আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ সব বোঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত; ১১ খণ্ড : ১৭০-২০৪ পৃষ্ঠা

পারিবারিক কলহের দ্বিতীয় সমাধান ধৈর্য ও সহনশীলতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গত রোববার পরিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ নিরসন সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করা হয়েছিল। অপর এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে আরও একটি ব্যবস্থা দান করেছেন, যা নিম্নরূপ,

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْمُسْلِمُ اِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ خَيْرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ

'হযরত ইবন 'উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মুসলিম মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের পক্ষ হতে যে কষ্ট পায়, তাতে সবর করে সে ওই মুসলিম অপেক্ষা শ্রেয়, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না, ফলে তাদের দেওয়া কষ্ট-ক্লেশে সবরও করতে হয় না।

(তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪৩১; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪০২২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৪৭৮৫)

কিছু মুসলিম আছে, যারা মানুষের সাথে মেলামেশা করে না, একা নিভৃত জীবন-যাপন করে, হয়ত কোন মসজিদে, মাদ্‌রাসায় বা 'ইবাদতখানায় নিভৃতচারী হয়ে থাকে, যাতে মানুষের সাথে কোন দেন-দরবারে না জড়াতে হয়। সে ভাবছে আমি নিভৃতে ইবাদত-বন্দেগী করে সময় কাটাব সেই তো ভাল। আরেক মুসলিম নিভৃত জীবনের বদলে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকাকেই বেছে নিয়েছে। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের সাথে ওঠা-বসা করে এবং সামাজিক সব কিছুতে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে আর তা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নানা রকম পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাতে অনেক সময় অন্যের দ্বারা কষ্ট-ক্লেশও পায়, কিন্তু সে তাতে সবর ও

সহনশীলতার পরিচয় দেয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

ইসলামে বৈরাগ্য নেই

আপনাদের তো জানাই আছে, ইসলামে খৃষ্টধর্মের মত সন্ন্যাসবাদের শিক্ষা নেই। খৃষ্টধর্মে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থিব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এবং সব রকম সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন না করবে ততক্ষণ সে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা এ রকম নয়। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষের সাথে মিলেমিশে থাক এবং তাতে তাদের পক্ষ থেকে কোন দুঃখ-কষ্ট পেলে ধৈর্যধারণ কর।

বড় বিস্ময়কর শিক্ষা। এ হাদীছে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা ও তাদের তরফ থেকে দুঃখ-কষ্ট পাওয়াকে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, এ দু'টো অবিচ্ছেদ্য। কার্যকারণের সম্পর্ক। যখন মানুষের সাথে মেলামেশা করবে, তাদের পক্ষ থেকে তোমাকে দুঃখ পেতেই হবে। কারও সাথে তোমার সম্পর্ক হবে আবার চাইবে তার দ্বারা তুমি কোন আঘাত পাবে না, এটা সম্ভব নয়। কেউ তোমার যত নিকটাত্মীয়ই হোক, যত প্রিয়জনই হোক তার পক্ষ হতে কোনও না কোনও কষ্ট তোমাকে পেতেই হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আঘাত পেতে হবে? বিষয়টা উপলব্ধি করা দরকার।

মানব চেহারা অপার কুদরতের নিদর্শন

আল্লাহ হযরত আদম 'আলাইহিস-সালামকে যখন সৃষ্টি করেন, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কত অগণ্য মানুষ জগতে এসেছে। আল্লাহ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা এভাবে আসতেই থাকবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে একটি মুখমণ্ডল দিয়েছেন। এক বিঘত পরিমাণের পরিসর। তাতে নাক-কান-চোখ-দাঁত-গাল কত কিছু। প্রত্যেকের চেহারায় এসব বিদ্যমান। কিন্তু এই অগণ্য কোটি মানব চেহারায় এমন দু'টি কেউ খুঁজে পাবে না, যার একটি হুবহু আরেকটির মত। সব চেহারাই কাছাকাছি মাপের। এর মধ্যে সকলেরই সব অঙ্গ আছে। এমন নয় যে, একজনের কান আছে তো অন্যজনের নেই। একজনের নাক আছে, কিন্তু অন্যজনের নেই। বরং প্রত্যেকটি অঙ্গই সকলের চেহারায় আছে। তা সত্ত্বেও দু'টি চেহারা অবিকল এক হয় না। প্রত্যেকের চেহারাই অন্যের থেকে ভিন্ন। এই প্রভেদ কেবল এ যাবৎকাল যত মানুষ জন্ম নিয়েছে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং নিত্য যে নতুন মানুষ পৃথিবীতে

আসে, সে স্বতন্ত্র এক চেহারা নিয়েই আসে। সে পূর্বের কোন মানুষের চেহারা নিয়ে আসে না। বরং নিজের পৃথক চেহারা নিয়েই আসে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে অন্য থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে বানিয়েছেন। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, এই ব্যক্তি অমুক আর ওই ব্যক্তি তমুক।

বর্ণবৈচিত্রে কুদরতের নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও সৃজনক্ষমতার আরও একটি নিদর্শন হল বর্ণবৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের মধ্যে একটা আছে সাধারণ রূপ, আরেকটা বিশিষ্ট রূপ। অর্থাৎ একটা রূপ তো সকলের মধ্যেই সাধারণভাবে বিদ্যমান। দেখলেই বোঝা যায়, এরা আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষ। ওরা ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত। প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠির আলাদা আকৃতি, আলাদা রং। সেই আকৃতি ও রং দ্বারা তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করা যায়। কিন্তু একই জাতি-গোষ্ঠীর প্রত্যেকের মধ্যেও এমন এক স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান, যা দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে অন্যদের থেকে তার পার্থক্য ফুটে ওঠে। একই জাতির দু'জনও কখনও একরকম হয় না। অর্থাৎ সাধারণ রূপ ও বিশিষ্ট রূপ-এ দুই-ই প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান। এসবই আল্লাহ তা'আলার কুদরতের প্রকাশ। মানুষের পক্ষে এ কুদরত কতদূর আয়ত্ব করা সম্ভব?

আঙুলের ডগায় কুদরতের নিশানা

সব ছেড়ে আঙুলের ডগায় লক্ষ করুন না। প্রত্যেকের আংগুলের ডগা অন্যসব মানুষ থেকে আলাদা। বিভিন্ন প্রয়োজনে কাগজপত্রে দস্তখতের পাশাপাশি আঙুলের ছাপও নেওয়া হয়। কারণ তাতে যে সূক্ষ্ম রেখার জাল পাতা আছে, তা একের সাথে অন্যের কখনও মেলে না। প্রত্যেকের রেখাবিন্যাস অন্যের থেকে আলাদা। এমনিতে দু'জনের আঙুল পাশাপাশি রেখে দেখুন, কোন প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হবে না। কিন্তু এটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও স্থিরীকৃত যে, দু'জন লোকের আঙুলের ছাপ কখনও এক রকম নয়। কারণ, উভয়ের রেখা বিন্যাসে পার্থক্য আছে। কাজেই কেউ যখন কাগজে আঙুলের ছাপ বা টিপ দেয়, তখন নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এটা অমুকের আঙুলের ছাপ, যেহেতু অন্য কারওটা তার সাথে মিলবে না।

ছাপ-বিশেষজ্ঞদের দাবি

সম্প্রতি এমন বিশেষজ্ঞও জন্ম নিয়েছে, যারা এ ছাপ সম্পর্কে বিস্ময়কর দাবি করেছেন। তারা বলেন, আমাদের সামনে কারও আঙুলের ছাপ রেখে

দিন। আমরা তার রেখাসমূহকে বড় করে তার ভিত্তিতে সেই ব্যক্তির পা থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরের ছবি এঁকে দিতে পারব। কেননা, সেইসব রেখাই বলে দেয়, তার চোখ কেমন, নাক কেমন, দাঁত কেমন, হাত কেমন ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা আঙুলের অগ্রভাগকেও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম

আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

'মানুষ কি মনে করে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করব না? অবশ্যই করব, আমি তার আংগুলের অগ্রভাগকেও হুবহু বানিয়ে দিতে সক্ষম।'

(কিয়ামা : ৩,৪)

কাফের-মুশরিকরা আখিরাতে বিশ্বাস করত না। তারা বলত, মরে গেলে মানুষ মাটি হয়ে যায়, অস্থিরাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যায়। এ অবস্থায় আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে? কে তা করবে? কিভাবে তা সম্ভব হবে? এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, মানুষ কি মনে করে, আমি তার অস্থিরাজি একত্র করতে পারব না? কেন তা পারব না? আমি তো তার আঙুলের ডগাসমূহ এখন যেমন আছে হুবহু এ রকমই পুনরায় বানিয়ে দিতে পারি। দুনিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক, সে যত বড়ই হোক না কেন, কারও আংগুলের ডগার অনুরূপ আরেকটি তৈরি করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তা অত্যন্ত সহজ।

আল্লাহ তা'আলার শক্তি অসীম। তিনি মানুষের চেহারা, তার হাত, পা ইত্যাদি সব কিছুই হুবহু আবার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি আয়াতে বিশেষভাবে আঙুলের অগ্রভাগের কথা বলেছেন এ কারণে যে, এর রেখা বিন্যাস তার কুদরতের এক মহাবিস্ময়।

আমি আমার মহান পিতার কাছে শুনেছি, জনৈক বিজ্ঞানী এ আয়াত পড়েই ইসলামগ্রহণ করেছিল। সে বলেছিল, এ কথা জগতস্রষ্টা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

'আমি আঙুলের অগ্রভাগকেও পুনরায় সৃষ্টি করতে পারি।'

একথা কেবল সেই সত্তাই বলতে পারেন, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের প্রতিটি অঙ্গ সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন এই মহাবিশ্ব।

আল্লাহ তা'আলার কুদরতের মহিমা

মোটকথা, কোনও লোকই আকার-আকৃতিতে অবিকল অন্যের মত হয় না। এ কারণেই আপাতদৃষ্টিতে দু'জনকে এক রকম মনে হলে তাজ্জবের সাথে বলা হয়, দেখ এ দু'জন লোক দেখতে একরকম। পৃথক হওয়ার কারণে কেউ তাজ্জুব প্রকাশ করে না। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের থেকে পৃথকই হয়। অথচ প্রকৃত বিস্ময় তো এরই মধ্যে যে জগতের প্রতিটি লোক অন্যের থেকে আলাদা হয় কিভাবে? সমস্ত লোক পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। সব আদম সন্তান এক রকমই তো হবে! কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কী মহিমা যে, তিনি অসংখ্য কোটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ একই আদম সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কেউ কারও মত নয়। পুরুষ নারীর মত নয়। এক পুরুষ অন্য পুরুষ বা এক নারী অন্য নারীর মত নয়। এক বর্ণ-গোষ্ঠীর মানুষ অন্য বর্ণ-গোষ্ঠীর মত নয়। আবার একই বর্ণ-গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে একটা সাধারণ মিলও আছে, যেমন আছে সমস্ত আদম-সন্তানের মধ্যে। অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও জাতিগত সাদৃশ্য-এর এক অপূর্ব সমাহার প্রতিটি মানুষের মধ্যে বর্তমান।

রুচি-স্বভাবগত বৈচিত্র্য

দু'জন মানুষের চেহারায় যখন এমন প্রভেদ তখন তাদের রুচিবোধ ও স্বভাব-প্রকৃতি কিভাবে একই রকম হতে পারে? বহির্দৃশ্য যখন এক রকম নয়, তখন অন্তর্জগতও যে ভিন্ন-ভিন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। একজনের স্বভাব এক রকম, অন্যজনের অন্যরকম, একজনের রুচিবোধ এক ধরনের, অন্যজনের অন্য ধরনের। প্রত্যেকের পসন্দ আলাদা, রুচি-প্রকৃতি আলাদা এবং বোধ-অনুভব আলাদা। তো মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি প্রত্যেকের যেহেতু আলাদা তখন দু'জন লোক এক সাথে থাকবে, একত্রে জীবন-যাপন করবে, পাশাপাশি চলাফেরা করবে, তা সত্ত্বেও একজন দ্বারা অন্যজন কখনও কোন দুঃখ পাবে না এটা কদাচ সম্ভব নয়। মেযাজ-মরজি আলাদা হওয়ার কারণে একজন দ্বারা অন্যজন ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় আঘাত পাবেই। কখনও দৈহিক আঘাত পাবে, কখনও আত্মিক। কখনও আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত পাবে এবং কখনও মানসিক পীড়ন বোধ করবে।

সাহাবায়ে কিরামের মেযাজেও বৈচিত্র্য ছিল

নবী-রাসূলগণের পর সাহাবায়ে কিরাম অপেক্ষা উত্তম মানুষ এই আকাশ ও পৃথিবী কখনও দেখেনি। আম্বিয়া 'আলাইহিমুস-সালামের পর তারাই

সর্বকালের সেরা মানুষ। তাদের চে' বেশি মুত্তাকী, বেশি আল্লাহভীরু, বেশী ত্যাগী ও ঈছারকারী এবং বেশি মানবহিতৈষী কোন লোক কখনও জন্ম নেয়নি। ভবিষ্যতেও জন্ম নেওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু সেই সাহাবায়ে কিরামের মরজি-মেযাজেও বৈচিত্র্য ছিল। তারা সকলে সমরুচির ও সমপ্রকৃতির ছিলেন না।

প্রিয়নবী ও তাঁর মহীয়সী স্ত্রীগণ

ভূ-পৃষ্ঠে কোন নারী নিজ স্বামীর প্রতি অতটা উৎসর্গিত, অতটা সমর্পিত, বিশ্বস্ত ও নিবেদিত ছিল না এবং থাকতে পারে না, যতটা ছিলেন প্রিয়নবীর প্রতি তার মহীয়সী স্ত্রীগণ। কিন্তু তাঁর কোনও কোনও ব্যাপার তাদের কাছেও মরজি ও অভিরুচির বিপরীত মনে হত এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেও কোনও কোনও ব্যাপার তবিয়তের পরিপন্থী হওয়ায় তাদের প্রতি কখনও কখনও মনঃক্ষুণ্ন হতেন। একবার তো সেই মনোকষ্টের কারণে একমাস তাদের কাছে না যাওয়ার কসম করেছিলেন এবং সে কসম তিনি রক্ষা করেছিলেন। (বুখারী, হাদীছ নং ৪৮০৩; মুসলিম, হাদীছ নং ২৭০৮)

প্রিয়নবীর প্রতি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর অসন্তোষ

কেবল আমাদের সেই মহীয়সী মায়েদের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে অভিমান দেখা দিত তাই নয়, বরং মান-অভিমানের পালা দু'দিক থেকেই হত। সুতরাং হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহাকে লক্ষ করে একবার সাইয়্যেদুল-আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি বুঝতে পারি হে 'আয়েশা! তুমি কখন আমার প্রতি খুশি থাক, কখন নাখোশ। আম্মাজান জিজ্ঞেস করলেন, তা কিভাবে? তিনি বললেন, কখনও যদি তোমার কসম করার দরকার হয় আর তখন আমার প্রতি প্রসন্ন থাক, তখন আমার নাম নিয়ে বল, 'মুহাম্মাদের রব্বের কসম'। আর যখন অপ্রসন্ন থাক, তখন হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস-সালামের নাম নিয়ে বল, 'ইবরাহীমের রব্বের কসম'। হযরত সিদ্দীকা (রাযি.) বললেন,

إِنِّي لَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ

'আমি ছাড়ি আপনার নামটাই যা, (না হয় আপনার ভালবাসা আমার হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য ধন। (বুখারী, হাদীছ নং ৪৮২৭; মুসলিম, ৪৪৬৯)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা বেশি মমতাবান ও দয়ালু আর কে হতে পারে ? বিশেষত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর প্রতি তাঁর যে গভীর ভালোবাসা ছিল, তা গুপ্ত কোন ব্যাপার নয়। অথচ সেই মহীয়সী মায়ের অন্তরেও কখনও কখনও তাঁর প্রতি অভিমান দেখা দিত এবং তা প্রকাশও পেয়ে যেত, যদ্দরুন মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ধরে ফেলতেন।

প্রকাশ থাকে যে, তাদের মধ্যকার এ মান-অভিমান ছিল কেবলই দাম্পত্য সম্পর্কজনিত। কাজেই এ রূপ ভাবা ঠিক হবে না যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেওয়া যেহেতু কুফ্‌রী, তাই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর পক্ষ থেকে এ রকম কোন আচরণ হলে তা খুবই খারাপ কথা! প্রকৃতপক্ষে এখানে দু'টি দিক আছে, সে দু'টিকে আলাদাভাবেই দেখতে হবে। একটা হল দাম্পত্য সম্পর্ক, আরেকটা নবী ও তাঁর উম্মতের মধ্যেকার সম্পর্ক। হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে মান-অভিমানের ব্যাপারটা তা কেবলই দাম্পত্যসংশ্লিষ্ট ভাবাবেগ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে নাজ-নখরা মান-অভিমান দেখা দেয়, তাকে একান্ত দাম্পত্য দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে; নবুওয়াত-রিসালাতে বিশ্বাস ও তদসংক্রান্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে একে যুক্ত করা সঠিক নয়।

হযরত আবূ বকর (রাযি.) ও হযরত 'উমর (রাযি.)-এর স্বভাব-মেযাজে পার্থক্য

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.) উম্মতের শ্রেষ্ঠতম দুই ব্যক্তি। তাঁদেরকে একত্রে 'শায়খায়ন' বলা হয়। নবীগণের পরেই তাদের মর্যাদা। তাদের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান ও উত্তম লোক ভূ-পৃষ্ঠে কখনও জন্ম নেয়নি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সল্লামের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল সর্বাপেক্ষা নিবিড়। তাঁদের পরস্পরেও ছিল অবিচ্ছেদ্য অন্তরংগতা। যুগলভাবেই নাম নেওয়া হত,

جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ذَهَبَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ

'আবূ বকর ও 'উমর এসেছেন, আবূ বকর ও 'উমর গিয়েছেন, আবূ বকর ও 'উমর বের হয়েছেন'।

যেখানেই নাম নেওয়া হয় দু'জনের এক সংগে নেওয়া হয়। এভাবেই তারা একপ্রাণ, একদেহ ছিলেন। যখন কোনও বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন

হয়, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দেন আবূ বকর ও 'উমরকে ডাক। দু'জনের মধ্যে কখনও বিচ্ছিন্নতা কল্পনা করা হত না।

এদিকে হযরত আবূ বকর (রাযি.)-এর প্রতি হযরত 'উমর (রাযি.)-এর অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। একবার তো তিনি বলেই ফেলেন, আমার জীবনে যত পুণ্য আছে সব নিয়ে নিন আর ছাওর পাহাড়ের গুহায় যে একরাত মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে কাটিয়েছেন তা আমাকে দিয়ে দিন'।

উভয়েই উভয়কে ভালোবাসতেন, সম্মান করতেন। তারপরও দু'জনের মরজি-মেযাজ কি একরকম ছিল? মোটেই নয় এবং সে কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভিন্নতাও দেখা দিত।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একবার দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) কোনও একটা কথা বলেন, যা হযরত উমর ফারূক (রাযি.)-এর কাছে অপ্রীতিকর মনে হয়। তিনি নারাজ হয়ে উঠে পড়েন। হযরত আবূ বকর (রাযি.) বুঝতে পারলেন তিনি কষ্ট পেয়েছেন। কাজেই তাকে খুশি করার জন্য নিজেও পেছনে-পেছনে ছুটলেন। হযরত 'উমর (রাযি.) যেতে যেতে একদম নিজ ঘরে ঢুকে পড়লেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রাযি.) আর কী করবেন ! যখন দেখলেন, তিনি খুব বেশিই নারাজ হয়ে গেছেন, ছুটলেন নববী দরবারে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূর থেকে তার চেহারা দেখে বা ওহী মারফত বিষয়টা জানতে পারলেন। হযরত আবূ বকর (রাযি.) মজলিসে পৌঁছার আগেই তিনি সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ করে বললেন, ওই যে তোমাদের বন্ধু আসছেন, আজ কারও সাথে ঝগড়া করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি মজলিসে পৌঁছে বসে পড়লেন, অন্যদিকে উমর (রাযি.) ঘরে ঢুকে দরজা তো বন্ধ করে দিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই ধাতস্থ হলেন। তখন খুব লজ্জিত হলেন। ভাবলেন, আমি খুবই খারাপ কাজ করেছি, প্রথমত হযরত আবূ বকর (রাযি.)-এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলাম, তারপর তিনি যখন আমার পেছনে পেছনে আসলেন, আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এই ভাবতেই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর পেছনে-পেছনে ছুটলেন। মসজিদে নববীতে পৌঁছে দেখেন, সেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা রয়েছেন। হযরত আবূ বকর (রাযি.)-ও উপস্থিত আছেন। তিনি সেখানে পৌঁছে নিজের অনুতাপ-অনুশোচনা প্রকাশ করতে লাগলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভুল হয়ে গেছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলতে লাগলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ ! ভুল আমারই ছিল। তাঁর তেমন ভুল নেই। আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। আসলে আমিই ভুল করেছিলাম। সব শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবীগণকে লক্ষ করে বললেন,

'তোমরা আমার সঙ্গীকে আমার জন্য ছেড়ে দেবে কি? আমি যখন বলেছিলাম, হে মানুষ! আল্লাহ আমাকে তোমাদের সকলের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তোমরা সকলে বলেছিলে 'তুমি মিথ্যা বলেছ', কেবল সেই বলেছিল 'আপনি সত্য বলেছেন'। কেবল সেই একমাত্র মানুষ, যে আমাকে বিশ্বাস করেছিল। (বুখারী, হাদীছ নং ৪২৭৪)

যা হোক হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও 'উমর ফারূক (রাযি.)-এর মত ব্যক্তিদ্বয়েরও মেজায-স্বভাবে পার্থক্য ছিল, যদ্দরুন তাদের মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটে।

স্বভাব-প্রকৃতির বৈচিত্র্য একটি অনঃস্বীকার্য বাস্তবতা

এর দ্বারা জানা গেল, দু'জন মানুষের মেজায-মরজি সম্পূর্ণ এক হয় না। আপনি যা চান, অন্যজনও সর্বদা তাই চাবে, এটা হতে পারে না। কোন পিতা যদি আশা করে তার পুত্র শতভাগ তার মরজি মত হবে কিংবা পুত্র যদি আশা করে তার পিতা শতভাগ তার মত সমর্থন করবে, তা এক অবাস্তব প্রত্যাশাই হবে। স্বামী যদি মনে করে, তার স্ত্রী সব কিছুতে তার ইচ্ছানুরূপ হবে কিংবা স্ত্রী মনে করে স্বামীও সকল ব্যাপারে তার ভাবনাই ভাববে, তা হবে অসম্ভব কল্পনা। বাস্তবে তা কখনও হতে পারে না।

সবর না করলে লড়াই বাঁধবেই

কাজেই মানুষের সাথে বাস করতে হলে বিরোধ-বিসম্বাদকে মানতেই হবে আর তার অনিবার্য ফল হল অন্যের দ্বারা কোনও না কোনওভাবে কষ্ট পাওয়া। মানুষের সাথে সহাবস্থান করা ও তাদের দ্বারা আঘাত পাওয়া-এ দুয়ের মধ্যে কার্যকারণের সম্পর্ক। এ দুয়ের মধ্যে ছেদ সম্ভবই নয়। সুতরাং অন্যের সাথে যখন চলতেই হবে, তখন আঘাতের জন্যও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাতে সবরের পরিচয় দিতে হবে। সবর না করলে সংগ্রাম অনিবার্য। আর পরস্পরে ঝগড়া-ফাসাদ, লড়াই-সংগ্রাম মানুষের দ্বীনকে বরবাদ করে দেয়।

অতএব, যার সাথে কোনও রকমের সম্পর্ক আছে, তা আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক হোক, দাম্পত্য সম্পর্ক হোক বা হোক অন্য কোনও

ধরনের সম্পর্ক, মেযাজগত পার্থক্যের কারণে তার দ্বারা কোনও না কোনও কষ্ট পাবেন এটাই স্বাভাবিক। সংকল্প করে নিন, সে সব দুঃখ-কষ্টে অবশ্যই সবর করব। কোনও বিরোধ বা আঘাতকে পরস্পরে হানাহানির মাধ্যম বানাব না। একত্রে থাকলে অল্প-বিস্তর তিক্ততা দেখা দেবেই, কিন্তু সেই তিক্ততাকে বিদ্বেষ ও শত্রুতায় পর্যবসিত করা কিছু বুদ্ধির কাজ নয়।

দুঃখ-বেদনা থেকে বাঁচার উপায়

প্রশ্ন হচ্ছে, অন্যের সাথে মেলামেশার কারণে আপনাকে যখন কষ্ট পেতে হচ্ছে, তখন নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার উপায় কী? মত ও মেজাযের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মহব্বতই বা কিভাবে সৃষ্টি করা যাবে? এরও ব্যবস্থা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে গেছেন। কোন ব্যাপারেই তিনি পিপাসা বাকি রেখে জাননি। সুতরাং দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

'কোন মু'মিন পুরুষ যেন মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে, তাঁর কোন একটা বিষয় তার অপ্রীতিকর মনে হলে অন্য একটা বিষয়ে সে প্রসন্ন হবে'।

(মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৭২: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৮০১৩)

স্বভাব-রুচির বিপরীত বিষয় সর্বাপেক্ষা বেশি দেখা দেয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কারণ, তাদের সম্পর্কই সর্বাপেক্ষা বেশি ঘনিষ্ঠ। আর সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হয় দ্বিপাক্ষিক কার্যাবলীও তত বেশি হয়। ফলে মেযাজবিরোধী কাজ ঘটার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে একের দ্বারা অন্যের আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনাও অন্যান্য সম্পর্ক অপেক্ষা বেশি থাকে। এজন্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ করে এই মহা-ব্যবস্থাটি দান করেছেন।

বলা হয়েছে, কোন স্বামী যেন বিশেষ কোন ঘটনার কারণে স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে ঘৃণার চোখে না দেখে। কেননা, স্ত্রীর সেই ব্যাপারটি তার অপসন্দ হলেও তার মধ্যে এমন বহু কিছু থাকবে যা সে ঠিকই পসন্দ করবে। অধিকাংশ পুরুষের কাজ হল স্ত্রীর দ্বারা তার মেযাজের বিপরীত কোন একটা কাজ হয়ে গেলে সে সেটাকে নিয়েই লেগে পড়ে। সে এই করেছে, ওই করেছে, তার মধ্যে এই দোষ আছে, ওই দোষ আছে ইত্যাদি। ব্যস একটা দোষের কারণে সে আপাদমস্তক দূষিত হয়ে যায়। তার মধ্যে যেন আর কোন গুণ থাকতে পারে না। এ হাদীছ বলছে, একটাকে ধরে বসে থেক না। তার

মধ্যে ভালো গুণও অবশ্যই থাকবে। তার একটা তোমার অপ্রিয় লাগলে তার অন্যান্য দিকে দৃষ্টিপাত কর। তখন প্রীতিকর অনেক কিছুই পেয়ে যাবে। যখন সেগুলো কল্পনা করবে, এই একটা দোষ হালকা হয়ে যাবে।

কেবল ভালো দিকগুলোতেই দৃষ্টি দিন

মনে রাখবেন, দুনিয়ায় এমন কোনও মানুষ পাবেন না, যে আপদমস্তক ভালো, যার মধ্যে কোন দোষ নেই, সম্পূর্ণ নির্দোষ-নিখুঁত। আবার এমন কোনও মানুষও নেই, যে আপাদমস্তক মন্দ, যার মধ্যে কোন ভালো গুণ নেই। কারও মধ্যে দোষ আছে তো, কোনও না কোনও ভালো গুণও আছে আবার ভালো গুণ আছে তো কোনও না কোনও দোষও আছে। তাই তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা স্ত্রীদের ভালো দিকে নজর দাও। তা হলে বুঝতে পারবে, তাদের মধ্যে অপ্রীতিকর কিছু থাকলেও মূল্যবান ও প্রশংসনীয় অনেক বিষয়ও আছে, এরূপ ভাবতে পারলে অন্তরে ধৈর্য জন্ম নেবে।

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির বড় চমৎকার এলাজ করেন। সে তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল, বলছিল, তার মধ্যে এই-এই দোষ আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে এতই যদি মন্দ ও অসহনীয় হয়, তবে তালাক দিয়ে দাও। একথায় তার মগজ ধোলাই হয়ে গেল। ভাবল, তাকে যদি তালাক দিয়ে দেই আর সে চলে যায়, তবে পরে আমার কী দশা হবে? তখন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে ছাড়া তো আমার সইবে না। তিনি বললেন, তবে রেখেই দাও'। (নাসাঈ, হাদীছ নং ৩৪১১)

অর্থাৎ যখন তার দোষও আছে, আবার তাকে ছাড়া থাকতেও পারবে না, তখন এর প্রতিকার তাকে রেখে দেওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে। অর্থাৎ তাকে নিয়েই চল আর অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে তাতে ধৈর্য ধর। হ্যাঁ তার সংশোধনকল্পে তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব চেষ্টাও কর।

স্ত্রীর গুণাবলী কল্পনা করুন

প্রশ্ন হতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে স্ত্রীর দোষ উল্লেখ করলে তিনি সোজা তাকে তালাক দিয়ে দিতে বললেন, এর কারণ কী? এর উত্তর হল, আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্প্রসারিত করা। তালাকের নির্দেশ তার একটা কৌশলমাত্র। সে স্ত্রীর কেবল দোষই দেখছিল। তার অন্তরে স্ত্রীর

মন্দ দিক এমনভাবে বসে গিয়েছিল যে, তার মধ্যে যে কোন সদগুণও থাকতে পারে সেই চিন্তাই তার মধ্যে জাগছিল না। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘুমন্ত চেতনাকে খুঁচিয়ে জাগাতে চাচ্ছিলেন। তালাকের নির্দেশ ছিল সেই খোঁচা। বললেন, স্ত্রী যদি এতটাই মন্দ হয়, তাকে তালাক দিয়ে দাও। এ নির্দেশ তাকে হুশিয়ার করে তোলে। চিন্তা করল, স্ত্রী দ্বারা আমার এই কাজ হয়, ওই কাজ হয়, তার সাথে আমার জীবনের বহুকিছু জড়িত। তালাক দিয়ে দিলে সেসব কে সামলাবে। তখন আমার কী দশা হবে? জীবন কিভাবে কাটবে? সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে ছাড়া তো আমি সইতে পারব না। এবার তিনি মূল উদ্দেশ্যে আসলেন। বললেন, তবে তাকে রেখেই দাও।

মন্দের দিকে দৃষ্টি রাখার পরিণাম

যখন কারও মন্দের দিকে দৃষ্টি যায়, অন্তরে যখন তার মন্দত্ব বসে যায় এবং সে 'মন্দ' এটাই ধ্যানের বিষয় হয়ে যায়, তখন তার সদগুণগুলোর দিক থেকে চোখে পর্দা পড়ে যায়। ফলে তা আর চোখে পড়ে না আর তখন সেই মূর্তিমান মন্দের সাথে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। তাই কেবল মন্দের দিকে নজর না দিয়ে তার সদগুণাবলীর কথাও ভাবুন। তাতে অন্তরে তার মূল্য বাড়বে, তার প্রয়োজন অনুভূত হবে এবং তাতে শান্তি লাভ হবে।

ত্রুটি আপনার দ্বারাও হতে পারে

কারও কোন ব্যাপার নিজের কাছে অপ্রীতিকর বোধ হলে, তার সে ব্যাপারটাই যে নিশ্চিত ভুল, এমন নাও হতে পারে। বরং এটাও সম্ভব যে, ভুল আপনারই। নিজ তবীয়তের কাছে পরাভূত হওয়ার কারণে তা বুঝতে পারছেন না। আবার ত্রুটি তার হওয়াও অসম্ভব নয়। মোটকথা, মেযাজ-মরজির প্রভেদকেও মাথায় রাখতে হবে।

মনে করুন, এক ব্যক্তির এক রকম খাবার পসন্দ। অন্য ব্যক্তির অন্যরকম। একজনের করলা খেতে ভালো লাগে, খুব রুচিকর বোধ হয়। কিন্তু অন্যজনের তা পসন্দ নয়। এমন তিতা বস্তুও খাওয়া যায়? মূলত এটা রুচি-মেযাজের পার্থক্য। এস্থলে যে বলছে, আমার করলা খেতে ভালো লাগে তার কথা যেমন গলদ নয়, তেমনি যার তা রোচে না, তারও দোষ নেই। এখানে দোষ বা ভুল কারও নয়। কেবল রুচির পার্থক্য, মেযাজের বৈচিত্র্য। দু'জনই আপন-আপন জায়গায় ঠিক আছে।

বৈধ সকল ক্ষেত্রেই বিষয়টা এ রকম। তাতে মতভিন্নতা দেখা দিলে একজনের মতকে ন্যায় এবং অন্যজনের মতকে অন্যায় বলা যায় না। বরং আপন-আপন-স্থলে উভয়কেই সঠিক বলতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে যত মতভিন্নতা দেখা দেয়, তার অধিকাংশই এ রকম। তাদের মধ্যেও রুচি-প্রকৃতির প্রভেদ থাকে; বরং বেশিই থাকে। যখন দু'জন পুরুষ বা দু'জন নারীর রুচি-প্রকৃতি এক হয় না, তখন একজন নারী ও একজন পুরুষ সমরুচি ও সমপ্রকৃতির হবে এটা কি করে ভাবা যায়? বরং এ ক্ষেত্রে তো প্রভেদ অনেক বেশিই হবে। নারীর এক রকম স্বভাব, এক ধরনের রুচি আর পুরুষের অন্যরকম। পুরুষ নিজ মানসিকতা অনুযায়ী চিন্তা করে এবং নারী তার মানসিকতা অনুযায়ী। তাই ফলাফল হয় ভিন্ন ভিন্ন। তা যে সব সময় ভুলই হবে এমন কোন কথা নেই। আর কারও ভুল হলেও তার সবটাই যে ভুল তাও ভাবা ঠিক নয়। একারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশনা দিয়েছেন, তার কেবল ভুলটাই দেখ না। মন্দেই নজর রেখ না। সদগুণাবলীর প্রতিও দৃষ্টিপাত করো। তখন আর মনে তার প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না।

সোজা করতে গেলে ভেঙে ফেলবে

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে পাঁজরের হাড়ের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন,

الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهَا عِوَجٌ

নারী পাঁজরাস্থির মত। তুমি তাকে সোজা করতে চেষ্টা করলে ভেঙে ফেলবে। আর যদি তাকে দিয়ে ফায়দা লাভ করতে চাও, তবে তাকে তার বক্রতার অবস্থাতেই ফায়দা লাভ করতে পারবে।

(বুখারী, হাদীছ নং ৪৭৮৬; মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৬৯; তিরমিযী, হাদীছ নং ১১০৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৯৪১৯)

কেউ কেউ মনে করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নারীদেরকে পাঁজরের হাড়ের সাথে তুলনা করেছেন। এর দ্বারা নারীদের নিন্দা করা হয়েছে। সুতরাং অনেকে নারীদের নিন্দা করতে গিয়ে এ হাদীছের উদ্ধৃতি দেয়। স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বা মনোমালিন্য দেখা দিলে তাকে লক্ষ করে বলে, 'ওহে বাঁকা হাড়, তোমাকে সোজা করে ফেলব'।

তারা হাদীছটির সঠিক মর্ম বোঝেনি। তারা চিন্তা করে না যে, পাঁজরের হাড় বাঁকা না হয়ে সোজা হলে সেটি কোন কাজের থাকবে না। এবং সেটি

পাঁজড়ে জোড়ার উপযুক্তও থাকবে না। পাঁজরের সৌন্দর্য তো বক্রতার মধ্যেই; বরং তার সুস্থতা ও সুষ্ঠতাও বক্রতায়। কারও পাঁজর সোজা হয়ে গেলে সেটা তার কঠিন ব্যাধি বলেই বিবেচিত হবে।

বক্রতা একটি আপেক্ষিক জিনিস

বস্তুত বক্রতা ও ঋজুতা একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। একটি বস্তুতে এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেটিকে সোজা মনে হয় আর সেটিকেই অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাঁকা হয়ে যায়।

ওই সামনের সড়কটিকে মসজিদের ভেতর থেকে দেখুন, বাঁকা বোধ হবে। কারণ, মসজিদের তুলনায় ওটি বাঁকা। আবার সড়কে দাঁড়িয়ে লক্ষ করুন, মনে হবে একদম সোজা। তখন মসজিদকেই বাঁকা মনে হবে। অথচ না মসজিদ বাঁকা, না সড়ক। মসজিদের জন্য কিবলামুখী হওয়ার শর্ত ছিল, যা সড়কের জন্য ছিল না, সে কারণেই উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য। বোঝা গেল কোন বস্তুর সোজা-বাঁকা হওয়ার ব্যাপারটা আপেক্ষিক গুণ। একটি বস্তু এক বিবেচনায় বাঁকা হলেও সেটিই অন্য বিবেচনায় সোজা হতে পারে।

এ হাদীছ দ্বারা নারী-পুরুষের রুচি-প্রকৃতিগত প্রভেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নারীদের রুচি-প্রকৃতি তোমাদের থেকে পৃথক হওয়ায় তোমাদের তুলনায় তা বাঁকা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বক্রতা তাদের স্বভাবগত বিষয়। যেমন পাঁজরের হাড় স্বভাবগতভাবেই বাঁকা। তার পক্ষে সেই বক্রতাই সঠিক। কোন কারণে সোজা হয়ে গেলে তা একটা দোষ ও রোগ বলেই গণ্য হবে এবং ডাক্তার পুনরায় তা বাঁকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেবে।

সুতরাং এ হাদীছ দ্বারা নারীদের নিন্দা করা হচ্ছে না। বরং বলা হচ্ছে, তাদের রুচি-প্রকৃতি তোমাদের থেকে আলাদা। তাই তোমাদের দৃষ্টিতে বাঁকা মনে হয়। এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, তোমরা তাদেরকে সোজা করার ফিকির করো না। কেননা, তাদেরকে সোজা করলে তা পাঁজরের হাড় সোজা করার মতই হবে। তাদের সোজা করতে যাবে তো ভেঙে ফেলবে। তারচে' তাদেরকে আপন অবস্থায়ই থাকতে দাও। তা হলে সেই বক্রতা অবস্থায়ই তোমরা তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

ছুতার ও ঈগল

'আরবী ভাষা শিক্ষার একখানি পুস্তকের নাম মুফীদুত-তালিবীন, তাতে একটা গল্প আছে যে, এক রাজার একটা ঈগল ছিল। একবার সেটি উড়ে এক ছুতারের বাড়ি গিয়ে পড়ল। ছুতার সেটি ধরে পুষতে শুরু করল। তার

নজর পড়ল ঈগলটির ঠোঁট ও পাঞ্জায়। তা বাঁকা দেখে তার খুব আফসোস হল, আহা বেচারা পাখি, আল্লাহর অবোধ সৃষ্টি। ঠোঁট বাঁকা, পাঞ্জা বাঁকা। ওর খেতে, চলতে না জানি কত কষ্ট। ওর এ কষ্ট দূর করা উচিত। ব্যস, কাঁচি নিয়ে তার ঠোঁটের বাঁকা অংশটুকু কেটে দিল। তারপর পাঞ্জার বক্রতাও কেটে সোজা করল। তা সোজা তো করল কিন্তু ঈগল আর ঈগল থাকল না। একে তো সেই অপারেশনে সে রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, তারপর তার খাওয়া ও চলা দুই-ই বন্ধ হয়ে গেল।

নির্বোধ ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হিসেবে গল্পটি বলা হয়ে থাকে। ছুতার পাখিটিকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সে ভালোবাসার প্রকাশ হয়েছিল নির্বুদ্ধিতার সাথে। সে চিন্তা করে দেখেনি ঠোঁট ও পাঞ্জার বক্রতা ঈগলের প্রকৃতিগত। আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টিই করেছেন এভাবে। ফলে এতেই তার সুবিধা এবং এটাই তার সৌন্দর্য। বক্রতা না থাকলে এ পাখি ঈগল নামের উপযুক্ত হত না।

মোটকথা দু'জন লোকের যখনই কোন সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তা নারী হোক বা পুরুষ, তখন সে সম্পর্কের কারণে তাদের রুচি-প্রকৃতিগত প্রভেদ অবশ্যই প্রকাশ পাবে এবং তার ভিত্তিতে একজন দ্বারা অন্যজন অবশ্যই দুঃখ কষ্ট পাবে। সে ক্ষেত্রে দু'টি পথ আছে। হয় তারা পরস্পরে কলহে লিপ্ত হবে এবং সর্বক্ষণ সেই কষ্টকে কেন্দ্র করে হানাহানিতে লেগে থাকবে। এ পন্থা অবলম্বন করলে জীবনে কখনও শান্তি লাভ হবে না। মৃত্যু পর্যন্ত ঝগড়া-বিবাদ করেই কাটাতে হবে।

দুঃখ-কষ্টে সবর করুন

আর দ্বিতীয় পন্থা হল সবরের। যখন সঙ্গী-সাথী দ্বারা কষ্ট পাবেন, তখন চিন্তা করবেন, রুচি-প্রকৃতি যখন ভিন্ন-ভিন্ন, তখন একের দ্বারা অন্যের কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এক সাথে চলতে তো হবে, সে চলাটাও খু-ব বেশি দিনের নয়। এ জীবন বড় সংক্ষিপ্ত। এখানে চিরদিন থাকা যাবে না। কে জানে কখন ডাক এসে যায়। দু'দিনের এ জীবনে সঙ্গীর দ্বারা কোন আঘাত পেলে তাতে তেমন কি এসে যায়। ঝগড়া করলে যন্ত্রণাই বাড়বে। তারচে' সবর করি। শান্তির পক্ষে সবরই সহায়ক। এ কথা ঠিক যে, আঘাত যখন লাগে, মনে উত্তেজনা দেখা দেয়, রাগ ওঠে এবং ইচ্ছা হয় এখনই প্রতিশোধ নেই, তাকে দু'কথা শুনিয়ে দেই, অন্যের কাছে বলে বেড়াই: গীবত করি ও বদনাম রটাই।

কিন্তু প্রতিশোধে লাভ কী?

এসব কিছুর ইচ্ছা জাগে, কিন্তু এটাও ভাবুন যে, তাতে লাভ কী? ঝগড়া-বিবাদ করে মনের ঝাল মিটল এই তো? কিন্তু আসলে কি ঝাল মেটে? একবার যখন শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠেছে, সে আগুন অত সহজে নেভে না। বরং এসব আচরণ তাতে আরও ইন্ধন জোগায়।

আর যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, কিছুটা লাভ আছে। লড়াই করার পর মন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতে গেলে নিজের পক্ষ থেকে অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। সঙ্গীর দ্বারা আঘাত যতটুকু পাওয়া গিয়েছিল, বিপরীতে প্রতিঘাত একটু বেশিই করা হয়। সেই বেশিটুকুর জন্য কিয়ামতের দিন তো কৈফিয়ত দিতে হবে। এর জন্য তখন যে শাস্তি ভোগ করতে হবে, তার বিপরীতে দুনিয়ার এসব আঘাত অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তারচে' বরং সবর করুন এবং ভাবুন যে, সে আমাকে যে কষ্ট দিয়েছে, তাতে সবর করলে অনেক লাভ। সেই লাভের খাতিরে এসব খুঁটিনাটি আল্লাহ তা'আলার হাওয়ালা করি না কেন?

সবরে যা লাভ

সবর করলে কী লাভ সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা শুনুন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

'নিশ্চয়ই সবরকারীদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে হিসাবের বাইরে।'

(যুমার : ১০)

অর্থাৎ কোন রকম হিসাব-নিকাশ নেই। বিনা হিসেবে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে পরিমাণ বলে দিতে পারতেন। কিন্তু সে পরিমাণ এত বিপুল, যা আমাদের জানা সংখ্যা দ্বারা আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়। গনার জন্য আমাদের সংখ্যা বড় সীমিত। হাজার-লাখ-কোটি ইত্যাদি হিসাবই তো আমরা করি। এক সময় আমাদের সংখ্যা শেষ হয়ে যায়। তার বাইরে আর গুনতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা চাইলে সবরের প্রতিদান গনার জন্য কোন সংখ্যা সৃষ্টি করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি বলে দিয়েছেন সবরের প্রতিদান দেওয়ার জন্য কোন হিসাবই করা হবে না।

উদাহরণত কেউ আপনাকে একটা ঘুষি মারল। এখন প্রতিশোধে আপনিও যদি তাকে একটা ঘুষি মারেন, তা আপনার জন্য জায়েয হবে, কিন্তু তাতে আপনি পেলেন কী ? কিছুই নয়। পক্ষান্তরে যদি সবর করেন, প্রতিশোধ না

নেন, তবে আপনার জন্য আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা হল তিনি আপনাকে এত বেশি প্রতিদান দেবেন, যা আপনি গুনে শেষ করতে পারবেন না। সেই প্রতিদানের কথা চিন্তা করে সবর করুন, প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষতি অনেক। আখিরাতের প্রতিদান তো মাটি হয়ই, সেই সঙ্গে কষ্টদাতার পেছনে লাগার কারণে কত সময় নষ্ট হয়ে যায়। সময় নষ্টের মত ক্ষতি আর কী হতে পারে? কেউ আপনাকে জানাল অমুকে ভরা মজলিসে আপনার বদনাম করেছে। এ কথাটি যদি আপনি জানতে না পারতেন, তবে কিছুই হত না। ওই লোকটি জানানোর কারণে আপনার মনে আঘাত লেগেছে। এখন আপনি অনুসন্ধান শুরু করে দিলেন সেই মজলিসে কে-কে ছিল। তাদের প্রত্যেকের কাছে যাবেন আর জিজ্ঞেস করবেন সে আপনার কী বদনাম করেছে। এভাবে প্রত্যেকের থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আপনার সবটা সময় বরবাদ করে দিলেন। তার বিনিময়ে আপনি পেলেন কী? কিছুই নয়। কিছুই নয়। তারচে' আপনি যদি চিন্তা করতেন, সে বদনাম করেছে তো কী হয়েছে? সে ভালো বললেই আমি ভালো হয়ে যাব না আর সে মন্দ বললেই আমি মন্দ হয়ে যাব না। আমার ভালো-মন্দ হওয়ার সম্পর্ক তো আমলের সাথে, আল্লাহ তা'আলার সাথে যদি আমাদের সম্পর্ক ঠিক থাকে, তবে সারা জগত যাই বলুক না কেন তার পরওয়া কী?

خلق کہتی ہے او دیوانہ و دیوانہ پکارے

'সবাই বলে পাগল ওযে, পাগল আছে নিজ কাজে'। সারাটা জগতও যদি আমার নিন্দা করে বেড়ায় তা করুক না। আমার ব্যাপার তো আল্লাহর সাথে। এই চিন্তা করে যদি আপনি নিজ কাজে লেগে থাকেন, তবে সেটা

صبر علی الاذی

'অন্যের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ'রূপে গণ্য হবে, যার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা অপরিমিত প্রতিদান দেবেন।

প্রতিশোধ গ্রহণে ইনসাফ রক্ষা

অগত্যা যদি মনের জ্বালা মেটানোর জন্য বদলা নিতেই মনস্থির করেন, তবে সে ক্ষেত্রে ইনসাফের কথাটাও মনে রাখতে হবে। বদলা নেওয়া বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হল সমতা রক্ষা। সেই সমতা মাপার মানদণ্ড আপনি কোথায় পাবেন? প্রতিশোধ যদি এক ইঞ্চি বা এক গ্রাম বেশি নিয়ে ফেলেন, সে জন্য আখিরাতে যে ধরা খেতে হবে তার পরিমাণ আপনি কি দিয়ে

করবেন? সুতরাং বদলা নেওয়ার অধিকার আপনার আছে বটে, কিন্তু তা বড় বিপজ্জনক। অথচ সবর ও ক্ষমা বড় লাভজনক। অপরিমিত প্রতিদান পাওয়া যাবে। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

'আর তোমরা সবর করলে সবরকারীদের জন্য সেটাই উত্তম।'

(নাহল : ১২৬)

সারকথা, মানুষের সাথে মেলামেশা, যোগাযোগ ও লেনদেন করতে গেলে তাদের পক্ষ হতে কিছু দুঃখ-কষ্টও আসবে। কিন্তু তাতে সবর করাই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা। প্রত্যেকে যদি এ শিক্ষা অনুসরণ করে এবং নিজ রুচি-প্রকৃতির যত বিপরীত আচরণই অন্যের দ্বারা ঘটুক, তাতে সবর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে যায়, তবে দুনিয়া থেকে সব দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান হতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং আপনাদের সকলকেও এর যথার্থ অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত; ১১ খণ্ড :২০৬-২৩৮ পৃষ্ঠা

পারিবারিক কলহের তৃতীয় সমাধান
ক্ষমা ও উদারতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ،

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَحَدٌ اَصْبَرُ عَلٰى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ يَدَّعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ

'গেল রোববার একটি হাদীছ পড়েছিলাম এবং তার ব্যাখ্যায় আরয করেছিলাম যে, মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ, দ্বন্দ্ব-কলহ ও হিংসা-বিদ্বেষ অত্যন্ত কঠিন দ্বীনী ও সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাধির প্রতিকার হিসেবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন নির্দেশনা দান করেছেন। তার মধ্যে একটা নির্দেশনা হল সবরের চর্চা। গত বয়ানে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাতে অন্যের দ্বারা কোন দুঃখ-কষ্ট পেলে তাতে সবর করে, সে ওই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম, যে মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখে না, ফলে তাদের দ্বারা কোন দুঃখ-কষ্ট পাওয়া ও তাতে সবর করারও অবকাশ আসে না।

(তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪৩১: ইবন মাজাহ,হাদীছ নং ৪০২২: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৪৭৮৫)

এর দ্বারা বোঝা যায়, পারস্পরিক দন্দ-কলহের একটা বড় কারণ অন্যের পক্ষ হতে প্রাপ্ত দুঃখ-কষ্টে সবর না করা। একত্রে চললে একের দ্বারা অন্যের কিছু না কিছু দুঃখ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মু'মিনের কর্তব্য তাতে সবরের পরিচয় দেওয়া।

সর্বাপেক্ষা বড় সবরকারী সত্তা

এই নির্দেশনাটির প্রতি গুরুত্বারোপের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটি বক্তব্য দান করেছেন। সেই হাদীছই আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি। এটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ মুসা

আশ'আরী (রাযি.)। এতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অন্যের পক্ষ হতে যে আঘাত আসে তাতে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। লোকে বলে তার সন্তান আছে, অথচ তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখেন এবং তাদেরকে জীবিকা দান করেন।

(বুখারী, হাদীছ নং ৬৮৩০:মুসলিম, হাদীছ নং ৫০১৬;
মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৮৭০৬)

'আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে'-এটা অত্যন্ত গুরুতর কথা এবং এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য পীড়াদায়ক, যদিও তিনি সকল ব্যথা-বেদনার উর্ধ্বে। খৃষ্ট সম্প্রদায় বলে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস-সালাম আল্লাহর পুত্র, একদল ইয়াহূদী বলে, হযরত 'উযায়র 'আলাইহিস-সালাম আল্লাহ তা'আলার পুত্র, কোন কোন মুশরিক বলে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা, কেউ পাথর, গাছ, গরু, সাপ ইত্যাদিকে উপাস্য বানিয়ে তাদের পুজা করে, অথচ তিনিই সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির আগে তিনি ফিরিশতাদের সামনে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে আমার খালিফা বানাতে যাচ্ছি'। সেই মানুষই কিনা অন্যকে আল্লাহ তা'আলার শরীক বানিয়ে তার পূজা করছে।

আল্লাহ তা'আলার অপার সহনশীলতা

এসবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মানুষের পীড়াদায়ক কাজ, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সহনশীলতা দেখুন, মানুষের এসব কীর্তি কলাপ তিনি দেখছেন, শুনছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন, রিযকও দিচ্ছেন। তাকিয়ে, দেখুন জগতে কাফের-মুশরিকের সংখ্যা কত বেশি। সব যুগেই তাদের সংখ্যা বেশি ছিল। কুরআন মাজীদে ইরশাদ,

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

'পৃথিবীতে যারা বাস করে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা মত চললে তারা অবশ্যই আপনাকে বিপথগামী করবে'। (আন'আম : ১১৬)

কেননা, দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই কুফ্র ও শির্কে লিপ্ত।

গণতান্ত্রিক দর্শনের পরিণাম

আধুনিক বিশ্বের চারদিকে শুধু গণতন্ত্রের ডামাডোল। বলা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যা বলে সেটাই সত্য। এ নীতি স্বীকার করে নিলে বলতে

হবে কুফ্‌র সত্য ও ইসলাম বাতিল-না'উযুবিল্লাহ। কেননা ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ মানুষই তো কুফ্‌র ও শিরকে লিপ্ত। যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে অর্থাৎ যারা মুসলিম নামে পরিচিত, তাদের মধ্যেও জরিপ করলে দেখা যাবে যথাযথভাবে শরী'আত মেনে চলা লোকের সংখ্যা অতি সামান্য এবং যারা শরী'আতের ব্যাপারে চিন্তাহীন ও বেপরওয়া এবং ফাসিকী কাজ ও পাপাচারের মধ্যেই দিন কাটায় তাদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি।

অমুসলিমদের প্রতি সদ্ব্যবহার

ভূ-পৃষ্ঠে নিরন্তর শিরক, কুফ্‌র ও পাপাচার হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করা হচ্ছে। এসব দেখা সত্ত্বেও মহান প্রতিপালক যারা এসব করছে তাদেরকে পর্যন্ত অবিরত রিযক দিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে রাখছেন এবং তাদের উপর নি'আমতের বৃষ্টি বর্ষণ করছেন। এই হল আল্লাহ তা'আলার সহনশীলতা। এমন সব বেদনাদায়ক কাজে আল্লাহ অপেক্ষা বেশি ধৈর্য আর কে ধারণ করতে পারে? সা'দী (রহ) বড় চমৎকার বলেছেন,

بر خوان یغما چہ دشمن چہ دوست

আল্লাহর দস্তরখানে শত্রু-বন্ধুর কোন ভেদাভেদ নেই।

বিশ্বব্যাপী যে মহা দস্তরখান তিনি বিছিয়ে রেখেছেন, দোস্ত-দুশমন সকলেই তাতে খাচ্ছে। তিনি অবারিতভাবে সকলকে খাওয়াচ্ছেন। কাফের ও মুশরিকদের দিকে দৃষ্টি দিন। রাশি রাশি তাদের সম্পদ। অথচ অনেক মুসলিমকে অভাব-অনটন ও ক্ষুধার কষ্টও ভোগ করতে হয়। আল্লাহ তাআলা তাদের সব কিছু দেখেও সহনশীলতার আচরণ করছেন এবং তাদেরকে শান্তি নিরাপত্তা ও জীবিকা দান করছেন।

আল্লাহ তা'আলার গুণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন

আল্লাহ তা'আলার সহনশীলতা দেখুন, তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ মোতাবেক আমল করুন। তিনি বলেন, تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللهِ 'তোমরা আল্লাহ তা'আলার আখলাক ও তাঁর গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা কর।'

(বারীকাঃ মাহ্‌মুদিয়্যাঃ, ৪খ,২পৃ.; তাফসীরুর-রাযী, ৪খ, ৪৪৪: রূহুল-মা'আনী, ২৩ খ, ৩১ পৃ.)

শতভাগ তো অর্জন করা সম্ভব নয়; কিন্তু আপন ক্ষমতা অনুযায়ী তোমার মধ্যেও যাতে এসে যায় সেই চেষ্টা কর। আল্লাহ জাল্লা শানুহু যখন মানুষের এসব দুষ্কর্মে এতটা সবর করছেন, তখন হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরাও সবরের পরিচয় দাও। অন্যের দ্বারা তোমরা যে দুঃখ-বেদনা পাও তাতে সহনশীলতা প্রদর্শন কর।

দুনিয়ায় প্রতিশোধগ্রহণ থেকে বিরত থাকুন

কেউ বলতে পারে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় সবর করছেন, কাফের ও মুশরিকদেরকে শান্তি, নিরাপত্তা ও জীবিকা দিচ্ছেন, তারা দুনিয়ায় ক্রমোন্নতি লাভ করছে, কিন্তু আখিরাতে তো তাদেরকে ঠিকই ধরবেন। তখন আর তাদেরকে ছাড়া হবে না। তখন তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন। সে শাস্তি হতে তারা রেহাই পাবে না।

এর উত্তর হল, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় যখন তাদের সাথে সবরের আচরণ করছেন, তখন আপনিও এখানে সবর অবলম্বন করুন। কেউ যদি আপনাকে কষ্ট দেয়, তাকে বলে দিন, আমি কোন প্রতিশোধ নিচ্ছি না। আমি তোমার ব্যাপার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। আখিরাতে তিনি এ বিষয়ে ইনসাফ করবেন।

পক্ষান্তরে আপনি যদি বদলা নেন, তবে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা যে বদলা নিতেন তার বিপরীতে আপনার নেওয়া বদলা কোন হিসাবেই আসে না। সুতরাং প্রতিশোধ নেওয়ার আগ্রহ থাকলে তা এখানে না নিয়ে আখিরাতে নেওয়ার জন্য আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন।

ক্ষমা করাই শ্রেয়

বরং উত্তম হল ক্ষমা করে দেওয়া। আপনাকে যে ব্যক্তি কষ্ট দিয়েছে আপনি যদি তাকে ক্ষমা করে দেন, আল্লাহ তা'আলাই আপনার সাহায্যকারী হয়ে যাবেন। তিনি আপনার প্রয়োজন সমাধা করবেন এবং আপনার কষ্ট দূর করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাগণ ক্ষমাই করে থাকেন। আমরা আমাদের উর্ধ্বতন শায়খ হযরত মিয়াযী নূর মুহাম্মাদ (রহ.)-এর ঘটনা শুনেছি। তিনি ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর শায়খ। তাঁর নিয়ম ছিল এ রকম-কেউ যদি তাঁকে কোনভাবে কষ্ট দিত, তিনি বলতেন, হে আল্লাহ ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। এমন কি কেউ তার টাকা-পয়সা চুরি করলেও বলতেন, হে আল্লাহ! আমি এ টাকা তার জন্য হালাল করে দিলাম, আমি তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে করব কি? তাকে শাস্তি

দেওয়ানোতেই বা আমার কী লাভ? তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকতেন। বাজারে কোন কিছু কিনতে গেলে টাকার থলি হাতে থাকত। মাল কেনার পর সেই থলি দোকনদারকে দিয়ে বলতেন, এখান থেকে দাম নিয়ে নাও। নিজে গুনতেন না, কেননা, গুনতে যে সময় খরচ হবে, ততক্ষণ যিকর করলে অনেক লাভ।

হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ (রহ.)-এর ঘটনা

একবার তিনি বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাতে টাকার থলি ছিল। এক চোর তা টের পেয়ে গেল। সে পেছনে লাগল। তারপর এক সুযোগে সেটি হাতিয়ে নিয়ে সটকে পড়ল। মিয়াজী ফিরেও দেখলেন না কে থলিটি মেরে দিল। ভাবলেন, কে শুধু শুধু তার পেছনে দৌড়াবে আর খোঁজ নেবে সেটি কে নিয়েছে? তিনি যিকর করতে করতে বাড়ির পথ ধরলেন। মনে মনে নিয়ত করলেন, হে আল্লাহ! যেই চোর থলিটি নিয়েছে তাকে ক্ষমা করে দিলাম। টাকা তাকে হাদিয়া করে দিলাম। ওদিকে চোর চুরি করে ফ্যাসাদে পড়ে গেল। বাড়ি ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। এক গলি থেকে আরেক গলি, সেই গলি থেকে অন্য গলি, এভাবে মহা গোলক ধাঁধায় পড়ে গেল। যে গলি থেকে বের হত ঘুরে ফিরে আবার সেখানেই চলে আসত। কোথা থেকে যে বের হবে তাই খুঁজে পাচ্ছিল না। কয়েক ঘন্টা এভাবে চক্কর খেয়ে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কি করবে দিশাই পাচ্ছিল না। হঠাৎ তার মাথায় আসল, বড় মিয়ার কারামত মনে হচ্ছে যেন। আমি তার টাকা চুরি করেছি বলে আল্লাহ আমার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

এখন মুক্তির উপায় কী? ভাবল, ওই বুযুর্গের কাছেই ফিরে যাই এবং তাকে ধরে বলি, আপনার টাকা এই রইল, এখন আল্লাহর কাছে দু'আ করে আমার জান বাঁচানোর ব্যবস্থা করে দিন। এবার সে রাস্তা পেল। মিয়াজী (রহ.)-এর বাড়ির রাস্তা। সোজা তাঁর বাড়িতে পৌছে গেল এবং দরজায় কড়াঘাত করল। মিয়াজী (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন কে? বলল, হুযূর! আমি আপনার টাকা চুরি করেছিলাম। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এই টাকা ফেরত নিন। মিয়াজী (রহ.) বললেন, ওই টাকা আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি। তোমাকে দান করে দিয়েছি। এখন আর ওই টাকা আমার নয়। আমি ওটা ফেরত নিতে পারি না। চোর বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে ফেরত নিয়ে নিন। এভাবে দু'জনের মধ্যে কথা চালাচালি চলছিল। চোর বলছিল, ফেরত নিয়ে নিন। তিনি বলছিলেন, আমি ওটা দান করে দিয়েছি, ফেরত নিতে পারব না। শেষে মিয়াজী (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, ফেরত দিচ্ছ

চাচ্ছ কেন? সে বলল, হযরত! ব্যাপার হল, আমি বাড়ি যেতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কয়েক ঘন্টা বাজারের গলিতে ঘুরপাক খেয়েছি। মিয়াজী (রহ.) বললেন, আচ্ছা যাও, আমি দু'আ করছি, তুমি রাস্তা পেয়ে যাবে। সুতরাং তিনি দু'আ করলেন। এবং সে রাস্তা পেয়ে বাড়ি চলে গেল।

কারও প্রতি বিদ্বেষ রেখ না

এই হল আল্লাহওয়ালাদের চরিত্র। কেউ তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিলেও তাঁরা তাদের প্রতি মনে কোন বিদ্বেষ ও কষ্ট রাখেন না। রাগ-দ্বেষ তাদের গলিতে ঢুকতেই পারে না।

کفر است در طریقت ما کینہ داشتن

آئین ما است سینہ چوں آئینہ داشتن

'আমাদের এ পথে বিদ্বেষ পোষণ কুফ্‌রতুল্য।

আমাদের আইনে হৃদয় রাখতে হবে আয়নার মত।

এ হৃদয়কে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা দ্বারা মলিন করা যাবে না'।

সুতরাং কেউ আঘাত করলে প্রতিশোধ না নিয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে ক্ষমা করে দাও। আর প্রতিশোধ যদি নিতেই হয়, তবে তা নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও। তুমি নিজে বদলা নিতে গেলে দ্বন্দ্ব-কলহ ও হানাহানি লেগে যাওয়ার আশংকা আছে। তা ছাড়া তুমি বলতে পার না বদলা যতটুকু নেওয়ার অধিকার ছিল ঠিক সেই পরিমাণই নিচ্ছ না তার বেশি নিয়ে ফেলছ। বেশি নিয়ে ফেললে কিয়ামতের দিন তোমাকে পাকড়াও করা হবে। সুতরাং বদলা নেওয়ার চিন্তা বাদ দাও।

প্রত্যেকের উচিত নিজ কর্তব্য পালন করা

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা মানুষকে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে যত্নবান থাকার আহবান জানিয়েছেন। বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তোমার দায়িত্ব এই, তোমার কর্তব্য এই, তোমার এই করা উচিত, তোমার কর্মপদ্ধতি এ রকম হওয়া উচিত। সুতরাং যে ব্যক্তি আঘাত পেয়েছে, তাকে তো সবর করার সবক দেওয়া হচ্ছে। সে যেন বদলা না নেয়, ক্ষমা করে দেয়, বিদ্বেষ পোষণ না করে এবং সেই কষ্টকে ভিত্তি করে অশান্তি বিস্তারে লিপ্ত না হয়, সেই তালীম দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে কষ্টদাতাকেও সাবধান করা হয়েছে, যাকে সে কষ্ট দিয়েছে তাকে সবর ও ক্ষমাশীলতার তালীম দেওয়া হচ্ছে দেখে সে যেন কষ্টদানে উৎসাহবোধ না করে। তা একথা ভাবার কোন অবকাশ নেই যে, কষ্টদানে বিশেষ কোন অপরাধ নেই এবং কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেললে তাতে তেমন অসুবিধা নেই।

বরং কষ্টদাতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সতর্কবাণী হল, তুমি তোমার কোন আচরণ দ্বারা যাকেই কষ্ট দিয়ে থাক না কেন, সে নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। সুতরাং কখনও কাউকে কষ্ট দিও না। এমন কোন কাজের ধারে কাছেও কখনও যেও না, যা দ্বারা কেউ দুঃখ পেতে পারে।

প্রধান বিচারপতির রোজ দু'শ' রাক্'আত নফল নামায আদায়

হযরত ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ছাত্র এবং একজন উচ্চস্তরের ফকীহ ছিলেন। ফকীহ হিসেবে তো বিশ্ব জোড়া তাঁর খ্যাতি, কিন্তু তিনি যে একজন বড় আল্লাহওয়ালাও ছিলেন তা অনেকেই জানে না। তাঁর জীবনীগ্রন্থে আছে, চীফ জাস্টিস হওয়ার পরেও এবং হাজারও ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন দু'শ রাক্'আত নফল নামায পড়তেন। তাঁর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসলে একজন লোক তার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করল, আপনি চিন্তিত কেন? বললেন, আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিতির সময় আসন্ন। সেখানে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু জীবনের কার্যাবলী সম্পর্কে কী জবাব দেব? আমার দ্বারা যা-কিছু ঘটেছে, তার সবই মনে আছে। সেজন্য তাওবা-ইস্তিগফার করেছি। আশা করি, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। কিন্তু একটা ঘটনার জন্য বড় চিন্তা লাগে। বিচারপতি থাকাকালে একজন মুসলিম ও একজন অমুসলিমের মকদ্দমা চলছিল। শুনানির সময় আমি মুসলিম ব্যক্তিকে তো ভালো জায়গায় বসতে দিয়েছিলাম, কিন্তু অমুসলিম ব্যক্তিকে যেই জায়গায় বসিয়েছিলাম, তা একটু নিম্নমানের ছিল। কিন্তু শরী'আতের হুকুম হল বাদী-বিবাদীর প্রতি সব কিছুতে সমআচরণ করতে হবে। এমনকি স্থানদানের ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করতে হবে। তা না করলে বে-ইনসাফী হবে। সে মকদ্দমায় যদিও রায় ন্যায়সম্মতই দেওয়া হয়েছিল-আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু তাদেরকে বসার জন্য যে জায়গা দিয়েছিলাম, তাতে শরী'আতের হুকুম যথাযথভাবে মানা হয়নি। আমার দুশ্চিন্তা সে নিয়েই। সে সম্পর্কে যদি আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস

করেন, আমি কী জবাব দেব? সেটা তো বান্দার হক ছিল। সে যতক্ষণ ক্ষমা না করবে কেবল তাওবা দ্বারা তা মাফ হতে পারে না।

প্রকৃত মুসলিম কে?

সুতরাং কেবল মুসলিমদেরই নয়; বরং ইসলাম অমুসলিমদেরও হক সাব্যস্ত করে দিয়েছে, এমনকি জীবজন্তুরও। হাদীছে এমন কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা জীবজন্তুর উপর জুলুম করার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

মোটকথা, একদিকে তো বলা হয়েছে, সাবধান! তোমার কোনও একটি কথা ও কোনও একটি কাজ দ্বারাও যেন অন্য কেউ আঘাত না পায়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।'

(বুখারী, হাদীছ নং ৯; মুসলিম, হাদীছ নং ৫৮; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫৫১; নাসাঈ, হাদীছ নং ৪৯১০; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২১২২)

অন্যকে আঘাত করা ও অন্যের মনে দুঃখ দেওয়া এমনই বিপজ্জনক জিনিস যে, সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করা পর্যন্ত তা থেকে ক্ষমা পাওয়ার কোন উপায় নেই। সুতরাং সাবধান, কোনওভাবেই অন্য কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেল না। অন্যদিকে বলা হয়েছে, কারও দ্বারা তুমি কোনও কষ্ট পেয়ে থাকলে তাতে সবর কর এবং তাকে ক্ষমা করে দাও। সেই কষ্টের ভিত্তিতে পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ো না। এমনই ভারসাম্যমান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা।

ব্যক্তিগঠনে নবী (সল্লাল্লাহু...)-এর কর্মপন্থা

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীতে দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে পবিত্র মক্কায় অভিযান চালান। অতি সহজেই অভিযান সফল হয়। আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেন। সে বাহিনীতে মুহাজির-আনসার সকলেই ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ হয়। তাতেও আল্লাহ তা'আলা শেষ পর্যন্ত তাঁকে জয়যুক্ত করেন। এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপুল পরিমাণ গনীমতের মাল হস্তগত হয়। তখন সম্পদ বলতে উট-গরু-ছাগল প্রভৃতি গবাদি পশুই হত। যার কাছে যত বেশি গবাদি পশু

থাকত, তাকে তত বেশি ধনী মনে করা হত। গনীমতের মাল বন্টন করার সময় আসলে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন, মক্কা মুকার্‌রমা ও তার আশেপাশে যারা বাস করে তারা সদ্য ইসলামগ্রহণ করেছে। ইসলাম তাদের অন্তরে এখনও দৃঢ়বদ্ধ হয়নি। তাদের মধ্যে অনেকে এখনও পর্যন্ত ইসলামগ্রহণই করেনি। একটু ঝুঁকেছে মাত্র। সুতরাং তিনি মনে করলেন, তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারীগণ ইসলামে পাকাপোক্ত হবে আর যারা এখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা দ্রুত মুসলিম হয়ে যাবে, তারা আর ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে না। সুতরাং গনীমতের সবটা মাল তিনি সেখানকার লোকদের মধ্যেই বন্টন করে দিলেন।

কোনও এক মুনাফিক বিষয়টা লক্ষ করল, সে আনসারদের কাছে গিয়ে বলল, দেখ তোমাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা হল। তোমরা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে যুদ্ধ করতে এসেছ। জানবাজি রেখে যুদ্ধ করেছ, অথচ গনীমত বন্টন করা হয়েছে এখানকার লোকদের মধ্যে, যাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করেছ এবং যাদের রক্তে তোমাদের তরবারি রঞ্জিত হয়ে আছে। তোমরা গনীমত থেকে কিছুই পেলে না। এটাই ছিল মুনাফিকদের চরিত্র। সুযোগের সন্ধানে থাকত কখন কিভাবে মুসলিমদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করা যায়। আনসারদের মধ্যে যারা অভিজ্ঞ ও পরিণত বয়সের ছিলেন তারা তো এসব কথায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না, কিন্তু কিছু সংখ্যক তরুণের মনে তাতে খটকা জাগল। তারা চিন্তা করলেন, ঠিকই তো, এটা কেমন হল যে, যুদ্ধ করলাম আমরা অথচ গনীমতের সবটা মাল বন্টন করা হল অন্যদের মধ্যে।

তরুণদের এ মন্তব্য মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোচরীভূত হল। তিনি সমস্ত সাহাবীকে একত্র হতে বললেন। সেখানে তিনি আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

'হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঈমানের মহাসম্পদ দান করেছেন। তোমাদের সৌভাগ্য যে, তিনি তোমাদেরকে তার নবীর মেজবান হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আমি গনীমতের সম্পদ এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে বন্টন করেছি, যাতে তারা ঈমানে পরিপক্ব হয়ে উঠে। অনেক সময়ই এমন হয় যে, আমি যাকে গনীমতের সম্পদ দেই, তার তুলনায় যাকে দেই না, সে-ই আমার বেশি প্রিয় হতে থাকে। কিন্তু আমি শুনতে পেলাম, এ নিয়ে তোমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে। তারপর বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়, লোকে নিজেদের সাথে গরু-ছাগলের পাল নিয়ে যাবে

আর তোমরা সঙ্গে নিয়ে যাবে আল্লাহ তা'আলার রাসূলকে তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও? আমি মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি এতে কি তোমরা খুশি নও? বল তো, ভাগ্যবান তারা, না তোমরা?

তিনি যখন একথা বললেন, উপস্থিত সাহাবীদের অন্তর আবেগ-মথিত হয়ে উঠল। তাদের প্রাণ জুড়িয়ে গেল, আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য এর চেয়ে সম্মানের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। যে কথা শুনেছেন, তা আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তরুণই বলেছে। নয়ত আমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক তাদের মনে এ ধরনের কোন কল্পনাও জাগেনি। সুতরাং আপনি যেমন ফয়সালা করবেন আমরা সর্বান্তকরণে তাতে সন্তুষ্ট থাকব। নিঃসন্দেহে আপনার ফয়সালাই সঠিক।

অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা শোন, আমার সর্বাপেক্ষা বেশি ঘনিষ্ঠ তোমরাই। সুতরাং

لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ

'মানুষ এক পথে আর আনসারগণ যদি অন্যপথে চলে, তবে আমি আনসারদের পথই বেছে নেব।'

'হে আনসারগণ! এখনও পর্যন্ত তোমাদের প্রতি বেইনসাফী হয়নি। তোমাদের সাথে আমার যে সম্পর্ক, ইনশাআল্লাহ তা যথারীতি ঠিক থাকবে। তবে আমার পরে তোমাদেরকে অন্যরকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে সব শাসক আসবে, তারা মুহাজির ও অন্যদের সাথে যে রকম ব্যবহার করবে তোমাদের সাথে সে রকম করবে না। কিন্তু হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আমার ওসিয়ত থাকল, সে রকম পরিস্থিতিতে তোমরা ধৈর্যধারণ করো-যাবত না তোমরা হাওযে কাওছারে আমার সাথে মিলিত হও'।

(বুখারী, হাদীছ নং ৩৯৮৫; মুসলিম, হাদীছ নং ১৭৫৮;
মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১১১২২)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদেরকে জানালেন যে, অদ্যাবধি তোমাদের প্রতি কোন বেইনসাফী করা হয়নি, তবে ভবিষ্যতে তোমাদের প্রতি তা করা হবে। তখনকার জন্য আমার ওসিয়ত হল ' তোমরা সে পরিস্থিতিতে ধৈর্য অবলম্বন কর।

তিনি তাদেরকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন 'আনসার-অধিকার রক্ষা সমিতি' গঠন করতে বলেননি। তাদেরকে অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে এবং

সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেননি। বলেছেন, তোমরা ধৈর্য ধর যাবৎ না হাওযে কাওছারে আমার সাথে মিলিত হও।

আনসারগণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়ত অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে দেখিয়েছেন, ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় না, যাতে আনসারদের পক্ষ থেকে কোন বিরোধ ও সংগ্রামের ডাক উঠেছে। দ্বন্দ্ব-কলহের কত ঘটনাই তো ঘটেছে, জামাল ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আনসারদের পক্ষ থেকে কখনও কোন আন্দোলন ও বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেনি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক দিকে তো আনসার সাহাবীদেরকে সবরের ওসীয়ত করেছেন, অন্যদিকে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে, যখন নামাযের জন্য মসজিদে নব্বীতে পর্যন্ত যেতে পারছিলেন না, সর্বশেষ যে ওসীয়ত করেছিলেন, তার একটা ধারা ছিল আনসারদের অধিকার সম্পর্কে। তিনি বলেন, 'এই আনসার সম্প্রদায় আমাকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে। প্রতিটি পদক্ষেপে তারা সাচ্চা ঈমানের পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ রেখ। এমন কোন আচরণ করো না, যাতে তাদের অন্তরে বেইনসাফীর কোন ধারণা জন্মাতে পারে।

এভাবেই তিনি সাহাবায়ে কিরামের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা গড়ে তুলেছিলেন। একদিকে বলছেন 'আনসারদের অধিকারসমূহের মর্যাদা দিও, অন্যদিকে আনসারদেরকে বলছেন, তোমাদের প্রতি কোন বেইনসাফী হলে তাতে ধৈর্যধারণ করো'।

প্রত্যেকের কর্তব্য নিজ দায়িত্ব পালনে রত থাকা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা হল প্রত্যেকে আপন দায়িত্বের প্রতি নজর রাখবে। আমার উপর কি যিম্মাদারি ন্যস্ত রয়েছে? আমার কাছে কার কী দাবি? আমি নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছি কি না? এটাই হবে প্রত্যেকের লক্ষণীয় বিষয়। প্রত্যেকে যখন দায়িত্ব-সচেতন হয়ে যাবে এবং আপন-আপন যিম্মাদারি পালনে যত্নবান থাকবে, তখন সকলের হক আপনা-আপনিই আদায় হয়ে যাবে।

কিন্তু নদী উল্টা দিক থেকে বইছে। এখন জাতিকে আপন অধিকার আদায় করে নেওয়ার সবক শেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, নিজ অধিকার সম্পর্কে সজাগ হও। অধিকার আদায়ের দাবিতে রাস্তায় নাম। দৃষ্টি এই দিকে চলে যাওয়ার কারণে দায়িত্ব পালনে দেখা দিয়েছে অবহেলা। আমার দায়িত্ব আমি কতটুকু পালন করছি সে ব্যাপারে কোন ফিকির নেই। শ্রমিক শ্লোগান দিচ্ছে,

আমার অধিকার আমাকে দিতে হবে। মালিক বলছে, আমার অধিকার বুঝে চাই। আজ শ্রমিক এ হাদীছ ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়েছে যে, 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর আগে তার মজুরি পরিশোধ কর'। কিন্তু যে কাজের জন্য তাকে মজুরি দেওয়া হবে, তা করার জন্য সে আগে ঘাম ঝড়িয়েছে কি না সে দিকে তার লক্ষ নেই। সে ভাবছে না, যে কাজ সে করেছে তার জন্য মজুরি পাওয়ার উপযুক্ত সে কতটুকু হয়েছে ?

প্রত্যেকের উচিত নিজেই নিজের হিসাব নেওয়া

প্রত্যেকে নিজেকে পরখ করে দেখুক, সে যে কাজ করছে তা কতটুকু সঠিক এবং নিজ দায়িত্ব সে আদৌ পালন করছে কি ? যে ব্যক্তি অফিসে চাকরি করছে, সে নিজ প্রমোশন ও বেতন বৃদ্ধি নিয়েই চিন্তা-চেষ্টা করছে কিন্তু যেই কাজের জন্য তাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে আনজাম দিচ্ছে কি না তা নিয়ে কোন ভাবনা তার নেই। এরই পরিণামে আজ মানুষের অধিকার পদদলিত হচ্ছে, কেউ নিজের অধিকার বুঝে পাচ্ছে না।

বস্তুত অধিকার বুঝে পাওয়ার একটাই উপায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুসরণ করা। অর্থাৎ প্রত্যেকে আপন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হোন, তা পালনে যত্নবান থাকুন। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা কেবল এরই মাধ্যমে হতে পারে।

যা হোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছে ইরশাদ করছেন যে, আল্লাহ তা'আলার চেয়ে বেশি সহনশীল আর কেউ নেই। তাঁর নাফরমানী করা হচ্ছে, শির্ক ও কুফ্রী করা হচ্ছে। তা দেখেও তিনি সবর করে যাচ্ছেন। শান্তি ও নিরাপত্তা দিচ্ছেন ও জীবিকা দান করেছেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত এই চরিত্র নিজেদের মধ্যে বিকশিত করে তোলা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত; ১১ খণ্ড : ২৪০-২৬৩ পৃষ্ঠা

পারিবারিক কলহের চতুর্থ সমাধান
লেনদেনে স্বচ্ছতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পারিবারিক কলহের বিভিন্ন কারণ ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা চলছে। পারিবারিক ঝগড়া-ফাসাদের বড় কারণ শরী'আতের বিশেষ একটি হুকুমের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া। হুকুমটি হল,

تَعَاشَرُوْا كَالْاِخْوَانِ وَتَعَامَلُوْا كَالْاَجَانِبِ

'তোমরা পরস্পরে ভাই-ভাই হয়ে থাক এবং লেনদেন কর অপরিচিতের মত'। অর্থাৎ আচার-ব্যবহার করবে প্রীতিপূর্ণ, যেমন এক ভাই অন্য ভাইয়ের সাথে করে থাকে, কিন্তু যখন বেচাকেনা ও আর্থিক লেনদেন করবে, তখন এমন ভাবে কথাবার্তা বলবে এবং ফয়সালা গ্রহণ করবে যেন কেউ কাউকে চেনই না। খোলামেলা কথা বলবে, কোন অস্পষ্টতা রাখবে না। পাওনা-দাওনা পরিষ্কারভাবে চুকাবে। এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

মালিকানা পৃথক হয়ে যাওয়া চাই

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা হল-মুসলিমদের প্রতিটি কথা হবে পরিষ্কার। প্রত্যেকের মালিকানা হবে আলাদা। কোনটার মালিক কে তা স্পষ্ট থাকতে হবে। শরী'আতের এ শিক্ষায় দৃষ্টি না দেওয়ার কারণে আজ আমাদের সমাজে ঝগড়া-বিবাদের কোন অন্ত নেই।

পিতা-পুত্রের যৌথ কারবার

মনে করুন, পিতা কোনও এক ব্যবসা করছে। পরে পুত্রও তাতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার নয় যে, সে কী হিসেবে যোগ দিয়েছে। পার্টনার হিসেবে, না কর্মচারী হিসেবে, নাকি এমনিই পিতার কাজে সহযোগিতা

করছে। এর কোনওটি পরিষ্কার না হওয়ায় বিষয়টা সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়ে গেছে। এভাবেই পিতা-পুত্র দিনরাত সেই ব্যবসায় পরিশ্রম দিচ্ছে। পিতার যখন টাকার দরকার হয় ক্যাশ থেকে নেয়ে নেয়, পুত্রের যখন প্রয়োজন পড়ে সেও নিয়ে নেয়। বছরের পর বছর তারা এভাবে চলছে। ইত্যবসরে দ্বিতীয় পুত্র বড় হয়ে গেছে। সেও সেই কারবারে যোগ দিল। ক্রমে অন্য পুত্ররাও। এতে এক পুত্র আগে শরীক হয়েছে, এক পুত্র পরে, এক পুত্র বেশি কাজ করেছে, অন্যজন কম। যার যখন টাকা-পয়সার দরকার হয় নিয়ে নেয়। কে কত নিল কোন হিসাবে নেই, লেখাজোখা নেই। ব্যবসার প্রকৃত মালিক কে, যৌথ হলে কার অংশ কতটুকু, কর্মচারী হিসেবে কাজ করলে কার বেতন কত, কিছুই পরিষ্কার করা হয়নি। কেউ যদি তাদের বলে, এভাবে গড়পরতা চলো না, সব পরিষ্কার করে নাও। হিসাব-কিতাব রাখ। উত্তর দেওয়া হয়, আরে ভাই-ভাই, বাপ-ছেলেতে কিসের হিসাব। এটা শুনতে কেমন লাগবে যে, বাপ-বেটায় হিসাব করা হচ্ছে? খুবই ভক্তি-মহব্বতের কথা!

যখন বিরোধ দেখা দেয়

কিন্তু যখন দশ-বারো বছর গত হয়ে যায়, ছেলেদের বউ আসে, বাচ্চা-কাচ্চা জন্মায় কিংবা ব্যবসায়ের মূল উদ্যোক্তা অর্থাৎ পিতার ইন্তিকাল হয়ে যায়, তখন ভাইদের মধ্যে কলহ শুরু হয়ে যায়। ভক্তি-ভালোবাসা সব উধাও। একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে সে বেশি টাকা নিয়েছে, আমি কম নিয়েছি। এভাবে বিষয়টা এমনই জটিল আকার ধারণ করে, যার কিনারা করা মুশকিল হয়ে যায়। ভাইয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাত, কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এমন কি একে অন্যের রক্তপানের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায়। পরিশেষে মুফ্তী ছাহেবের কাছে এসে বলে, এ ব্যাপারে মাসআলা কী বলুন। মুফ্তী ছাহেব পড়ে গেল ফ্যাসাদে। যখন কারবার শুরু করেছিল একদিনও বসে চিন্তা করেনি তাদের শ্রমব্যয়ের ধরনটা কী হবে? অংশীদারিত্বের না কর্মচারীসুলভ? অংশীদারিত্বের হলে কার কতটুকু অংশ থাকবে আর কর্মচারী হলে বেতন কী পরিমাণ হবে? আর এখন মামলা যখন জটিল হয়ে গেছে, মুফ্তী ছাহেব ফয়সালা দাও। বেচারা মুফ্তী ছাহেব এখন কী করতে পারবে?

এই জটিলতার মূল কারণ শরী'আতের হুকুম অগ্রাহ্য করা। নির্দেশ হল, লেনদেন পরিষ্কারভাবে করবে, তা পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী যত আপনজনই হোক না কেন। প্রত্যেকের মালিকানা পৃথক হতে হবে এবং কার অংশ কতটুকু তা স্পষ্ট হতে হবে।

মনে রাখতে হবে, হিসাব-নিকাশ ছাড়া যে জীবন কাটছে তা গুনাহের ভেতর দিয়েই কাটছে। যেহেতু জানা নেই নিজের হক খাচ্ছে, না অন্যের হক।

মীরাছ বন্টনে বিলম্ব জায়েয নয়

শরী'আতের হুকুম হল, কেউ মারা গেলে সঙ্গে-সঙ্গেই মীরাছ বন্টন করে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেককে তার হক বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার স্মরণ আছে, আমার মহান পিতা (রহ.)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমার শায়খ হযরত ডাক্তার 'আব্দুল হাই আরেফী ছাহেব (রহ.) সমবেদনা জানাতে আসলেন। তখনও দাফন করা হয়নি। হযরত (রহ.)-এর স্বাস্থ্য তখন তেমন ভালো ছিল না। আব্বাজানের ইন্তিকালও তাঁর জন্য অনেক বড় আঘাত ছিল। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। আব্বাজান যে শক্তিবর্ধক ওষুধ খেতেন তার খানিকটা ঘরে ছিল। আমরা তার সামনে তা পেশ করলাম যে, হযরত খেয়ে নিন, দুর্বলতা কাটবে।

হযরত ডাক্তার আরেফী ছাহেব (রহ.) বললেন, ভাই ওই ওষুধ খাওয়া এখন আমার জন্য জায়েয নয়। এখন ওয়ারিশগণ এর মালিক। সমস্ত ওয়ারিশের অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত এটা খাওয়া আমার জন্য হালাল নয়। আমরা আরয করলাম, ওয়ারিশদের প্রত্যেকেই বালেগ এবং সকলেই এখানে উপস্থিত আছে। সকলেই খুশিমনে অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং আপনি খেতে পারেন, কোন সমস্যা নেই, অবশেষে তিনি খেলেন।

যা হোক আল্লাহ তা'আলা বিশেষ গুরুত্বের সাথে মীরাছ বন্টনের হুকুম করেছেন এবং সেটা মৃত্যুর পরপরই, যাতে পরবর্তীতে এ নিয়ে কোন ঝগড়া-ফাসাদ দেখা না দেয়।

মীরাছ বণ্টনে বিলম্ব করার কুফল

কিন্তু আমাদের সমাজে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এখন চরম পর্যায়ে। কারও মৃত্যুর পর ওয়ারিশদেরকে যদি বলা হয়, এখন মীরাছ বন্টন করে ফেল, তারা বলবে তাওবা, তাওবা! এখনও তো মায়্যিতের কাফনও ময়লা হয়নি আর এরই মধ্যে তুমি মীরাছ বন্টনের কথা বলছ। এভাবে মীরাছ বন্টনকে দুনিয়াবী কাজ ঠাওরিয়ে যত সম্ভব দেরিতে সম্পন্ন করাকেই সমীচীন মনে করছে। এক দিকে তো এমনই তাক্ওয়া যে, মৃত্যুর পর এত শীঘ্র অর্থ-সম্পদের আলোচনা পসন্দ নয়। অন্যদিকে মীরাছ বন্টন না করে যৌথ সম্পত্তি ভোগে রত থাকছে, আর এভাবে যখন বছর পার হয়ে যায়, সেই সম্পত্তি নিয়েই

নিজেরা হানাহানি শুরু করে দেয়, এমনকি একজন আরেকজনের রক্ত পান করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আরও কত রকম অভিযোগ। অমুকে সম্পত্তি বেশি খাচ্ছে, অমুকে এইটা দখল করে রেখেছে ইত্যাদি।

এ কারণেই শরী'আত মৃত্যুর পরপরই মীরাছ বন্টনের হুকুম দিয়েছে। যাতে প্রত্যেকের মালিকানা পৃথক হয়ে যায় এবং কার কোন অংশ তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আমাদের সমাজের অবস্থা হল, ঘরের আসবাবপত্র কোন্‌টি কার তার ঠিকানা নেই। অলংকার স্ত্রীর না স্বামীর? যেই ঘরে বাস করা হচ্ছে তার মালিক কে? কোন জিনিসটি স্বামীর এবং কোনটি স্ত্রীর? এর উত্তর কারও জানা থাকে না। অথচ এর পরিণামে এক সময় মারাত্মক কলহ দেখা দেয়।

হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শফী' (রহ.)-এর সতর্কতা

আমার মহান পিতা (রহ.)-এর কথা স্মরণ হয়ে গেল। ইন্তিকালের আগে কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। একদম শয্যাশায়ী। নিজ কক্ষেই দিন কাটছিল। সেখানে একটা চৌকি ছিল। তাতেই সব কাজ করতেন। তার কক্ষসংলগ্ন আমার একটা ছোট কামরা ছিল। আমি সেখানে বসা থাকতাম। খানার সময় হলে ট্রেতে করে তার জন্য খাবার আনা হত। খাওয়া শেষে বলতেন, এগুলো শীঘ্র ভিতরে নিয়ে যাও। মাদ্‌রাসা থেকে কোন কিতাব বা অন্য কোন জিনিস আনা হলে প্রয়োজন শেষ হওয়ামাত্র বলতেন, শীঘ্র মাদ্‌রাসায় রেখে আস। এখানে রেখে দিও না। কখনও খাবারের পাত্রসমূহ বা কিতাব সরিয়ে নিতে বিলম্ব হলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। বলতেন, দেরি কেন করছ,শীঘ্র নিয়ে যাও।

অনেক সময় আমাদের মনে হত, তিনি এগুলো সরানোর জন্য অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করছেন। পাঁচ-সাত মিনিট দেরি হলে এমন কী ক্ষতি? ক্ষতি যে কী, তা আমাদের বুঝে এসেছে সেইদিন, যেদিন তিনি তার ওসীয়তনামার কথা আমাদের জানালেন। বললেন, এতে লেখা আছে, এই চৌকিপাতা যে কামরায় আমি আছি, এর মধ্যে যে সব জিনিস আছে, কেবল এগুলোর মালিকই আমি। এ ছাড়া বাড়ির আর সব মালামাল আমার স্ত্রীর। তাকে আমি মালিক বানিয়ে দিয়েছি। কাজেই আমার মৃত্যুকালে যদি অতিরিক্ত কিছু এ কামরায় থাকে তবে ওসীয়তনামা অনুযায়ী মনে করা হবে, তাও আমার মালিকানাধীন। ফলে আমার মৃত্যুর পর মীরাছী সম্পত্তি হিসেবে তা ভাগ-বাটোয়ারার মধ্যে পড়ে যাবে। এজন্যই আমি চাই বাইরের কোন জিনিস আমার কামরায় আনা হলে তা যেন বেশিক্ষণ এখানে না থাকে, বরং তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়।

এ রকমই ছিল তাঁর সতর্কতা। কার মালিকানায় কি আছে-যাতে পরিষ্কার থাকে। পুত্রদের, স্ত্রীর এবং বাইরের জিনিসপত্র থেকে নিজ মালিকানাধীন জিনিস সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছিলেন। আল-হামদুলিল্লাহ, এর সুফল হয়েছে এই যে, তার রেখে যাওয়া সম্পদ নিয়ে কখনও কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি।

ভাইদের মধ্যেও হিসাব পরিষ্কার থাকা চাই

শরী'আতই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। যেন স্বত্ব পরিষ্কার থাকে। আমরা যখন এ মাস'আলা মানুষকে বলি এবং হিসাব পরিষ্কার রাখার প্রতি গুরুত্ব দেই, তখন জবাব দেওয়া হয়, হিসাব করলে কেমন পর-পর বোধ হয়, আপনদের মধ্যে কিসের হিসাব ? কিন্তু বেশি দিন না যেতেই সেই আপনত্ব কোথায় ঘুচে যায়। তখন পারলে একজন আরেকজনের জান নিয়ে নেয়। আসলে মালিকানার স্পষ্ট ভাগ-বাটোয়ারা না হওয়াই আত্মকলহের একটি বড় কারণ।

গৃহনির্মাণ ও হিসাবের স্বচ্ছতা

অনেক জায়গায় এভাবে বাড়ি তৈরি হয় যে, কিছু টাকা দেয় পিতা, কিছু এক পুত্র, এবং কিছু অন্যপুত্র এবং কিছু ঋণও আনা হয়। এভাবে বাড়ি তৈরি হয়ে যায়। প্রথমে এটা স্থির করা হয়নি যে, ছেলে যেই টাকা দিয়েছে, তা কি ঋণ হিসেবে, না এমনিই পিতার সহযোগিতা করেছে, না কি টাকা খরচ করে সে বাড়ির অংশীদার হতে চাচ্ছে? যখন তাদের মধ্যে কারও ইন্তিকাল হয়ে যায়, তখনই প্রশ্ন দাঁড়ায় বাড়িটির মালিক কে? একজন বলে, আমি এ বাড়িতে এত টাকা খরচ করেছি, আকেরজন বলে, আমি এত টাকা খরচ করেছি, তৃতীয়জন বলে, জমি কেনার টাকা তো আমিই দিয়েছিলাম। এভাবে একেকজন একেক দাবি করতে থাকে। পরিণামে সে বাড়ি নিয়ে মহা ঝঞ্ঝাট লেগে যায়। তখন ফয়সালার জন্য মুফ্তী ছাহেবের কাছে যায়, বলুন এর কী সমাধান। এরূপ ক্ষেত্রে ফয়সালা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কখনও বেইনসাফীও হয়ে যায়।

সুতরাং মাসআলাটি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া চাই। পিতার কারবারে পুত্র যদি কাজ করে আর সে অংশীদার হিসেবে কাজ করছে, না কর্মচারীরূপে এ বিষয়ে কিছু পরিষ্কার না থাকে, তবে সারা জীবনও যদি এভাবে কাজ করে তবে ধরে নেওয়া হবে সে আল্লাহর ওয়াস্তে পিতাকে সাহায্য করেছে মাত্র। কাজেই সে কারবারে তার কোন অংশ থাকবে না।

অন্যকে বাড়ি দেওয়ার সঠিক পন্থা

কাউকে কিছু দিয়ে দিতে হলে তারও নিয়ম জেনে নেওয়া চাই। কেবল তাকে দিয়ে দিয়েছি বললেই দেওয়া হয়ে যায় না। অনেকে বলে, আমি এ বাড়িটি স্ত্রীর নামে করে দিয়েছি, অর্থাৎ তার নামে রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছি। মনে করা হয়, বাড়িটি স্ত্রীর হয়ে গেছে। অথচ কোন বাড়ি কারও নামে রেজিষ্ট্রি করে দিলেই শরী'আতে সে বাড়ির মালিক হয় না। মালিক হওয়ার জন্য কবজা জরুরি। বলতে হবে, আমি এ বাড়িটি তোমার মালিকানায় দিয়ে দিলাম। এখন থেকে তুমি এর মালিক, ব্যস তখনই সে এর মালিক হবে, অন্যথায় নয়।

সব সমস্যার সমাধান শরী'আতের অনুসরণ

লোকে এসব মাসআলা জানে না। সব কিছু উলটা-পালটা চলছে। পরিণামে ঝগড়া-বিবাদ ও ফিৎনা-ফাসাদ হচ্ছে। যত মামলা-মকদ্দমা, সামাজিক অশান্তি, তার মূল কারণ এটাই। মানুষ শরী'আতের উপর চলতে শুরু করলে অর্ধেক মামলা-মকদ্দমা আপনিই মিটে যাবে।

এসব মামলা-মকদ্দমা ও ঝগড়া-ফাসাদ যে দুষ্টু লোকদের মধ্যেই হচ্ছে তা নয়। এমনসব লোকের মধ্যেও চলছে যাদের উদ্দেশ্য খারাপ নয়, জেনেশুনে তারা অন্যের সম্পদ লুটতে চায় না। কেবল মাসআলা জানা না থাকায় তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা পরিণামে বিপত্তি ডেকে এনেছে। পক্ষান্তরে যাদের নিয়তই খারাপ, ইচ্ছাকৃত অন্যের সম্পদ গাপ করতে চায়, তারা যে কি না কি করে তার তো কোন ঠিকানাই নেই।

সারকথা, দ্বীনের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে আমাদের সমাজে মহাফাসাদ বিস্তার করছে। তাই এ মাসআলা নিজেকেও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকেও জানাতে হবে। তিক্ত মনে হলেও প্রথমে একবার হিসাব পরিষ্কার করে নিন। তারপর মহব্বতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করুন। কে কিভাবে কাজ করছে, কার অংশ কতটুকু তা পরিষ্কার করে নিয়েই সামনে চলুন। কোন কিছুই যেন অস্পষ্ট না থাকে। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদের সকলকে আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত; ১১ খণ্ড : ২৬৭-২৭৮ পৃষ্ঠা

পরিবারিক কলহের পঞ্চম সমাধান
তর্ক-বিতর্ক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ পরিহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ . اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরিবারিক কলহের আরও এক কারণ হল তর্ক-বিতর্ক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। এ ব্যাপারেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছেন এবং এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ

'তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে বাদানুবাদ করো না, তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না এবং এমন কোন ওয়াদা তার সাথে করো না, যা তুমি রক্ষা করবে না'। (তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯১৮)

নিজ ভাইয়ের সাথে বাদানুবাদ করো না

এ হাদীছে হুকুম দেওয়া হয়েছে, لَا تُمَارِ اَخَاكَ 'নিজ ভাইয়ের সাথে বাদানুবাদ করো না'। এর হুবহু উর্দু তরজমা কঠিন। কেননা উর্দু ভাষা খুব সংকীর্ণ। শব্দ ভাণ্ডার অতি ছোট। আরবী থেকে উর্দু তরজমা করার সময় খুব জটিলতায় পড়তে হয়। শব্দ কম থাকায় সীমিত গণ্ডির মধ্যে থেকেই তরজমা করতে হয়। এ হাদীছে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে لَا تُمَارِ উর্দুতে এর তরজমা করতে হয় 'ঝগড়া করো না'। কিন্তু আরবীতে مِرَاءٌ (যা থেকে لَا تُمَارِ নিষেধাজ্ঞার উৎপত্তি)-শব্দটি বিস্তৃত অর্থের অবকাশ রাখে। এর অর্থ, বিতর্ক করা, বাদানুবাদ করা, লড়াই করা, তুই-তুকারি করা ইত্যাদি। কাজেই হাতাহাতি-মুখামুখি ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক সবই এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এ তিনওটি কাজ মুসলিমদের ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট করে। তাই যথাসম্ভব এর থেকে বিরত থাকতে হবে।

অনেক সময় উপলব্ধি করা যায়, যেভাবে তার অধিকার পদদলিত করা হচ্ছে, তাতে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। তা না হলে তার প্রতি অন্যায়-অবিচার চলতে থাকবে, এবং জীবন-যাপন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। এরূপ ক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে আদালতে গেলে সেটা ভিন্ন কথা। এরূপ অবস্থা না হলে যথাসম্ভব নিজেদের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করা চাই। পরস্পর লড়াই-সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার চেয়ে আপোষ-নিষ্পত্তিই মঙ্গলজনক।

তর্ক-বিতর্ক পরিহার করুন

যারা অন্যের সব কথাতেই খুঁত ধরার চেষ্টা করে, অন্যের প্রতিটি কথার একটা না উত্তর দেওয়াই যাদের প্রবণতা, এ নির্দেশনা বিশেষভাবে তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর লোক আছে, তর্কই যাদের স্বভাব। অন্যের সাথে বিতর্কে না নামলে তার স্বস্তি নেই। তুচ্ছ একটা কথা শুনল, ব্যস তাই নিয়েই লেগে পড়ল। তার ভিত্তিতে তর্ক-বির্তকের এক পাহাড় দাঁড় করিয়ে ফেলল। আমাদের সমাজে যে সব তর্ক-বিতর্ক হয় তার অধিকাংশই ফযুল, না দ্বীনের সাথে তার কোন সম্পর্ক আছে, না দুনিয়ার সাথে। এমন সব বিষয় নিয়ে আমরা লেগে পড়ি, যে সম্পর্কে না কবরে জিজ্ঞেস করা হবে, না হাশরে জবাবদিহিতা আছে। তা সত্ত্বেও ঘন্টার পর ঘন্টা তা নিয়ে কথা কাটাকাটি চলে। আর এই ফালতু কাজের পরিণামে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ি। এমনকি এর পরিণামে দু'টি দল পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে যায়, যারা দীর্ঘকাল পরস্পরে হানাহানি চালিয়ে যেতে থাকে।

ঝগড়ার পরিণামে 'ইলমের নূর চলে যায়

হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

اَلْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ فِي الْعِلْمِ يَذْهَبُ بِنُوْرِ الْعِلْمِ

'ঝগড়া-বিবাদ 'ইলমের নূর বরবাদ করে দেয়'।

(তারতীবুল-মাদারিক, ১খ, ৫১)

সুতরাং তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে আপনি যে বিষয়কে সত্য মনে করেন, সঠিক পন্থায়, সঠিক নিয়তে বলে দিন। যাকে বলবেন, সে মানলে তো ভালো আর না মানলে তা সেই বুঝবে এবং আল্লাহ তা'আলাই তা দেখবেন। আপনাকে দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয়নি যে, জবরদস্তি তাকে মানতে বাধ্য করবেন। অন্যকে সংশোধন করে ফেলা আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ কেবল সঠিক কথা জানিয়ে দেওয়া। না মানলে সেজন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

সত্য কথা পৌছানোই আপনার দায়িত্ব

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সম্পর্কে জানাচ্ছেন,

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَٰغُ

'রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পৌছানোই'। (মায়িদা : ৯৯)

তো জোর খাটানো যখন নবীগণেরই কাজ নয়, তখন আপনি কেন জবরদস্তি করতে যাবেন। সুতরাং একটা পর্যায় পর্যন্ত সওয়াল-জওয়াব করার পর যখন দেখবেন ব্যাপারটা তর্কের দিকে গড়াচ্ছে এবং সামনের ব্যক্তি সত্য মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, তখন কথা বন্ধ করে তর্কের দুয়ার বন্ধ করে দিন।

অভিযোগ-অনুযোগ করা হতে বিরত থাকুন

কিছু লোক আছে, যারা প্রত্যেক কথায়ই আপত্তি তোলে। পরিচিত কারও সাথে দেখা হলেই বলবে, তুমি অমুক দিন এই কাজ করেছিলে, অমুক দিন এই করেছিলে। অনেক সময় এটা করা হয় ভালোবাসার নামে। কথায় বলে, 'ভালোবাসা থেকেই অভিযোগের উৎপত্তি'।

এ বাক্য তাদের খুব মনে থাকে। কথা সত্য বটে, কিন্তু অভিযোগ-আপত্তিরও তো একটা সীমা আছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে অভিযোগ করবে করুক। কিন্তু তুচ্ছ-তুচ্ছ বিষয়েও যদি আপত্তি করে, তার কি জবাব থাকতে পারে? অমুক অনুষ্ঠানে অমুককে দাওয়াত দিলে, কিন্তু আমাকে দিলে না! এটাও একটা আপত্তির বিষয় হল? শরী'আত তাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছে, যাকে ইচ্ছা দাওয়াত দেবে, যাকে ইচ্ছা দেবে না। তাতে আমার আপত্তি করার বৈধতা কোথায়? তোমাকে দাওয়াত দেয়নি তার মন চায়নি। এখানে তো আর কোন কথা চলতে পারে না। আজ আমরা ছোট-খাট বিষয়ে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে খাড়া হয়ে যাই। প্রতি উত্তরে আমাকেও শুনিয়ে দেওয়া হয়, তুমিও তো অমুক সময়ে আমাকে দাওয়াত দাওনি। ব্যস অভিযোগ-প্রতিঅভিযোগের এক সিলসিলা শুরু হয়ে যায়। পরিণামে মহব্বতের স্থানে দুশমনি জন্ম নেয়। একে অন্যের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

অভিযোগের বদলে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করুন

দারুল 'উলূম দেওবন্দের 'মুফ্তী আজম' হযরত মাওলানা মুফ্তী 'আযীযুর রহমান (রহ.) ছিলেন আমার মহান পিতার উস্তায। তাঁর ফাতওয়া সংকলন 'ফাতওয়া দারুল 'উলূম দেওবন্দ' নামে দশ খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। তা ইল্মের এক সাগর। তিনি এক উচ্চস্তরের বুযুর্গ ছিলেন। আব্বাজান (রহ.) বলেন, আমি তাঁকে কখনও কারও মুখের উপর বলতে শুনিনি যে,

'তুমি ভুল বলেছ'। বরং কেউ ভুল বললেও তিনি তার ব্যাখা করে বলতেন, আচ্ছা, আপনি হয়ত এই বোঝাতে চাচ্ছেন। এভাবে তিনি তার কথার সঠিক মর্ম বলে দিতেন এবং পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, তোমার কথা সঠিক নয়। ববং আমি যা বললাম, সেভাবে বললে সঠিক হত। এই ছিল তাঁর চরিত্র। জীবনে কখনও কাউকে মুখের উপর রদ করেননি।

নিজের দিল্ সাফ করে নিন

সুতরাং নিজের মুসলিম ভাই, আত্মীয়, বন্ধু, যে-কারও দ্বারা কোন ভুল কাজ হয়ে গেলে আপনি তার পক্ষে কোন সাফাই দাঁড় করাতে পারেন। কোন ওযর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। এভাবে অন্তর পরিষ্কার করে বলুন, অমুক দিন আপনার অমুক কাজে আমার কষ্ট লেগেছে। সে কোন ব্যাখ্যা দিলে তা মেনে নিন। এমন যেন না হয় যে, তার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করে অভিযোগ নিয়েই গোঁ ধরলেন আর পরিণামে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে গেল। এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছে,

لَا تُمَارِ أَخَاكَ

'তোমার ভাইয়ের সাথে বাদানুবাদ করো না'।

এ জীবন অতি সংক্ষিপ্ত

ভাই! এ দুনিয়া ক'দিনের? মাত্র কয়েক দিনেরই তো! কত দিনের গ্যারান্টি নিয়ে এ জগতে আসা হয়েছে? এই অনিশ্চিত দুনিয়া নিয়েই যতসব অভিযোগ! অমুকে আমাকে দাওয়াত দেয়নি। অমুকে আমকে সম্মান করেনি। সবই দুনিয়ার ব্যাপার। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ, আসবাব-পত্র, মান-সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি-এসবই হল অভিযোগের বিষয়। কিন্তু এসবের কিই বা মূল্য? কে জানে কখন ডাক এসে যায়! কখন এসব হাতছাড়া হয়ে যায়। তারচে' যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে সেই আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা করুন। সেখানে কী অবস্থা হয় তা নিয়ে ভাবুন। সেখানে আল্লাহ তা'আলার সামনে কী জবাব দেওয়া যাবে-এটাই হোক একমাত্র ধ্যান।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيْهَا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَاءِكَ فِيْهَا

'দুনিয়ার জন্য কাজ কর-এখানকার অবস্থানকাল অনুপাতে আর আখিরাতের জন্য কাজ কর সেখানকার স্থায়িত্ব অনুপাতে।'

(বারীকা :মাহ্‌মূদিয়্যা : ৪খ, ২৮৩ পৃ.: তাফ্‌সীরে হাক্কী, ১২খ, ১৪৯ পৃ.)

স্মরণ রাখুন, টাকা-পয়সা, সুনাম-সুখ্যাতি, ইজ্জত-সম্মান বড় ক্ষণস্থায়ী জিনিস, আজ আছে কাল থাকবে না।

একদিন যাদের জয়ডঙ্কায় আকাশ-বাতাস মুখরিত ছিল, দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, ক্ষমতা ছিল, যাদের নামে বুকে কাঁপন ধরত, আজ তারা জেলখানায় পচে মরছে। যাদের নামের সাথে এক ডজন সম্মানসূচক খেতাব জুড়ে দেওয়া হত, আজ তাদের নামের সাথে অপরাধের সুদীর্ঘ তালিকা। তাদের সম্পর্কে চুরির অভিযোগ, লুটের অভিযোগ, ঘুষ ও আত্মসাতের অভিযোগ আরও কত কি! তা ভাই কোন্ সে খ্যাতির জন্য লড়ছ? কোন্ পয়সার জন্য হানাহানি করছ? কে জানে কোন দিন, কখন আল্লাহ তা'আলা তোমার হাত থেকে এসব কেড়ে নেন। এসব তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করছ! এরই জন্য পরিবারে-পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বালাচ্ছ! ওইসব উঞ্ছবৃত্তি ছেড়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে আকড়ে ধর।

তিনি হুকুম করছেন-

لَا تُمَارِ اَخَاكَ

'তোমার ভাইয়ের সাথে বাদানুবাদ করো না'।

কেমন রসিকতা জায়েয?

এ হাদীছে নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় নির্দেশ হল,

وَلَا تُمَازِحْهُ

'মুসলিম ভাইয়ের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না'।

এর দ্বারা এমন ঠাট্টা বোঝানো হয়েছে, যা অন্যকে আহত করে। শরীআতের সীমারেখার ভেতরে থেকে এমন হালকা রসিকতা করা, যা মনে কেবল আনন্দই দান করে, আহত করে না, তাতে কোন বাধা নেই। তা জায়েয, বরং অন্যকে খুশি করার নিয়ত থাকলে ছওয়াবের কাজ।

বিদ্রূপ-উপহাস জায়েয নয়

এক হল রসিকতা,আরেক হল উপহাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। রসিকতা জায়েয, কিন্তু উপহাস করা জায়েয নয়। অর্থাৎ যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অন্যের পক্ষে অপ্রীতিকর হয় এবং অন্যের মনে কষ্ট দেয়, তা হারাম ও নাজায়েয। কেউ কেউ অন্যকে এই উদ্দেশ্যে ঘাটায় যে, সে রেগে যাবে এবং তাতে উপস্থিত লোকজন মজা পাবে। এভাবে অন্যকে উত্ত্যক্ত করে আনন্দ লাভ কোনও

মতেই জায়েয নয়। হাদীছে একেই নিষেধ করা হয়েছে। রসিকতা এতটুকুই করা যাবে, যা অন্যের পক্ষে সহনীয়। সীমাতিরিক্ত রসিকতা করে অন্যকে হেনস্থা করা ও তাকে বিব্রত করা এক ধরনের রুচিবিকৃতি। মনে রাখতে হবে, এরূপ উপহাস করে দুনিয়ায় হয়ত একটু মজা পাওয়া যাবে, কিন্তু আখিরাতে এর জন্য কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, যেহেতু এর মাধ্যমে আপনি একজন মুসলিমের মনে দুঃখ দিয়েছেন। মুসলিম ভাইয়ের মনে দুঃখ দেওয়া কঠিন গুনাহ।

একজন মুসলিমের মর্যাদা বায়তুল্লাহর উপরে

ইবন মাজাহ্ শরীফে আছে, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছিলেন। এ অবস্থায় তিনি পবিত্র কা'বাকে লক্ষ করে বললেন,

'হে কা'বা ! তুমি কত মর্যাদাবান। ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাঁর ঘরের মর্যাদা দিয়েছেন। কতই না তোমার মহিমা। কিন্তু হে কা'বা! একজন মুসলিমের জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা তোমার চেয়েও বেশি।'

(শু'আবুল-ঈমান, ৫খ, ২৯৬ পৃ., হাদীছ নং ৬৭০৬: মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা:,৬খ, ৪০১পৃ.: মাজমা'উয-যাওয়াইদ, ১খ, ৪৪পৃ.)

এমন কোন নির্মম হতভাগাও যদি দুনিয়ায় থাকে, যে পবিত্র কা'বাকে ভেঙ্গে ফেলার ধৃষ্টতা দেখাবে, তাকে লোকে কতই না ধিক্কার দেবে এবং এই বলে নিন্দা করবে যে, ওই বদবখ্ত কা'বাঘরের অমর্যাদা করেছে। এবার ভাবুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, কেউ যদি কোন মুসলিমের জানমাল ও ইজ্জতের উপর আঘাত করে, তবে সে কা'বাঘর ভাঙা অপেক্ষাও কঠিন গুনাহ করল। কিন্তু মানুষ এটাকে মামুলি ব্যাপার মনে করছে। অবলীলায় একে অন্যকে বিদ্রূপ করছে, তার মনে আঘাত করছে আর তা দ্বারা লোকে মজা পাচ্ছে। একবার চিন্তা করছে না যে, সে যেন পবিত্র কা'বায় আঘাত করছে, কা'বা ঘরকে অসম্মান করছে। এ হারাম কাজ থেকে সকলেরই বিরত থাকা উচিত।

বেমওকা রসিকতা অন্তরে ঘৃণা জন্মায়

অসংযত রঙ্গ-রসিকতা খুবই খারাপ জিনিস। তা অন্তরে ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। অপর ব্যক্তি যদি বুঝতে পারে আপনি তাকে নিয়ে মজা করছেন, তাকে উপহাস করছেন, ভাবুন তো দেখি, সে কি কখনও আপনাকে আপন ভাবতে পারবে। তার অন্তরে কোনওদিন আপনার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি

হবে? তা তো হবেই না, বরং সেখানে সৃষ্টি হবে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা। পরবর্তীতে আপনার প্রতি তার আচরণও হবে সেই রকম। ফলে উভয়ের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে ঝগড়া-ফাসাদ।

ওয়াদা পূরণে যত্নবান হোন

হাদীছটির তৃতীয় নির্দেশ হল,

وَلَا تَعِدْ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ

'এমন কোন ওয়াদা করো না, যা তুমি রক্ষা করতে পারবে না'।

অর্থাৎ ওয়াদা করার সময়ই চিন্তা করতে হবে তা পূরণ করা যাবে কি না। আর ওয়াদা করার পর যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে তা পূরণ করা হয়। ওয়াদা করার পর তা রক্ষা না করা কঠিন গুনাহ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে মুনাফিকের আলামত বলেছেন, এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

'তিনটি জিনিস যার মধ্যে থাকে, সে মুনাফিক, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কোন আমানত রাখা হলে তাতে খেয়ানত করে। (নাসাঈ, হাদীছ নং ৪৯৩৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১০৫০৪)

মুনাফিকের আলামত

এ তিনটি জিনিসকে হাদীছে মুনাফিকের আলামত বলা হয়েছে, তিনটির একটি হল ওয়াদা ভঙ্গ করা, চিন্তা করে দেখুন এটি কতবড় গর্হিত কাজ। সুতরাং যে বিষয় সম্পর্কে আপনার আশংকা থাকবে তা করতে পারবেন না, সে সম্পর্কে ওয়াদা করা হতে বিরত থাকুন। কিন্তু একবার ওয়াদা করে ফেললে তখন কঠিন ওযর ছাড়া কোন মূল্যেই তা ভঙ্গ না হয়ে যায় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকুন।

শিশুদের সাথে কৃত ওয়াদাও পূরণ করুন

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কি শিশুদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণেরও তাগিদ দিয়েছেন। এক হাদীছে আছে, এক মা তার শিশুকে এই বলে ডাকছিল যে, আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে বললেন

সত্যিই কি তুমি তাকে কিছু দিতে চাচ্ছ, না তাকে পটানোর জন্য বলছ? মা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার হাতে খেজুর আছে, তাই দিতে চাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তবে তো ঠিক আছে, নয়ত তোমার ওয়াদা ভঙ্গের গুনাহ হত।

(আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩৩৯; আহমাদ, হাদীছ নং ১৫১৪৭)

শিশুদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গের আরও একটা খারাপ দিক হল, এর দ্বারা শুরুতেই তাকে ওয়াদা ভঙ্গের তা'লীম দেওয়া হয়ে যায়। আপনি যখন তার সাথে ওয়াদা করে তা রক্ষা করলেন না, তখন তার মন-মানসিকতায় ঢুকে যাবে যে, ওয়াদা ভঙ্গ কিছু মন্দ কাজ নয়। এভাবে শৈশবেই তার স্বভাব নষ্ট করে দিলেন। কাজেই শিশুদের সাথে কিছুতেই ওয়াদা ভঙ্গ করা ঠিক নয়। এ হাদীছ দ্বারা আমরা আরও শিক্ষা পাচ্ছি যে, বহু কাজকে আমরা ওয়াদার মর্যাদা দিলেও এমন অনেক ব্যাপারও আছে, যাকে আমরা লঘু দৃষ্টিতে দেখি এবং তাতে ওয়াদা রক্ষার কোন আবশ্যকতা বোধ করি না। ফলে তাতে অবলিলায় ওয়াদাভঙ্গের গুনাহ করে ফেলি।

আইন-কানূন মেনে না চলাও ওয়াদাভঙ্গের অন্তর্ভুক্ত

উদাহরণ দেওয়া যায় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানূন দ্বারা। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানূন থাকে। সেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে যখন তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তখন কার্যত এই ওয়াদা করা হয় যে, আমি এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নিয়ম মেনে চলব।

যেমন আপনি শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন। ভর্তির সময় শিক্ষার্থীর দ্বারা লিখিত ওয়াদাও অবশ্য নেওয়া হয় যে, আমি এই-এই কাজ করব না, ওই-ওই কাজ করব এবং প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় নিয়ম মেনে চলব। কোন শিক্ষার্থী থেকে লিখিত ওয়াদা যদি নাও নেওয়া হয়, তবুও ভর্তি হওয়ার অর্থই দাঁড়ায় সে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত নিয়ম-কানূন মেনে চলবে বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং এখন কোন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের কোন নিয়ম ভঙ্গ করলে তা ওয়াদা ভঙ্গেরই নামান্তর হবে এবং সেজন্য সে গুনাহগার হবে।

যেসব নিয়ম শরী'আতবিরোধী নয় তা রক্ষা করা জরুরি

এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, সেও কার্যত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, আমি এ দেশের সমস্ত আইন মেনে চলব যতক্ষণ না তা আমাকে শরী'আতবিরোধী কাজে বাধ্য করে। কোন আইন শরী'আতবিরোধী হলে সে ক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা হল,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ১০৪১)

শরী'আত যদি কোন কাজ করতে নিষেধ করে, তবে সে কাজটি যেই করতে বলুক, বাদশা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী যে-ই হুকুম দিক কিংবা কোন আইন বাধ্য করুক, কিছুতেই তা করা যাবে না। বরং আল্লাহ তা'আলার হুকুম মানাই কর্তব্য।

কিন্তু কেউ যদি কোন গুনাহ করতে বাধ্য না করে; বৈধ বিষয়ে কোন নিয়ম তৈরি করা থাকে, তবে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক নাগরিক হিসেবে তা মানতে দায়বদ্ধ। কাজেই বিনাওযরে তা অমান্য করলে ওয়াদা খেলাফির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ট্রাফিক আইন মেনে চলা জরুরি

উদাহরণত ট্রাফিক আইনের কথা বলা যেতে পারে। লাল বাতি জ্বলার সময় থেমে যাওয়া এবং সবুজ বাতির সময় চলা এ আইনের অংশ। এ আইন মানা শরী'আতেও জরুরি। কেননা নাগরিক হিসেবে আইনত আপনি এ রাষ্ট্রের সকল আইন মেনে চলবেন বলে কার্যত ওয়াদাবদ্ধ। কাজেই আইন অমান্য করে লালবাতি জ্বলা অবস্থায় যদি গাড়ি চালিয়ে দেন, তবে সেই ওয়াদা ভংগ করলেন। আর এভাবে ওয়াদাভংগের গুনাহে লিপ্ত হলেন। এ ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্র-অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন প্রভেদ নেই।

বেকার ভাতা গ্রহণ

বৃটেনে বেকার ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ যাদের কোন আয়-রোজগারের ব্যবস্থা নেই, সরকার তাদের জীবন নির্বাহের দায়িত্ব নেয়-যত দিন না তার রোজগারের কোন ব্যবস্থা হয়। এটা একটি ভালো নিয়ম। কিন্তু যারা এখান থেকে ওদেশে গিয়ে অভিবাসী হয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু লোক এই বেকারত্বকেই পেশা বানিয়ে নিয়েছে। রাতের বেলা লুকিয়ে-ছাপিয়ে চাকরি করে এবং সাথে ওই বেকারভাতাও তোলে। বেশ নামাযী দ্বীনদার লোক পর্যন্ত এই ধান্ধা করে। একবার এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আমি বললাম, এটা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও গুনাহের কাজ, একে তো মিথ্যা, কারণ সে বেকার নয়, তা সত্ত্বেও নিজেকে বেকার বলে জাহির করছে। দ্বিতীয়ত এটা সরকারী আইনের লংঘন। এ দেশে প্রবেশ করার

কার্যত এই ওয়াদাও করা হয়েছে যে, এদেশের সমস্ত আইন সে মেনে চলবে। তা না চলায় ওয়াদাভঙ্গের গুনাহ হচ্ছে। প্রশ্নকর্তা বলল, এটা তো অমুসলিম রাষ্ট্র। অমুসলিম রাষ্ট্রের টাকা যেভাবেই সম্ভব হস্তগত করা যায়। আমি বললাম, ভাই, আপনি তো এদেশে প্রবেশ করে কার্যত ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, এখানকার সমস্ত আইন মেনে চলব। কাজেই এখন সেই ওয়াদা ভঙ্গ করে এদেশের কোন আইন অমান্য করার অবকাশ আপনার থাকতে পারে না। তা করা আপনার জন্য জায়েয নয়। ওয়াদা এমনই এক বিষয়, যা মুসলিমের সাথে যেমন রক্ষা করা জরুরি, তেমনি অমুসলিমের সাথেও জরুরি। কারও সাথেই ওয়াদাভংগ করা জায়েয নয়। কাজেই ওয়াদাভঙ্গ করে যে বেকারভাতা গ্রহণ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম হবে।

সারকথা, ওয়াদা ভংগ করা ঝগড়া-ফাসাদের একটি বড় কারণ। এর থেকে যে কোনও মূল্যে বেঁচে থাকা উচিত। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত: ১১ খণ্ড : ২৮০-২৯৯ পৃষ্ঠা

পরিবারিক কলহের ষষ্ঠ সমাধান
মিথ্যা পরিহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ . اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গেল কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পারিবারিক কলহের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে আলোচনা চলছে। তন্মধ্যে একটা বড় কারণ হল মিথ্যাচার। হযরত সুফয়ান ইবন উসায়দ হাযরামী (রাযি.) বর্ণিত এক হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ لَهٗ بِهٖ كَاذِبٌ

'এটা এক গুরুতর খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) যে, তুমি তোমার ভাইকে এমন কোন কথা বলবে, যে কথায় সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করছে অথচ তুমি তার সাথে মিথ্যা বলছ'। (আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ৪৩৩০)

এ জাতীয় আচরণে অন্তরে আঘাত লাগে, সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং পরস্পরে শত্রুতা দেখা দেয়। মিথ্যা বলা সর্বাবস্থায়ই কঠিন পাপ। কিন্তু এ হাদীছে বিশেষভাবে এমন মিথ্যাচারের কথা বলা হয়েছে, যেখানে শ্রোতা মনে করছে আপনি সত্য বলছেন, সে সরল মনে আপনার প্রতি আস্থা রাখছে ও আপনাকে বিশ্বাস করছে, অথচ আপনি সেই আস্থায় আঘাত হেনে তার সাথে মিথ্যা বলছেন। এ আচরণে মিথ্যাচারের গুনাহ তো আছেই সেই সঙ্গে যুক্ত হয় বিশ্বাসঘাতকতার গুনাহও।

কেননা, যে ব্যক্তি আপনার শরণাপন্ন হয়, আপনার কাছে কিছু জানতে চায় ও আপনার পরামর্শ নিতে আসে, সে মূলত আপনাকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মনে করেই আপনার কাছে আসে। এই বিশ্বাস ও আস্থা আপনার প্রতি তার গচ্ছিত আমানত। এক হাদীছে নবীজি ইরশাদ করেন-

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

'যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, সে আমানতগ্রহীতা।'

(তিরমিযী, হাদীছ নং ৪৭৪৭; আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ৪৪৬৩; ইবন মাজাহ:, হাদীছ ৩৭৩৫; আহমাদ, ২১৩২৬)

অর্থাৎ পরামর্শপ্রার্থী যেন তার প্রতি এই আমানত ভার অর্পণ করছে যে, তুমি আমাকে সঠিক কথা বলবে, এ ব্যাপারে সে তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখছে। কিন্তু সে তাকে বলল মিথ্যা কথা। এভাবে সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। এটা মিথ্যার অতিরিক্ত এক কঠিন গুনাহ।

মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট

আজকালে যত রকম সার্টিফিকেট ও প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়, তা সবই এ হাদীছের আওতায় পড়ে যায়। উদাহরণত এক ব্যক্তি অসুস্থ। অফিস থেকে ছুটি নেওয়ার জন্য তার মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দরকার। এখন এ ব্যাপারে সে যেই ডাক্তারের কাছে যাবে, তার জন্য এটা এক আমানত। কেননা, অফিস তার প্রতি নির্ভর করছে ও আস্থা রাখছে যে, সে যেই সার্টিফিকেট দেবে তা সঠিক হবে, মিথ্যা হবে না। অতঃপর অফিস সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এখন সেই ডাক্তার যদি ঘুষ নিয়ে মিথ্যা সার্টিফিকেট দেয় বা ঘুষ ছাড়াই কেবল বন্ধুত্বের খাতিরে সে রকম কিছু করে, যাতে মিথ্যা রোগের বাহানায় সে অফিস থেকে ছুটি পেয়ে যায়, তবে সে ডাক্তার কেবল মিথ্যার জন্যই নয়; বরং খেয়ানতের জন্যও গুনাহগার হবে। যে ব্যক্তি এরূপ সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ডাক্তারকে বাধ্য করবে, সে তো বহু গুনাহের কারবারী। এক তো সে নিজে মিথ্যা বলছে, দ্বিতীয়ত ডাক্তারকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করছে, তারপর মিথ্যা সার্টিফিকেট দেখিয়ে যে ছুটি নিচ্ছে তাও হারাম ভোগ করছে, সেই ছুটি ভোগাকালীন সময়ের বিপরীতে যে বেতন নিচ্ছে তা অবৈধভাবে নিচ্ছে এবং সেই অর্থ দ্বারা যে খাবারে কিনে খাচ্ছে তাও অবৈধ খাচ্ছে। এভাবে এক মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট হয়ে যাবে বহু গুনাহের সমষ্টি। আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন।

বর্তমান সমাজে এ জাতীয় গুনাহের ছড়াছড়ি। বেশ লেখাপড়া জানা মানুষ, এবং নামাযী ও দ্বীনদার কিসিমের লোক পর্যন্ত এ রকম মিথ্যা সার্টিফিকেট বের করছে। এ জন্য এতটুকু লজ্জা-শরম বোধ করছে না। তারা একে দ্বীন থেকে একরকম খারিজই করে দিয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র দেওয়া

প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রেও এ জাতীয় খামখেয়ালি করা হয়। আমার কাছেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যয়ন নেওয়ার জন্য লোক আসে। সাধারণত প্রত্যয়নপত্রে লিখতে হয়, এই নামে অমুক জায়গায় একটি প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিষ্ঠানটির মান বেশ ভালো। এখানে চাঁদা দিলে তার

উপযুক্ত ব্যবহার হবে। এ প্রত্যয়ন একটি সাক্ষ্যস্বরূপ। কোন চাঁদাদাতা যদি বলে, অমুকের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র নিয়ে আস, তা হলে আমি চাঁদা দেব, তবে সেই ব্যক্তি যেন আমার উপর নির্ভর করল। এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য বাস্তবিকই সেই প্রতিষ্ঠান আছে কিনা এবং থাকলেও তা চাঁদা প্রাপ্তির উপযুক্ত সেবা দান করছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই প্রত্যয়নপত্র দেওয়া। কিন্তু আমি যদি এসব খতিয়ে না দেখে কেবল বন্ধুত্ব বা ভদ্রতার খাতিরে প্রত্যয়নপত্র দিয়ে দেই, তবে সেটা হবে মিথ্যা বলার নামান্তর। এর দ্বারা যারা আমার উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছিল তাদের সাথে খেয়ানত করা হবে কেননা, আমি প্রতিষ্ঠানটি না দেখেই এবং তার বিশদ না জেনেই তাসদীক করে দিয়েছি। এটা নিকৃষ্ট ধরনের খেয়ানত হয়ে যাবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোকজন আমার কাছে আসে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে জানা না থাকায় যখন আমি অপরাগতা প্রকাশ করি, তারা মনক্ষুণ্ণ হয় এবং বলে ওর দ্বারা এই ছোট্ট একটা কাজও হয় না। তারা মনে করে, অপরাগতা প্রকাশ একটা অসৌজন্যমূলক কাজ। অথচ এটা একটা সাক্ষ্য আর এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন 'নিকৃষ্টতম খেয়ানত হল, লোকে তোমাকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মনে করছে, অথচ তুমি তাদের সাথে মিথ্যা বলছ'।

মিথ্যা চারিত্রিক সনদ

আজকাল মরাল ও ক্যারেকটর সার্টিফিকেটের চল আছে। সার্টিফিকেটদাতা তাতে লিখে দেয়; 'আমি এই ব্যক্তিকে পাঁচ বছর যাবৎ চিনি কিংবা দশ বছর যাবৎ সে আমার পরিচিত' (অথচ সে মাত্র তাকে দেখল)। আমি তার সম্পর্কে অবগত। সে একজন চরিত্রবান ও সুনাগরিক। সনদদাতা তো ভাবছে, আমি তার প্রতি সদাচরণ করলাম, কিন্তু চিন্তা করছে না, এই সদাচরণ কিয়ামতের দিন তাকে ফাঁসাবে। জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি যে বললে পাঁচ বা দশ বছর যাবত তাকে জানি, অথচ তুমি তাকে কখনও দেখনি বা তার সম্পর্কে ভালো জানতে না, তখন কী উত্তর দেওয়া যাবে? এটাও নিকৃষ্টতম খেয়ানত। কেননা, লোকে আপনার প্রতি বিশ্বাস রাখছে, অথচ আপনি মিথ্যা বলছেন।

আজকাল সার্টিফিকেটের কোন মূল্য নেই

আজকাল সমাজে এ জাতীয় সার্টিফিকেটের ছড়াছড়ি। ফলে এখন আর এর মূল্য নেই। কেননা, মানুষ জানে এসব মিথ্যা ও জাল সনদ। আমরা

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে জীবন থেকে পৃথক করে রেখেছি। দ্বীনকে কেবল নামায-রোযা-তাসবীহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। পার্থিব জীবনে মানুষের সাথে কীরূপ ব্যবহার করছি সে দিকে কোন লক্ষ নেই।

মিথ্যা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে

এ জাতীয় মিথ্যাচারও আমাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের কারণ। আপনি যখন এক ব্যক্তির উপর আস্থা রাখছেন যে, সে আপনাকে সত্য বলবে, কিন্তু বাস্তবে সে বলল মিথ্যা এবং আপনি সেটা জানতে পারলেন, তখন তার প্রতি আপনার অন্তরে একটা খারাপ ধারণা জন্মাল। আপনি এই ভেবে আহত হলেন যে, আমি তার উপর বিশ্বাস রাখলাম আর সে কিনা আমার সাথে মিথ্যা বলল, আমাকে ধোঁকা দিল এবং ভুল পথ দেখাল। এর পরিণামে তার ও আপনার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

মোটকথা, মিথ্যাচার পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের একটা বড় কারণ। কাজেই মিথ্যা পরিহার ছাড়া ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ করা এবং ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা কি করে সম্ভব? তাই আসুন আমরা মিথ্যা বর্জন করি, এমনিতে তো সব মিথ্যাচারই হারাম, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার উপর বিশ্বাস রাখে যে, আপনি সত্য বলবেন, তার সাথে মিথ্যা এক নির্মম কদর্যতা। সুতরাং তা পরিহারে অধিকতর যত্নবান থাকা চাই।

অতীতের প্রতিকার কিভাবে করবেন?

প্রশ্ন হতে পারে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যেসব কারণ বর্ণনা করেছেন, এখন থেকে আমরা যদি তা পরিহার করে চলতে শুরু করি, তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের আগামী জীবন তো শুধরে যাবে, কিন্তু ইতোমধ্যে আমাদের দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুসরণে যে গাফলতি হয়ে গেছে তার প্রতিকার করার উপায় কী? বিগত দিনে হয়ত কারও গীবত করেছি, কাউকে মন্দ বলেছি, কারও মনে আঘাত দিয়েছি এবং এ জাতীয় আরও বহু কিছু করেছি আর এভাবে বান্দার হক পদদলিত করার মাধ্যমে আমলনামা কালো করে ফেলেছি। অতীত জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে বছরের পর বছর বহু হক্কুল 'ইবাদ নষ্ট করেছি। এ দীর্ঘ সময়ে কত মানুষের সাথে সম্পর্ক হয়েছে, কতজনের সাথে মেলামেশা করা হয়েছে, তাতে কতজনের কত হক নষ্ট করেছি তার তো কোন হিসাব নেই। তাদের থেকে মাফ পাওয়ার কি কোন

ব্যবস্থা আছে? আজ থেকে না হয় নিজেদের সংশোধনকার্যে মনোযোগ দিলাম, কিন্তু বিগত জীবনের উপায় কী হবে? তার হিসাব চুকানোর কোন বন্দোবস্ত আছে কি? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই ফিকির থাকা উচিত।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু ...) কর্তৃক ক্ষমাপ্রার্থনা

নিজেকে উৎসর্গ করে দিন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। কোন্ সমস্যার সমাধান তিনি না দিয়েছেন? নিজ জীবনাদর্শের মাধ্যমে সব কিছুর সুষ্ঠু সমাধান তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। যে ব্যক্তি নিজের অতীত জীবনকে কালিমামুক্ত করতে ইচ্ছুক তার জন্যও তিনি পথ রেখে গেছেন। বান্দার যে সব হক নষ্ট করা হয়েছে তা থেকে মুক্তির ব্যবস্থাও তাঁর শিক্ষার ভেতর রয়ে গেছে। সুতরাং একবার তিনি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে ঘোষণা করলেন-

আমার দ্বারা যদি কেউ কখনও কষ্ট পেয়ে থাকে, কারও প্রতি যদি আমার দ্বারা কোনও রকম বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে, তবে আজ আমি তোমাদের সামনে হাজির রয়েছি, তারা চাইলে আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিতে পারে, আমি প্রস্তুত আছি। যদি কেউ আমার কাছে তার কোন বিনিময় চায় তাও আমি দিতে রাজি। আবার কেউ ক্ষমা করতে রাজি থাকলে আমার অনুরোধ সে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়।

এ ছিল সেই পবিত্র ও মহান ব্যক্তিত্বের ঘোষণা, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হল,

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

'যাতে আল্লাহ আপনার অতীত-ভবিষ্যতের সব ত্রুটি ক্ষমা করে দেন।'

(ফাত্হ : ২)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ; তারা কিছুতেই মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করবে; অতপর তুমি যে সিদ্ধান্ত দাও সে সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকবে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেবে।'

(নিসা : ৬৫)

যেই সত্তার এমন মর্যাদা কুরআন মাজীদ তুলে ধরছে, যার সম্পর্কে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনও রকম জুলুম ও বাড়াবাড়ি তার দ্বারা ঘটতেই পারে না, তিনিই কিনা মসজিদে নব্বীতে সর্বসম্মুখে দাঁড়িয়ে উপরিউক্ত ঘোষণা দিচ্ছেন।

এক সাহাবীর বিরল প্রতিশোধ গ্রহণ

তাঁর এ ঘোষণা শুনে এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বদলা নিতে চাই। জিজ্ঞেস করলেন, কিসের বদলা? সাহাবী বললেন, একবার আপনি আমার কোমরে আঘাত করেছিলেন। তার বদলা নিতে চাই। তিনি বললেন, আমার তো স্মরণে আসছে না। কিন্তু তোমার যদি স্মরণ থাকে তবে এসো বদলা নিয়ে নাও। সাহাবী পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন, তারপর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন আমাকে মেরেছিলেন, আমার কোমরে কাপড় ছিল না। কোমর খোলা ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমর থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। অমনি নবুওয়াতী মোহর ঝলমল করে উঠল। সাহাবী সামনে এগিয়ে হামলে পড়লেন। সেই মোহরে চুমো খেতে লাগলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাই আমার প্রতিশোধ ! আশা ছিল, একবার নবুওয়াতী মোহরে চুমো খাব। এসব ছিল তারই ছল।

যাহোক, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু নিজেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই পেশ করেছিলেন। তিনি যে-কোন বদলা দেওয়ার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। এটা একটা আদর্শ। তিনি উম্মতকে শিখিয়ে দিলেন, আমিই যখন এমন করতে পেরেছি, তোমাদেরও পারা উচিত। বিগত জীবনের সব ময়লা ধুয়ে ফেলতে চাও তো আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সংশ্লিষ্ট সকলের সামনে নিজেকে পেশ কর। একই প্রস্তাবনা তাদের সামনে রাখ, বল, অতীত জীবনে আমার দ্বারা যদি কারও কোন হক নষ্ট হয়ে থাকে, আজ আমি বদলা দিতে প্রস্তুত আছি, যার ইচ্ছা বদলা নিয়ে নাও। আর যদি ক্ষমা করে দাও। সে তোমার দয়া, আমাকে ক্ষমাই করে দাও।

হযরত থানভী (রহ.)কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহ.) বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা বিষয়ে একখানি চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন, আল-'উযর ওয়ান-নুযর'। ছাপানোর পর তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তা পাঠিয়ে দেন। তাতে লিখেছিলেন, এযাবৎকালে বহু লোকের সাথে

আমার সম্পর্ক হয়েছে। না জানি আমার উপর কতজনের হক রয়ে গেছে এবং আমি তা যথাযথভাবে আদায় করিনি। হয়ত কারও উপর জুলুমও হয়ে গেছে, আজ আমি নিজেকে সকলের সামনে পেশ করছি। কেউ যদি আমার নিকট থেকে বদলা নিতে চায় নিয়ে নিতে পারে। আমার কাছে কারও আর্থিক কোন পাওনা থাকলে মেহেরবানী করে যদি স্মরণ করিয়ে দেন আমি তা দিয়ে দেব। কাউকে শারীরিকভাবে কষ্ট দিয়ে থাকলে তারও বদলা দিতে প্রস্তুত আছি। নয়ত ক্ষমার জন্য দরখাস্ত করছি। সাথে আরও লিখেছিলেন।

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলিম সাচ্চা দিলে যদি ক্ষমা চায় যে, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার ভুল হয়ে গেছে, তবে অপর মুসলিম ভাইয়ের কর্তব্য তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। সে ক্ষমা না করলে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে যেন ক্ষমার আশা না রাখে। (আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৯০১)

টাকা-পয়সার ব্যাপারটা আলাদা। অন্যের কাছে কারও টাকা-পাওনা থাকলে সে তা আদায় করে নেওয়ার অধিকার রাখে, কিন্তু পাওনা যদি হয় ইজ্জত-সম্মান সম্পর্কিত, যেমন কেউ কারও গীবত করেছিল, মনে কষ্ট দিয়েছিল বা অন্য কোনওভাবে অসম্মান করেছিল, তবে এখন কষ্টদাতা যদি ক্ষমা চায় তবে তাকে ক্ষমাই করে দেওয়া উচিত।

হযরত মুফ্তী আজম (রহ.)-কর্তৃক ক্ষমাপ্রার্থনা

আমার মহান পিতা হযরত মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) ইন্তিকালের তিন বছর আগে প্রথমবার যখন অসুস্থ হন, আমাকে হাসপাতালেই ডেকে বললেন, হযরত থানভী (রহ.) العذر والنذر নামে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, তুমি আমার পক্ষ থেকেও ওইরকম একখানি চিঠি লিখে দাও এবং তার নাম দাও 'বিগত ত্রুটির খানিকটা প্রতিকার'। এতে 'খানিকটা' শব্দ যোগ করে ইশারা করে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, পেছনের যাবতীয় ত্রুটি পূর্ণ প্রতিকার করে ফেলার দাবি করছি না; বরং এর দ্বারা কিছুটা প্রতিকারের আশা রাখি। তিনি চিঠিখানি ছাপিয়ে নিজের ভক্ত ও সম্পৃক্ত সকলের কাছে পাঠিয়ে দেন, যাতে তাদের পক্ষ হতে ক্ষমালাভ হয়ে যায়।

সব কিছু ক্ষমা করিয়ে নিন

আমাদের বুযুর্গগণ একটি বাক্য শিখিয়েছেন। বড় চমৎকার বাক্য, অধিকাংশ লোকেই ব্যবহার করে থাকে। যখন কেউ কারও থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তখন বলে 'ভাই আমার বলা বা শোনা সব ক্ষমা করে দিও'।

এটি খুবই কাজের কথা। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা। লোকে যদিও চিন্তা-ভাবনা না করেই বলে দেয়, কিন্তু কথাটি খুবই অর্থবোধক। এর দ্বারা ইশারা করা হয় যে, এখন আমি তোমার থেকে বিদায় নিচ্ছি। জানি না ফের দেখা হবে কি না। কাজেই তোমার সম্পর্কে যদি কিছু বলে বা শুনে থাকি কিংবা তোমার প্রতি কোন অন্যায় করে থাকি এখন তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। সুতরাং কোথাও সফরে গেলে যার সাথেই মোলাকাত হয়েছে, কিছুক্ষণের মেলামেশা হয়েছে, বিদায়কালে এ কথাটি বলে আসা চাই, বরং এটিকে অভ্যাসেই পরিণত করে ফেলা উচিত। এর উত্তরে যদি সে বলে আমি ক্ষমা করে দিলাম, তবে ইনশাআল্লাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।

যাদের সাথে দেখা করা সম্ভব নয় তাদের থেকে ক্ষমালাভের উপায়

ক্ষমাপ্রার্থনার উপরে বর্ণিত পদ্ধতি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা সম্ভব। কিন্তু এরূপ লোকও আছে যাদের সাথে সাক্ষাত করে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব নয়। যেমন আমরা রেল, বাস ও বিমান যোগে চলাফেরা করি। তাতে বিভিন্ন লোকের সাথে সাক্ষাত হয়। তখন কথাবার্তা ও আচার-আচরণে সহযাত্রীদের কষ্ট পাওয়া অসম্ভব নয়। হয়ত এভাবে বহু লোককেই কষ্ট দেওয়া হয়ে গেছে। এখন তাদের কে কোথায় আছে জানা নেই। তাদের সাথে দেখা করে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব নয়, এরূপ লোকদের কাছেও ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। একটা পদ্ধতি তো খুবই সহজ।

তাদের জন্য দু'আ করুন

তা হচ্ছে তাদের জন্য দু'আ করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْمُؤْمِنَةٍ اٰذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْجَلَدْتُّهُ أَوْلَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكٰوةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ

'হে আল্লাহ! আমি যদি কখনও কোন মু'মিন নর-নারীকে কষ্ট দিয়ে থাকি বা কাউকে মন্দ বলে থাকি, বা কাউকে মেরে থাকি কিংবা কাউকে অভিশাপ দিয়ে থাকি, তবে তার পক্ষে তাকে রহমত ও পরিশুদ্ধিকারক বানিয়ে দিন এবং আমার সে আচরণের মাধ্যমে তাকে আপনার নৈকট্য দান করুন।

(দারিমী, হাদীছ নং ২৬৪৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৭৮৫২)

এ হাদীছের ভিত্তিতে বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, যাদের কাছে আপনার পৌঁছা সম্ভব নয়, ফলে সামনাসামনি ক্ষমা চাওয়ার কোন উপায় নেই,তাদের জন্য দু'আ করুন। কেননা, আপনার দেওয়া দুঃখ-কষ্ট তাদের পক্ষে রহমত হয়ে গেলে দুঃখদানের অপরাধ আপনিই মাফ হয়ে যাবে-ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে তাদের জন্য ঈসালে ছওয়াবও করুন।

অনেকে মনে করে, ঈসালে ছওয়াব কেবল মৃতদের জন্যই হতে পারে। এটা ভুল ধারণা। বরং তা জীবিতদের জন্যও করা যায়। সুতরাং আপনার দ্বারা যারা কোনওভাবে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে, যিকর, তিলাওয়াত ও 'ইবাদত করে তাদের জন্য ছওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ এর ফলে তাদের প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিকার হয়ে যাবে।

তা ছাড়া সাধারণভাবেও দু'আ করুন, হে আল্লাহ! আমার দ্বারা যে-কেউ কষ্ট পেয়েছে, যার হক নষ্ট হয়েছে আপনি নিজ ফযল ও করমে তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, আমার সে আচরণকে তাদের পক্ষে রহমতের অছিলা বানিয়ে দিন, তাদেরকে আমার প্রতি খুশি করে দিন এবং আমার দিক থেকে তাদের অন্তর পরিষ্কার করে দিন, যাতে তারা আমাকে ক্ষমা করে দেয়।

একটি ভুল ধারণা খণ্ডন

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহ.) তাঁর এক ওয়াজে উপরে বর্ণিত দু'আ-সম্পর্কিত হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেন, এর দ্বারা কেউ যেন মনে না করে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো বহু পাপীর প্রতি লা'নত করেছিলেন। এ হাদীছ অনুযায়ী সে লা'নত তাদের জন্য রহমতে পরিণত হয়েছে।

যেমন এক হাদীছে আছে,

لَعْنَةُ اللّٰهِ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ

'আল্লাহ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন।'

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৮৬৬২)

উল্লিখিত হাদীছ অনুযায়ী ঐ অভিশাপ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার জন্য রহমত হয়ে যাবে এ ধারণা নিতান্তই ভুল। এর ভিত্তিতে কোন ঘুষখোর বা ঘুষদাতার আনন্দিত হওয়ার সুযোগ নেই। কেননা, ওই হাদীছের শুরুর কথা হল।

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ

'হে আল্লাহ! আমি তো একজন মানুষই। মানুষ যেমন ক্রুদ্ধ হয়, আমিও তেমনি ক্রুদ্ধ হই'। (মুসলিম, হাদীছ নং ৪৭০৮; মুসনাদে আহমাদ,৭০১০)

এই ক্রোধের কারণে আমি যদি কখনও কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি বা মন্দ বলে থাকি কিংবা লা'নত করে থাকি, তবে তার পক্ষে তাকে দু'আ ও রহমতে পরিণত করে দিন।

বোঝা গেল, এ হাদীছ সেই লা'নতের সাথে সম্পৃক্ত, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রুদ্ধাবস্থায় কারও প্রতি করেছিলেন। এরূপ লা'নতই সেই ব্যক্তির জন্য দু'আয় বদল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে গুনাহের কারণে যদি তিনি কারও প্রতি লা'নত করে থাকেন কিংবা দ্বীন ও শরী'আতের দাবিতে কাউকে অভিশাপ দিয়ে থাকেন, তবে তার পক্ষে তা দু'আয় পরিণত হয় না বরং দু'আ সংক্রান্ত হাদীছের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত: ১১ খণ্ড : ৩০৩-৩২০ পৃষ্ঠা

– ৫ম খণ্ড সমাপ্ত –